# মোপাসাঁ
# পঞ্চবিংশতি

# মোপাসাঁ পঞ্চবিংশতি

অনুবাদক

বিমল দত্ত

ভারতী বুক স্টল

প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা

৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,

কলিকাতা—৯

॥ দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্তিত ও সংশোধিত)



মূল্য: দশ টাকা মাত্র

প্রকাশক
শ্রীহৃষীকেশ বারিক
ভারতী বুক স্টল
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস
বাণীরূপা প্রেস
৯-এ, মনোমোহন বসু স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

## সূচীপত্র

## মোপাঁশা-পঞ্চবিংশতি

মোপাশাঁ একজন প্রথম সারির গল্প-লেখক। তিনি যা বলেন স্পষ্ট করেই বলেন। তিনি বলেছেন, ফরাসীদের জীবন-কথা। তাঁর গল্পে অসম্ভব বাক্-সংযম। ফ্লবেয়ার ও তুর্গেনেভ-এর কাছ থেকে এই সংযম তিনি শিক্ষা করে, ছোট ছোট গল্পকে এক অপূর্ব সংযতশ্রী দিয়েছেন। তিনি দেখেছেন আমাদের প্রকৃতির পেছনে আছে পাশব প্রবৃত্তি। এটাই তিনি বারবার দেখিয়েছেন তাঁর গল্পের সীমিত পরিসরে।

—অনুবাদক।

# প্রকাশকের ভূমিকা

গীত্ মোপাশাঁ প্রথম শ্রেণীর গল্পলেখক। তাঁর লেখা গল্পের ব্যাখ্যা দরকার হয় না। একখানা বই তুলে নিয়ে, পড়ে, রেখে দেওয়া যায়—যে সব ঘটনার কথা তিনি গল্পে বলেছেন, সে সম্বন্ধে ভাবা চলে কিন্তু তার অর্থ মাথা খাটিয়ে বুঝতে হয় না, কোন কিছু আবছা থাকে না, তাঁর গল্পে কোন কিছু দুরূহ রহস্য থাকে না —কিছুমাত্র অস্পষ্টতা নেই তার কোন খানে। সবটাতেই আছে বলিষ্ঠ প্রকাশ, আলোকিত হয়ে ওঠে সমস্ত পটভূমি। জোসেফ কন্‌রাড্ বলেন, মোপাশাঁকে নীরস মনে হয় না, বিরক্তিকর ঠেকেনা কোন সময়েই। একথা খুব কম সাহিত্যিকের সম্বন্ধে বলা চলে—বিশেষ করে, যাঁরা বস্তুতান্ত্রিক, সাহিত্যিক। মানুষ নামক জন্তুটির মৌল অবস্থা আমাদের সমক্ষে তুলে ধরবার সময়ে কোন কুসংস্কারের ধোঁয়া লেখকের দৃষ্টিকে অস্বচ্ছ করেনা। অত্যন্ত সরল ভাষায় তিনি বলে যান, ধার ধারেন না খুঁটিয়ে সব বলবার জন্যে বা আমাদের একটা গভীরতার মধ্যে জোর করে টেনে নিয়ে যাবারও কোন ঝোঁক বা চেষ্টা তাঁর মধ্যে নেই।

মোপাশাঁ নিজে ফরাসী—তিনি বলেছেন, ফরাসী জাতির কথা—ফরাসী সমাজের কথা। এদের যেমন দেখেছেন, তেমনি দেখিয়েছেন, কারো হয়ে তিনি নিজে একটি কথাও বলেন নি। তিনি যেমন তাদের সমস্ত কথা শুনছেন, তেমন লিখছেন—যেমন দেখছেন, তেমনি দেখাচ্ছেন। তাঁর চোখের আয়নায় ছবিগুলোই আমাদের দেখাচ্ছেন—তাঁর মনের ভাব একটুও আভাযে প্রকাশ করেননি। মোপাশাঁর মুরুব্বি ছিলেন গুস্তাভ্ ফ্লবেয়ার। মোপাশাঁকে তিনি কিছুতেই এই গল্পগুলির ফরাসীয়ানা ত্যাগ করাতে পারেন নি। মোপাশাঁ তাদের সাধারণ মানুষ করে দেখাতে পারেন নি। তাই তাঁর গল্প ফরাসীদের কাছে জাতিয় গল্প হয়ে রইল। তাতেই বা ক্ষতি কি? ফরাসী দেশের ফ্রেমে বাঁধানো এই চিত্রগুলির একটা নিজস্ব স্বাদ রয়ে গেছে—যেজন্যে বারে বারেই নানা দেশের পাঠক সেগুলো পড়ছে আর মুগ্ধ হচ্ছে।

ফ্লবেয়ার আর তুর্গেনিভ্ মনে মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন—কিন্তু গল্পলেখক-হিসাবে মোপাশাঁ ছিলেন তাঁর শক্তি সম্বন্ধে সচেতন। তিনি অন্য

ব্যাপারে অসংযমী থাকলেও, লেখার ব্যাপারে তাঁর সংযম ছিল অতিমাত্রায়। নিজে বুঝে, সমঝে, সামলে লিখতেই ভালবাসতেন বলেই, তাঁর গল্পগুলি সত্যিকারের ছোট গল্প হয়ে দাঁড়াতো।

ত্রিশ বছর বয়সে মোপাশাঁ 'ছোটগল্প' নামক সাহিত্যের একটি নতুন বিভাগ সৃষ্টি করে বসলেন। কোটি কোটি লোক এই গল্পের মাধ্যমে আনন্দ পেয়েছে এবং পাবে। সংবাদ নিয়েই গল্প লেখা শুরু করেন তিনি—তাঁর শিল্প তাকে ছোট আকারে রূপায়িত করা আব রসসিক্ত করে তোলা। কিন্তু শুধু পালিশ করেই তিনি কাজ শেষ করতেন না। তাঁর গল্পগুলিতে হাড়, মাংস, পেশী, ধমনী, এমন কি ধমনীর রক্তস্রোত পর্যন্ত দেখা যেত।

বর্তমানকালের জটিল মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণাত্মক গল্পগুলির সঙ্গে মোপাশাঁর গল্পের মূলগত পার্থক্য এই যে, আজকালকার গল্প অধিকাংশ লোকের ভাল লাগেনা, আর মোপাশাঁর গল্পেব মধ্যে এমন একটা স্পষ্ট অকপট ভাব আছে, যা পড়ামাত্র মনকে ছুঁয়ে যায়। মোপাশাঁ দেখেন গল্প—লেখেন গল্প ; তাঁর একটা প্লট থাকে কিন্তু আজকালকাব গল্পে মনটাই দেখানো হয়, প্লট আসে আবছাভাবে।

মোপাশাঁ যতই গল্পের আডালে থাকতে এবং গল্পগুলিকে রিপোর্টের মত বলে যেতে চেষ্টা করুন না কেন, তিনি ত আর রোষ্ট বা কলের মানুষ ছিলেন না। তিনি তাই গল্পেব বাইরে সরে আসতে পারেননি—জড়িয়ে গেছেন তাঁর গল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে। বহু ইংরাজ ও আমেরিকান সমালোচক তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে অশ্লীল লেখক বলে অপাংক্তেয় করে ফেলেছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র-চিত্রশালা ঘুরে এলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ লেখাই রূপোপজীবিনীদের, পথভ্রান্ত স্খলিত চরিত্র নারীদের, আর দুশ্চরিত্র পুরুষ ও খেলোয়াড় শ্রেণীর ঘৃণ্য ব্যক্তিদের ছবি। দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য বশতঃ মোপাশাঁ এদেরই পরিচয় লাভ করেছিলেন বলেই, এদের কথা বলেছেন। কিন্তু এদের কথাই বা সাহিত্যের উপজীব্য হ'তে দোষ কি? এরা ত মায়া নয়—এরা বাস্তব। এদের সামনে চোখ বুজে থাকলেই কি এরা সমাজ থেকে উবে যাবে? এদের সম্বন্ধে সাহিত্য-রচনা করলে, তা কেন যে অপাংক্তেয় হবে, তার কোন যুক্তি আমরা বর্তমানকালে খুঁজে পাই না।

গোড়া থেকেই মোপাশাঁ জনপ্রিয় হয়েছিলেন ইংলণ্ডে ও আমেরিকায়—ফ্রান্সে ত বটেই। ইংরাজ ও আমেরিকান সাহিত্যিকরা তাঁর গল্পের নকল করে

তাঁকে সম্মান দেখিয়েছিলেন। ফ্রান্সের লোকেরা তাঁর রচনা গো-গ্রাসে গিলত। কিন্তু তবুও তাঁর রোজগার বছরে ৩৫,০০০ ফ্রাঁর বেশী ছিল না।

মাসিক পত্রিকা থেকে তিনি প্রতি লাইনের জন্য এক ফ্রাঁ করে পেতেন। খবরের কাগজে গল্প ছাপার মূল্য ছিল বাঁধা থোক ৫০০ ফ্রাঁ। তখন এ অবশ্য রাজার আয়।

মোপাশাঁ বেশ বিলাসী জীবন যাপন করতেন। তাঁর মাকে বছরে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ করে পাঠাতেন। নানা রকম অসংযত খেয়াল চরিতার্থ করতেই তাঁর সব আয় ফুরিয়ে যেত—প্রচুর টাকা তাঁর দরকার—কাজেই খাটতে হত প্রচুর। এই দুষ্ট চক্রে ঘুরে অল্প বয়সে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়ে মৃত্যু হয়।

বর্তমান ছোট গল্পের জনক মোপাশাঁ ফ্রান্সের নরম্যান বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের তারিখ ৫ই আগস্ট ১৮৫০। মোপাশাঁর মা বায়ুগ্রস্তা ছিলেন। রুঁয়েতে মোপাশাঁ উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। ফরাসী সাহিত্যিকদের মত তিনি সিভিল সার্ভিস পাশ করেন, কিন্তু সামান্য কেরাণীর চাকরীর চেয়ে বড় কিছু করতে পারেন নি। তুর্গেনেভ্ তাঁর খুড়া হতেন বলে অনেকের ভুল ধারণা ছিল। মোপাশাঁ দাঁড় বেয়ে, তুর্গেনেভের বাড়ীতে সাহিত্য সভায় যোগ দিয়ে আর হৈ হৈ করে বেড়াতে ভালবাসতেন। কথাবার্তায় তাঁর তেমন ধার বা ঔজ্জ্বল্য ছিল না। ভাল খেলোয়াড় বলে দদে, জোলা, তুর্গেনেভ্ প্রভৃতি তাঁকে পছন্দ করতেন। ইংরাজ কবি স্যুইন্‌বার্ণ একবার ডুবে যাচ্ছিলেন, মোপাশাঁ তাঁকে বাঁচান। প্রথমে যে সব ছোট ছোট লেখা গল্প মোপাশাঁ ফ্লবেয়ারকে দেখাতেন, সেগুলি দেখে ফ্লবেয়ারের তেমন ভাল লাগেনি। কিন্তু ১৮৭৩ সালে ফ্লবেয়ার দেখলেন, তাঁর এই অল্পবয়সী বন্ধুটির মধ্যে প্রতিভা রয়েছে এবং সে লিখতে কৃতসংকল্প। সাত বছর মোপাশাঁ ফ্লবেয়ারের কাছে শিক্ষানবীশী করেন। কিন্তু মোপাশাঁর রচনাশৈলীতে যেমন ফ্লবেয়ারের প্রভাব দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় মেরিনের প্রভাব, অথচ ফ্লবেয়ার ছিলেন মেরিনের ঘোরতর বিরোধী। কিন্তু মোপাশাঁ, তাঁর গুরুদের চিন্তাশীলতা ও ভাষার গাঢ়তা অর্জন করতে পারেন নি।

১৮৯১ সালে পক্ষাঘাতে তাঁর নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে যায়। ১৮৯২ সালে-তাঁকে আতুরাশ্রমে পাঠান হয়। ১৮৯৩ সালের ৬ই জুলাই, তাঁর কষ্টকর জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

টলস্টয় বলেছেন : মোপাশাঁর অন্তর্দৃষ্টি মনুষ্য জীবনের নিস্তব্ধ গভীরতা ভেদ করেছিল। সেই গভীরতা থেকে মানুষের দ্বন্দ্ব তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।

জোসেফ্ কনরাড্ বলেছেন : মোপাশাঁ কখনো পুরোনো হয় না—কখনো মনে হয় না একঘেয়ে। তাঁর গল্প বলার মুন্সীয়ানা ছিল প্রথম শ্রেণীর···তিনি নির্মম, আবার মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীলও। তাদের সংরক্ষণশীল ভীতির জন্য তিনি তাদের গালাগাল করেন নি—তাদের ছোট খাট ত্রুটি ও কৌশলের জন্য অভিযোগ করেননি। তাদের এইসব কাজের জন্য ঘৃণা করেননি। তাদের দুঃখকষ্ট, ছলনা আর ঝঞ্ঝাটকে তিনি গভীর করুণার সঙ্গে দেখেছেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি কিছু এড়ায় নি। তিনি সবটুকু দেখেছেন, আর দেখেও মুখ ফিরিয়ে নেননি।

আর্থার সাইমন্স্ বলেছেন : মনুষ্য-প্রকৃতির মূলে যে পাশব-প্রবৃত্তি রয়েছে, তা মোপাশাঁ দেখেছেন···আর এই পাশব দিকটাই তিনি প্রধানতঃ প্রকাশ করেছেন—এবিষয়ে এমন করে কেউ লিখতে পারেননি, কারো এত জ্ঞান এবিষয়ে ছিল না—আর এমন দক্ষতাও কারো মধ্যে দেখা যায়নি।

আনাতোল ফ্রাঁস বলেছেন : এই বলিষ্ঠ ও নিপুণ গল্পলেখকের একাধারে শক্তি, নমনীয়তা আর পরিমাণ-জ্ঞান কোনটিরই অভাব ছিল না। চেষ্টা করলে তিনি অতিমাত্রায় বলিষ্ঠ হ'তে পারেন, তাই তাঁর শিল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

জর্জ সেণ্টস্‌বারি বলেছেন : তাঁর বর্ণনা-ভঙ্গী একাধারে বাস্তবানুগ ও যথাযথ —এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। প্রকৃতি মোপাশাঁকে যেন ডিকোর চেয়েও সংযত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও ছিমছাম শৈলী দান করেছিল। জীবন সম্বন্ধে তাঁর এক অপূর্ব অন্তর্দৃষ্টি ছিল আর সেই অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি যা দেখেছেন, তা হুবহু বর্ণনা করবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। রেখায় লেখায় স্পষ্ট এবং নির্লিপ্ত সংস্কারমুক্ত মন দিয়ে, তিনি যা এঁকে গেছেন তাঁর জুড়ি বিরল—তাকে কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি।

হৃষীকেশ যাজ্ঞিক
প্রকাশক।

## এক

## ॥ ম্যারোক্কা ॥

বন্ধু আমার, তুমি আমাকে আমার আফ্রিকার স্মৃতিচিত্র পাঠাতে বলেছ, বিশেষ করে ঐ মনোমুগ্ধকর দেশে আমার প্রেমের অভিজ্ঞতার কথা। তুমি আমার কালো প্রেয়সীদের কথা বলে কত হেসেছ, আর তুমি যেন দিব্য চক্ষে দেখছ যে, আমি ফ্রান্সে এসেছি—কয়েকজন দীর্ঘাঙ্গিনী আবলুষবরণী ঢ্যাঙা মেয়ে সঙ্গে নিয়ে—তাদের মাথায় হলদে সিল্কের রুমাল বাঁধা আর পরণে ঢিলে পাজামা।

সন্দেহ নেই, মূরমেয়েরা পরে তাদের পালামত আমার কাছে আসবে—তাদের অনেককে দেখে আমার ভাল লেগেছে, আর তাদের সঙ্গে প্রেম করার ঝোঁকও চেপেছে। কিন্তু, আমি প্রথম হাতে-খড়ি হিসাবে নতুন অভূতপূর্ব কিছু পেয়ে গেছি।

তোমার শেষ চিঠিতে তুমি লিখেছ, "কোন দেশে লোক কি করে প্রেম করে, তা জানতে পাই, তখন যেন আমি সে দেশ সম্বন্ধে ভাল করে জানি আর তা বর্ণনা করতে পারি। তা সে দেশ কখনো চাক্ষুষ করি, আর না করি।"

তবে বলি শোনো—এখানকার সকলে উন্মত্তভাবে ভালবাসে। প্রথম মুহূর্ত থেকে মনের মধ্যে একটা উৎসাহ কেঁপে কেঁপে ওঠে—চিরস্থায়ী একটা কামনা, মনে এসে বাসা বাঁধে—যার ফলে সমস্ত মানসিক প্রবৃত্তি অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আর, স্পর্শ থেকেই আমাদের অনন্ত রকম বোকামির পথে নিয়ে যায়।

আমাকে ভুল বুঝোনা, আমি জানিনা তুমি হৃদয়ের ভালবাসাকে আত্মার ভালবাসা বলো কিনা—তুমি মনে করো কিনা যে, এ জগতে

দেহাতীত আদর্শ ভালবাসা থাকা সম্ভব কিনা। আমার নিজেরই এ বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। কিন্তু অন্য রকম ভালবাসা—ইন্দ্রিয়জ বা কামজ ভালবাসার বেগ এদেশে ভয়ঙ্কর। এদেশের উত্তাপ, জ্বলন্ত গরম তোমাকে জ্বরাক্রান্ত করে তুলবে—ঝড়ের মত প্রচণ্ড বায়ুবেগ তোমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে দেবে—মরুভূমি থেকে আগুনের হল্‌কা এসে তোমার রক্তে আগুন ধরিয়ে দেবে—তোমার দেহে কামনার উত্তেজনা জাগিয়ে, তোমাকে পশু করে তুলবে।

যাক, আমার গল্পে ফিরে আসা যাক্‌। আমার আফ্রিকা-বাসের গোড়ার কথা আমি বলব না। বোনা, কনস্ট্যানটাইন, বিস্কারা আর স্টিয়েফ ভ্রমণের পর আমি চাবেট্‌ হয়ে বাউগি যাই—বনেব মধ্য দিয়ে এক সুন্দর রাস্তা ধরে এখানে হাজির হই—এখানে সমুদ্রের ছ'শ ফুট উপরে—সেই বাউগি উপসাগরে এসে দেখছি, স্থানটি নেপলসেব মত মনোরম।

দূরে জল একেবারে নিস্তরঙ্গ। পাশে উঁচু পাহাড়, তাতে গাছ-পালার সবুজিমা—পাহাড়টা মনে হয়—যেন সমুদ্রেব শাদা ফেনার মত সবুজ জঙ্গলের মধ্যে ঝরে পড়ছে।

এই ছোট মনোরম শহরে পদার্পণ করবামাত্র, আমার মনে হল, এখানে কিছুদিন থাকা দরকার। যেদিকেই তাকাই, সুন্দর বন্ধুর পাহাড়ের চূড়ো—এদের মধ্যে সমুদ্র দেখা যায় না বললেই হয়। উপসাগরকে মনে হয় যেন একটা হ্রদ। এর নীল জল বেশ স্বচ্ছ আর ওপরের আকাশ নীল—দুই প্রস্থ নীলের কি সুন্দর মিলন—মনে হয়, যেন পরস্পর পরস্পরের প্রতিবিম্ব দেখছে পরস্পরের স্বচ্ছ আয়নায়।

বাউগি শহরটা পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষে পূর্ণ। সমুদ্রের ধারে এসব ধ্বংসাবশেষ দেখলে মনে হয়, যেন কোন রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য দেখছি। অতি প্রাচীন সারাসীন সভ্যতার নিদর্শন—তোরণদ্বার—তার ওপরে আইভিলতা জড়িয়ে উঠেছে, চারিদিকে কেবল প্রাচীন

সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ—রোমকদের তৈরি পাথরের দেওয়াল, সারাসীনদের স্মৃতিস্তম্ভ আর আরবদের তৈরি সৌধের ধ্বংসাবশেষ।

শহরের ওপর দিকে একটা মূরদের তৈরি ছোট বাড়ী আমি ভাড়া করেছিলাম। এসব বাড়ীর কথা তুমি জানো। এদের বর্ণনা প্রায়ই দেওয়া হয়। এসব বাড়ীর বাইরের দিকে মোটে জানলা থাকে না। কিন্তু মধ্যে উঠান থাকায় ওপর-নীচ সর্বত্র আলোকিত থাকে। এক তলায় একটা বড় ঠাণ্ডা ঘর থাকে। এ ঘরে দিনের বেলা কাটাতে হয়। তাছাড়া ছাদে থাকে পাঁচিলঘেরা খোলা জায়গা। এখানে রাত কাটাতে হয়।

আমি এ সব গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সকল অভ্যস্ত প্রথা শীঘ্র রপ্ত করে নিলাম। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর একটা নিটোল দিবানিদ্রা। এখন আফ্রিকার সবচেয়ে গরম কাল, নিঃশ্বাস টানতেও বেশ কষ্ট হয়, দম যেন আটকে আসে। মাঠ, ঘাট, রাস্তা সব যেন আগুনে জ্বলতে থাকে—কোথাও লোকজন দেখা যায় না, সবাই ঘুমোয়—পোশাক যত কম পারে ব্যবহার করে।

আমি আমাব বসবার ঘরে, যেখানে—আরব স্থপতির নিদর্শন হিসাবে থাম গাঁথা আছে—সেখানে একটা কোচ পেতে আমি জেবেল আমূরের কার্পেট দিয়ে মুড়ে রেখেছি। তাতে সামান্য পোশাক পরে, বিশ্রাম করবার চেষ্টা করি—কিন্তু ঘুমুতে পা. না—জগতে দুরকমের নির্যাতন আছে। আশা করি—এ সব তুমি কোনদিন জানবে না—জলের অভাব আর নারীর অভাব। এর মধ্যে কোনটা বেশি তাও আমি জানি না। মরুভূমিতে এক গ্লাস পরিষ্কার জলের জন্যে লোক যে কোন কেলেঙ্কারী করে বসতে পারে। আর এইসব দেশে জানিনা সুন্দরী নারী সঙ্গের জন্যে মানুষ কিনা করতে পারে। আফ্রিকায় নারীর অভাব নেই—বরং নারীর ছড়াছড়ি—কিন্তু তারা সাহারা মরুভূমিতে ক াগোলা জলের মতই অস্বাস্থ্যকর।

সে যাক্‌। একদিন অস্বাভাবিকভাবে চঞ্চল হয়ে আমি বৃথাই ঘুমের চেষ্টা করছিলাম। আমার পা কামড়াচ্ছিল, আমি অস্বস্তি বোধ করে কৌচে এপাশ-ওপাশ করছিলাম। অবশেষে আর সহ্য করতে না পেরে, বাইরে বেরিয়ে এলাম। তখন জুলাই মাসের মাঝামাঝি—সেদিন ভীষণ গরম। রাস্তা এত গরম যে তার উপর রুটি সেঁকা যায়। আমার শার্টটা ঘামে ভিজে আমার গায়ে সেঁটে ধরেছে! দিগন্তে শাদা বাষ্প উঠছে—যেন আগুনের শিখা।

আমি সমুদ্রের দিকে চললাম। বন্দর ঘুরে আমি উপসাগরের তীর ধরে চললাম, যেদিকে লোক স্নান করতে যায়। কেউ কোথাও নেই—কারো দেখা পাওয়া যায় না—কোন পাখি বা পশুর শব্দ শোনা যায় না—ঢেউগুলোও যেন নিঃশব্দে তটে এসে আছাড় খাচ্ছে—মনে হচ্ছিল প্রচণ্ড রোদে সমুদ্র যেন ঘুমোচ্ছে!

সহসা একটা পাহাড়ের আড়ালে, যেখানে পাহাড়ের অর্ধেক জলে ডুবে আছে—মনে হল যেন কি একটা নড়ছে। ফিরে তাকিয়ে ভাল করে দেখি যে, একটি ঢ্যাঙা উলঙ্গ মেয়ে বুক পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে স্নান করছে—নিঃসন্দেহে সে ভেবেছে যে, এই গরমের সময়ে সে একাকিনী। তার মাথাটা সমুদ্রের দিকে—সে আমাকে না দেখতে পেয়ে, জল থেকে উঠছে আর নামছে।

জলে সেই সুন্দরী নারীর ছবির চেয়ে আর কিছুই সুন্দর হতে পারে না—আলোর তেজে জল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। তাকে দেখাচ্ছে পাথরে খোদাই করা এক প্রতিমূর্তি। সে ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, আর কিছুটা সাঁতার কেটে, কিছুটা পায়ে হেঁটে পাহাড়ের আড়ালে লুকোলো। জানতাম সে বেরিয়ে আসবে। তাই আমি বেলাভূমিতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তখনি তার মাথাটা দেখা গেল—ঘন চুলে বিনুনি ঢাকা মাথা। মুখটা তার বড়, ঠোঁট দুটো মোটা, চোখ দুটো বড়ো বড়ো আর সাহসী—তার গায়ের চামড়া তামাটে, রোদে পোড়া আর খুব মসৃণ—ঠিক যেন হাতির চামড়ার মত।

সে চীৎকার করে আমাকে বললে, চলে যাও। আমি নড়লুম না' দেখে সে বললে, শোন, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা তোমার উচিত নয়।

আমি কিন্তু তবুও নড়লুম না। সে অদৃশ্য হয়ে গেল। দশ মিনিট কেটে গেল। তারপর তার চুল, তার কপাল, তার চোখ দুটো আবার দেখতে পাওয়া গেল—খুব ধীরে ধীরে, অনেক বিবেচনাব পর, মনে হল যেন সে লুকোচুবি খেলছে। এবাব সে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে উঠল, তুমি দেখছি আমাব ঠাণ্ডা না লাগিয়ে ছাড়বে না, যতক্ষণ তুমি আছো, ততক্ষণ আমি উঠছি না। একথা শুনে আমি উঠে চলে গেলাম, কিন্তু বাব বাব পিছন ফিবে তাকাতে তাকাতে গেলাম। যখন সে ভাবলে যে আমি অনেক দূবে চলে গেছি, তখন সে জল থেকে উঠে এল। আমার দিকে পিছন ফিরে সে হেঁট হয়ে তার সামনে ঝোলানো পেটিকোটটাব পিছনে পাহাড়ের আড়ালে চলে গেল।

আমি পবদিন আবাব সেখানে গেলাম। সেদিনও সে স্নান কবছিল কিন্তু একটা সাঁতাবেব পোশাক পরে সে এসেছিল। আমাকে দেখে সে হাসতে লাগল—তার সাদা সাদা দাঁতগুলো দেখতে পাওয়া গেল। এক সপ্তাহে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জমে গেল। আরো এক সপ্তাহে জমে উঠল প্রেম। তাব নাম ম্যারোকা—নামটা সে এমনভাবে উচ্চারণ করে যেন তাব মধ্যে 'র' অক্ষরটা আছে .গাটা ছয়। সে এক স্পেনীয় ঔপনিবেশিকের কন্যা আর এক ফরাসীর স্ত্রী, তার স্বামীর নাম পন্তাবেজ্। সে কোন সরকারী অফিসে কাজ করে—সে কাজ যে কি, তা আমি সঠিক জানতে পারিনি। এটুকু জেনেছি যে, সে সর্বদা কাজে ব্যস্ত। অন্য কিছু আর জানবার চেষ্টা করাও আমি দরকার মনে করিনি।

তারপর থেকে সে তার স্নানের সময় বদল করলে আর রোজ আমার বাড়ীতে এসে দিবানিদ্রার ব্যবস্থা করলে। আর সে কি দিবানিদ্রা! সে এক অপূর্ব মেয়ে, কতকটা পশুর মত কিন্তু চমৎকার। তার চোখ দুটো যেন সবসময়ে কামনায় জ্বলছে, তার আধ ফাঁক করা

মুখ, তার ধারালো ঝকঝকে শাদা দাঁত আর তার হাসি—সব মিলিয়ে ছিল এক ভয়ঙ্কর মাদকতামাখা। আর তার অদ্ভুত ছুঁচলো পুষ্ট বুক তার দেহকে এক পাশব প্রেমে মণ্ডিত করে ভালবাসার বিহারভূমি করে তুলেছিল। আমার মনে জাগত প্রাচীন গ্রীক দেবীদের কথা—যাঁরা ঘাসের উপর, গাছপালা ও জঙ্গলের মধ্যে তাঁদের মাধুর্য ছড়িয়ে গেছেন।

আর কি সারল্যে ভরা ছিল তার মন, যেন দুই আর দুইয়ে চার। চিন্তা-ভাবনার তাব বালাই ছিল না—কথায় কথায় ঝরণার মত কলকণ্ঠে সে হেসে উঠত।

সে নিজের দৈহিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে সজাগ ও গর্বিত ছিল। কোন রকম আবরণ সে ঘৃণা করত। আমার বাড়ীতে সে ছোটাছুটি দাপা-দাপি করে বেড়াতো, হই-হই চিৎকার করতো, শ্লীলতা বা ভব্যতার ধার ধারতো না। চিৎকার, দাপাদাপির পব ক্লান্ত হলে সে গভীব ঘুমে ঢলে পড়তো—তার বাদামী চামড়ার উপর অসহ্য গরমে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠত।

কখনো কখনো সে সন্ধ্যায় আবার আসতো, যখন তার স্বামী হয়ত কোথাও কাজে যেতো। তখন আমরা দুজন ছাদে কোন পাৎলা ফিনফিনে কাপড়ে দেহ ঢেকে একসঙ্গে শুয়ে থাকতাম। চাঁদের আলোয় যখন সারা শহর আর উপসাগর ভেসে যেত, আব পাহাড়ে পর্বতে পিছলে পড়ত তার আভা, তখন আমরা আর সব ছাদে ছায়ামূর্তির নড়াচড়া দেখতাম, তারা স্থান পবিবর্তন করতো আবাব শুয়ে পড়তো সেই তারকাখচিত রাতের গরমে।

আফ্রিকাব রাত্রির ঔজ্জ্বল্য সত্ত্বেও ম্যাবোকা জেদ করে উলঙ্গ হয়ে থাকতে চাইতো চাঁদের আলোয়—কেউ আমাদের দেখলে কি দেখলে না, তা নিয়ে তার মাথাব্যথা ছিল না। আর আমার নিষেধ ও অনুরোধ অগ্রাহ্য কবে এমন জোরে জোরে চেঁচিয়ে উঠত যে, রাস্তাব কুকুরগুলোও চমকে ডেকে উঠত।

এক রাতে আমি তারার আলোয় ছাদে ঘুমোচ্ছি, সে এসে আমার কার্পেটের উপর, হাঁটু মুড়ে বসল আর তার বাঁকানো ঠোঁট আমার মুখের খুব কাছে নিয়ে বললে, "তোমাকে আমার বাড়ীতে গিয়ে থাকতে হবে।"

আমি তার কথা ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি বলছ তুমি?" সে বললে, "যা বলছি তা এই, আমার স্বামী বেরিয়ে গেলে, তোমাকে আমার বাড়ীতে গিয়ে আমার সঙ্গে থাকতে হবে।"

আমি না হেসে থাকতে পারলাম না, বললাম, 'কি দরকার? তুমি ত আসছ!'

সে আমার মুখের উপর মুখ রেখে কথা বলতে লাগল, তার গরম নিঃশ্বাস আমার গলা পর্যন্ত পৌঁছতে লাগল আর তার ঠোঁট দিয়ে সে আমার গোঁফ ভিজিয়ে ফেললে।

'আমি স্মৃতিহিসাবে এটা চাই।'

তবুও আমি তার কথার ঠিক মত অর্থ করতে পারলাম না। তখন সে তার দুহাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে বললে, "যখন তুমি এদেশ ছেড়ে চলে যাবে, তখন আমি একথা ভাবব।"

কথাটা আমার মনে লাগল এবং মনে মনে একটু মজাও অনুভব করলাম। বললাম, "নিশ্চয় তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে— : এইখানে থামা বোধহয় ভাল।"

সত্য কথা বলতে কি, যেখানে দাম্পত্য প্রেমের আস্তানা, সেখানে আমি কোনরকম ব্যভিচার করতে চাই না। ওসব হল ইঁদুরকল। ওখানে, বেহিসেবীরা প্রায়ই ধরা পড়ে যায়। কিন্তু সে সাধ্যসাধনা, কাকুতিমিনতি করতে লাগল, এমনকি কেঁদেও ফেলল। অবশেষে বলে ফেলল, "দেখবে সেখানে আমি কেমন করে তোমাকে ভালবাসি!"

তার ইচ্ছা এমন অদ্ভুত যে, কিছুতেই আমি সেটা আমার মনকে বোঝাতে পারলাম না! অনেক ভেবে দেখলাম যে, তার স্বামীর ওপর তার গভীর কোন ঘৃণা থেকেই এ কল্পনা তার মনে এসেছে। সে

প্রতিশোধ চায়। তার স্বামীকে ঠকাতে চায়। তার নিজের বাড়ীতেই সে তাকে ঠকাতে চায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার স্বামী কি তোমার উপর নির্দয় ব্যবহার করে ?

সে আমার দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, "আরে না না। সে খুব সদয় ব্যবহার করে।"

"কিন্তু তুমি তাকে পছন্দ কর না নিশ্চয় ?"

সে বড়ো বড়ো চোখ মেলে আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "তা কেন ? আমি তাকে খুব পছন্দ করি, খুব ভালবাসি; কিন্তু তোমাকে যত ভালবাসি, ঠিক ততটা ভালবাসি না।"

আমি ব্যাপারটা ঠিক মত বুঝতে পারলাম না—ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করছি, তখন সে আমাকে মুহুর্মুহূঃ চুমু খেতে খেতে ফিস্ ফিস্ করে বললে, "কিন্তু তুমি আসবে, আসবে না ?"

আমি রাজী না হবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি—এমন সময়ে সে সহসা উঠে চলে গেল। এক সপ্তাহ সে আর এল না। অষ্টম দিনে সে ফিরে এল, গম্ভীরভাবে আমার দোরের কাছে এসে দাঁড়াল আর জিজ্ঞাসা করলে, "আজ রাতে আমার বাড়িতে আসছ কি ? যদি যেতে না চাও, আমি চলে যাবো।"

বন্ধু, আটদিন আফ্রিকায় বড় দীর্ঘ সময়, আট মাসের মত। আমি বললাম, 'হ্যাঁ আসব' আর দুই হাত বাড়িয়ে দিলাম। সে ঝাঁপ দিয়ে আমার আলিঙ্গনে ধরা দিল।

রাত্রে সে একটা কাছাকাছি রাস্তায় আমার জন্যে অপেক্ষা করে রইল আর আমাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে গেল। বাড়িটা বন্দরের কাছে আর খুব ছোট। আমি প্রথমে রান্নাঘরের মধ্য দিয়ে গেলাম। এখানে তারা খাওয়া-দাওয়া করত। তারপরে চুনকাম করা একটা ছিমছাম ঘরে গেলাম—দেওয়ালে বাঁধানো ফটোগ্রাফ ঝোলানো আর একটা কাচের আলমারিতে কাগজের নানারকম ফুল সাজানো।

ম্যারোকার খুশি আর ধরে না! সে আনন্দে লাফাতে লাগল, বললে, "এবার কেমন স্বচ্ছন্দ ত! এ ঠিক তোমার নিজের বাড়ী।" আমি অবশ্য বেশ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করছিলাম, তবে কতকটা বিব্রত আর কতকটা আড়ষ্ট ও অস্বস্তি বোধও করছিলাম।

হঠাৎ সদর দরজায় একটা জোর ধাক্কার শব্দ শুনে আমরা চমকে উঠলাম। একজন পুরুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ম্যারোকা, আমি।"

সে চমকে উঠল। "আমার স্বামী! এখানে, এই খাটের তলায় লুকোও, তাডাতাড়ি।"

আমি পাগলের মত আমাব কোট খুঁজছিলাম। সে আমাকে ঠেলা দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "চলে এসো, চলে এসো!"

আমি উপুড় হয়ে সটান শুয়ে পড়লাম। আর একটিও কথা না বলে খাটের তলায় গুঁড়ি মেরে চলে গেলাম। সে রান্নাঘরে চলে গেল। শুনলাম সে একটা আলমারি খুলল, তারপর আবার সেটা বন্ধ করল, আর কি একটা জিনিস নিয়ে আবার সেই ঘরে ফিরে এল। জিনিসটা যে কি তা আমি দেখতে পেলাম না—সেটা সে তাড়াতাড়ি রেখে দিল। তার স্বামী অধৈর্য হয়ে উঠছিল।

ম্যারোকা শান্তস্বরে বললে, "দেশলাই খুঁজে পাচ্ছি না যে।" হঠাৎ সে বলে উঠল, "এই যে দেশলাই, আমি এসে তোমাকে দরজা খুলে দিচ্ছি।"

লোকটা ঘরে এসে ঢুকলো। আমি তার পা-দুটো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না—পা-দুটো বিরাট। তার শরীর যদি এই পায়ের অনুপাতে হয়, তবে লোকটি এক দৈত্য বিশেষ।

চুমু খাবার শব্দ শুনলাম। ওর খালি চামড়ার ওপর ছোট্ট একটা চাপড়ের শব্দ আর একটা হাসির শব্দ। লোকটা মার্শেইবাসীর ভাষার টানে বলল, "আমার টাকার থলি নিয়ে যেতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কাজেই বাধ্য হয়ে আবার ফিরে আসতে হল; তুমি ত অঘোরে ঘুমুচ্ছিলে!"

সে আলমারির কাছে গেল আর অনেকক্ষণ ধরে যা চাইছিল তা নিল। আর ম্যারোকা বিছানায় শুয়ে পড়েছিল যেন কতই ক্লান্ত। সে তার কাছে গেল আর নিঃসন্দেহ তাকে আদর করতে চেষ্টা করল। আর ম্যারোকা রেগে তাকে ধমকালো।

লোকটার পা দুটো আমার এত কাছে ছিল যে বোকার মত একটা দুর্বোধ্য ঝোঁক হ'ল, সে দুটো জাপটে ধরতে—কিন্তু ঝোঁকটা আমি সামলে নিলাম। যখন সে দেখল যে, তার চেষ্টা নিষ্ফল, তখন সে রেগে উঠে বলল, "আজ রাতে তুমি এমন খাপছাড়া আর বেসুর হলে, আচ্ছা চলি।"

আরেকটা চুমু খাবার শব্দ শুনলাম। সেই গোদা পা দুটো পাশের ঘরে গেল, তখন তার জুতোর তলার শুধু পেরেকগুলো দেখতে পেলাম। সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমারও ফাঁড়া কেটে গেল।

আমার মনটা খুব ছোট হয়ে গেল। তখন ধীরে ধীরে লুকোনো জায়গা থেকে বার হয়ে এলাম। ম্যারোকা আমাকে ঘিরে এক পাক নেচে নিল, হো হো করে হেসে হাততালি দিল। আমি একটা চেয়ারে দুম্ করে বসে পড়লাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। কারণ, কি একটা ঠাণ্ডা জিনিসের ওপর আমি বসেছিলাম —আর ম্যারোকার মত আমারও পরণে কোন পোশাক ছিল না বলে জিনিসটার স্পর্শে ও ঠাণ্ডায় আমি চমকে উঠেছিলাম। আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম। যে জিনিসটার ওপর আমি বসে পড়েছিলাম, সেটা একটা ছোট কুড়ুল, কাঠকাটার জন্য ব্যবহার করা হয়—সেটা ছুরির মত ধারালো। কি করে সেটা ওখানে এল? যখন ঘরে এসেছিলাম, তখন ত নিশ্চয় ওটা ওখানে ছিল না। কিন্তু আমাকে লাফিয়ে উঠতে দেখে ম্যারোকা হেসে ককিয়ে উঠল আর দুহাত দুদিকে রেখে কেবলি হাসতে লাগল।

মনে হল এত হাসি অপ্রাসঙ্গিক। বোকার মত আমাদের মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে হয়েছিল—তখনো আমার সারা গা ভয়ে শিরশির

করছিল। ওকে বোকার মত হাসতে দেখে আমি অবাক হলাম।

আমি বললাম, "ধরো, যদি তোমার স্বামী আমাকে দেখে ফেলতো ?"

সে বললে, "তাতে কোন বিপদ হত না।"

"কি বলছ তুমি ? বিপদ হত না ? ঠাট্টা করছ আমার সঙ্গে ? সে নীচু হয়ে ঝুঁকলেই আমাকে দেখতে পেত।"

সে আর হাসল না। সে শুধু তার আয়ত চোখ দুটি আমার দিকে তুলে তাকাল—সে চোখ আনন্দে ঝল্‌মল্‌ করছে।

"সে কখনো ঝুঁকতো না।"

"কেন ?" তখনো আমি তর্ক চালাচ্ছি—, "ধর তার টুপীটা মেঝেতে পড়ে গেল, সে নিশ্চয় সেটা তুলে নিত আর তখন আমাকে এই অবস্থায় আত্মরক্ষা করতে হত—সেটা কি খুব জুতসই হত ?"

সে তার নরম অথচ সবল দুটি হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে স্বর খাটো করে বললে, যেন বলছে, 'আমি আমি তোমাকে পূজো করি। তাহলে তাকে আর কোন দিনই উঠে সিধে হয়ে দাঁড়াতে হত না।"

তার কথা ঠিক মত বুঝতে না পেরে আমি বললাম, "তার মানে ?"

সে চোখ মটকে আমি যে চেয়ারে বসতে গিয়েছিলাম, সে দিকে হাত বাড়িয়ে হেসে, ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক করে তার ধারালো ভয়ঙ্কর দাঁত বার করে সেই ছোট কুড়ুলটার দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করল। তার ধারালো ফলাটা মোমবাতির আলোয় ঝক্‌ঝক্‌ করছে। সে সেটা তুলে নিতে হাত বাড়াবার সময় বাঁ হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে তার কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে আমার ঠোঁটের উপর তার ঠোঁট রেখে ভঙ্গী করে দেখালো যেন হাঁটু গেড়ে বসা একটা লোকের গলা সে কেটে ফেলছে।

বন্ধু! এই হল এদেশের দাম্পত্য প্রেম, আতিথেয়তা আর ভালবাসার নির্দশন।

---

## দুই

### ॥ বোঝাপড়া ॥

ঘরের মধ্যে বেশ গনগনে আগুন জ্বলছে আর টেবিলের ওপর দুজনের চা তৈরির সরঞ্জাম সাজানো। কাউন্ট গু স্ম্যালার তাঁর টুপী, দস্তানা, আর ফারকোট একটা চেয়ারে ছুড়ে ফেলছিলেন আর কাউন্টেস্ তাঁর অপেরার পোশাক খুলে আয়নায় মুখ দেখে সাময়িক-ভাবে হাসছিলেন আর জড়োয়ার আংটিশোভিত আঙুল দিয়ে তাঁর কপাল থেকে ঝোলা অলকগুচ্ছ ঠিক করে গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। তাঁর স্বামী কিছুক্ষণ ধরেই তাঁর দিকে তাকিয়ে কি যেন বলি-বলি করছিলেন। অথচ, ইতস্ততঃ করে বলছিলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি বলেই ফেললেন, "আজ যা বাচালতা করছ!" গর্বের ভঙ্গিতে তিনি স্বামীর দিকে উদ্ধতভাবে তাকিয়ে বললেন, "বেশত! কিন্তু কেন একথা বলছ?" তিনি এসে বসলেন, চা কাপে ঢাললেন। তাঁর স্বামী তাঁর বিপরীত দিকে এসে বসলেন।

"এতে আমার অবস্থা এমন হাস্যকর হয়েছিল।"

তাঁর স্ত্রী ভুরু কুঁচকে বললেন, "একথা কেন? তুমি কি আমার ব্যবহার সম্বন্ধে সমালোচনা করতে চাইছ?"

"না, না, আমি বলতে চাইছিলাম যে, তোমার প্রতি মঁশিয়ে বুরেলের মনোযোগ অনুচিত, এটা অভদ্র দেখাচ্ছিল। আমার যদি ক্ষমতা থাকত, আমি এটা সহ্য করতাম না।"

"আরে আরে, তোমার হল কি? গত বছর তোমার যে মতামত ছিল, তা বদলে গেছে দেখছি! এক বছর আগে মনে হত যে, কে আমার সঙ্গে প্রেম করছে আর কে করছে না, তা নিয়ে তুমি মাথা ঘামাতে না। যখন আমি জানতে পারলাম যে, তোমার একজন

উপপত্নী আছে, আর তাকে তুমি মনে প্রাণে ভালবাস, তখন আমি তোমাকে সে কথা বলেছিলাম যেমন আজ রাত্রে তুমি আমাকে বললে ( আমার তোমাকে বলবার অনেক কারণ ছিল ) যে, তোমার আর মাদমোয়াজেল সারভির ব্যবহারে আমি ব্যথিত হয়েছি আর আমাকে হাস্যাস্পদ মনে করছি, তখন তুমি আমাকে কি উত্তর দিয়েছিলে ? 'আমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে যা কিছু করবার। দুজন বুদ্ধিমান আর বুদ্ধিমতী যুগলের বিবাহ মানে অংশীদারিত্ব—সামাজিক বন্ধনমাত্র, নৈতিক বন্ধন নয়। সে কথা কি সত্যি নয় ? তুমি আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে, তোমার উপপত্নী আমার চেয়ে অনেক বেশী আকর্ষণীয়া আর তার মধ্যে অনেক বেশী নারীত্ব রয়েছে। হুঁ, ঐ কথাই তুমি আমাকে বলেছিলে। অবশ্য, সব কিছুই তুমি খুব সুন্দরভাবে বলেছিলে—আর আমি স্বীকার করছি যে, যাতে আমার মনে আঘাত না লাগে সে বিষয়ে তুমি খুব যত্ন নিয়েছিলে—সেজন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তবে, তোমার কথা আমি বেশ ভাল করে বুঝেছিলাম।

তখন আমরা ঠিক করেছিলাম যে, আমরা পরস্পর থেকে আলাদা থাকব—অর্থাৎ এক বাড়ীতে থাকব—কিন্তু পরস্পরের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবো না। আমাদের একটা সন্তান হয়েছিল কিন্তু জগতের সামনে মুখরক্ষা করার জন্য তুমি আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলে যে যদি আমি কারো সঙ্গে প্রেম করার ইচ্ছা করি তুমি একটুও আপত্তি করবেনা, অবশ্য আমি যেন ব্যাপারটা গোপন রাখি। মনে আছে এ বিষয়ে তুমি বেশ লম্বা এক বক্তৃতায় মেয়েদের চাতুরির কথা আমাকে বলেছিলে—কি সুন্দরভাবে তারা এসব ব্যাপার সামলায়—ইত্যাদি ইত্যাদি। সে সবকথা আমি খুব ভালকরে বুঝেছিলাম, মশাই। সে সময়ে তুমি মাদমোয়াজেল সারভির প্রেমে ডুবুডুবু আর আমার দাম্পত্য, আইনসঙ্গত প্রেম তোমার সুখের পথে এক প্রকাণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু, তারপর থেকে আমরা দুজনে বেশ বনিয়ে

চলেছি। আমরা একসঙ্গে সমাজে মিশতে যাই, সত্যি, কিন্তু এখানে আমাদের নিজেদের বাড়ীতে আমরা অপরিচিত। কিন্তু গত দু এক মাস হল লক্ষ করছি যে, তুমি ঈর্ষাপরায়ণ হচ্ছ। এটা আমি যেন ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"আমি ঈর্ষা করছিনা, তবে তোমার বয়স অল্প আর তুমি একটু বেশি মাত্রায় ভাবপ্রবণ। তাই ভয় হয় পাছে জগতের কাছে তুমি না ধরা পড়ে যাও।"

"তোমা' কথা শুনে হাসি পায়। তোমার এমন ব্যবহার মোটেই সন্দেহাতীত নয়। তুমি যা করো না কেন, আমাকে কিন্তু তা করতে উপদেশ দিতে এসো না।"

"হেসো না, দোহাই তোমার। এটা মোটেই হাসির ব্যাপার নয়। আমি বন্ধুর মত বলছি। সত্যিকারের বন্ধুর মত। আর তুমি যে সব মন্তব্য কবলে, তা অতিমাত্রায় অতিরঞ্জিত।"

"না, একেবারেই অতিরঞ্জিত নয়। যখন তুমি আমার কাছে মাদমোয়াজেল সারভির প্রতি তোমার মোহের কথা অকপটে স্বীকার করেছিলে, তখন আমি ত ধবে নিয়েছিলাম যে, তুমি আমাকে তোমার মত করতে ক্ষমতা দিলে। কিন্তু আমি তা করিনি –

"আমার কথা শোন -"

"আমার কথায় বাধা দিওনা। আমি সেরকম করিনি। আজ পর্যন্ত আমার কোন প্রেমিক নেই। আমি একজন প্রেমিক খুঁজছি কিন্তু মনের মত কাউকে পাইনি। সে খুব সুন্দর হবে—তোমার চেয়েও সুন্দর—এটা অবশ্য তোমার প্রশংসা হয়ে গেল—কিন্তু মনে হচ্ছে এর মর্যাদা তুমি দিচ্ছনা।"

"এ ঠাট্টা সম্পূর্ণ অবান্তর। এর কোন দরকারই ছিল না।"

"আমি আদৌ ঠাট্টা করছিনা—আমি সব কথা ঐকান্তিকভাবে বলছি। এক বছর আগে আমাকে যা যা বলেছিলে, তার এক বর্ণও আমি ভুলে যাইনি। আমি. আমার খুসি মত কাজ করব, তা তুমি

যাই বলো আর যাই করো। আমি একজন প্রেমিক পছন্দ করে' নেব। তুমি সন্দেহই করতে পারবেনা, তুমি একটুও জানতেও পারবেনা—যেমন অনেক কিছুই তুমি জানো না।"

"এসব কথা তুমি কি করে বলতে পারলে ?"

"এসব কথা আমি কি করে বলতে পারলুম ? কিন্তু, মশাই, তুমিই প্রথমে হেসেছিলে, যখন মাদমোয়াজেল দ্য গার্র্স বেচারা মাদমোয়াজেল সারভি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেছিল। মাদ-মোয়াজেল সারভিও তখন সন্দেহ করেনি।"

"তা হতে পাবে। কিন্তু তোমার ভাষা খুব ভব্য নয়।"

"বটে! তুমি মনে কর যখন মাদমোয়াজেল সারভি সম্বন্ধে কথ হয়, তখন সেটা ঠাট্টা। কিন্তু যখন আমার সম্বন্ধে কথা হয়, তখন তোমার কথাটা উপযুক্ত মনে হয় না। পুরুষরা কি অদ্ভুত জীব! সে যাই হোক, এসব বিষয়ে আমি কথা বলতে ভালবাসিনা। আমি শুধু এই কথাব উল্লেখ করলাম যে, তুমি প্রস্তুত আছ কিনা ত' জানতে।"

"কিসের জন্য প্রস্তুত ?"

"প্রবঞ্চিত হবার জন্যে প্রস্তুত। যখন ওসব কথা শুনে মানুষ রেগে ওঠে, তখন বুঝতে হবে যে, সে ঠিক প্রস্তুত নয়। আমি বাজী রাখছি যে, দুমাসের মধ্যে আমি যদি কোন প্রবঞ্চিত স্বামীর কথা বলি ত, তুমিই সর্বপ্রথমে হাসবে। যখন তুমিই সেই প্রবঞ্চিত স্বামী, তখন সাধারণতঃ এই রকম হয়।"

"একি, আজ রাত্রে তুমি রীতিমত রূঢ় কথা বলা শুরু করলে। তোমাকে ত কখনো এমন দেখিনি!"

"তা সত্যি। আমার পরিবর্তন হয়েছে। আমি খারাপ হয়ে গেছি কিন্তু সে দোষ তোমার।"

"এসো, আর ঠাট্টা নয়। এবার গুরুত্বপূর্ণ কথায় আসা যাক্। আমি হাতজোড় করে তোমার কাছে কাতরভাবে মিনতি জানাচ্ছি,

দোহাই তোমার। মঁশিয়ে বুরেলকে আর আজকের মত তোমার সঙ্গ দিও না।”

“তোমার ঈর্ষা হয়েছে? এ আমি জানতাম।”

“না, না, তা নয়। আমি লোকের ঠাট্টার পাত্র হতে চাই না। আজ তোমার দিকে ও যেভাবে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল, সেভাবে তাকে তাকাতে দেখলে আমি তাকে কষে ঠ্যাঙান দেব।”

“তাহলে এটা কি সম্ভব যে, তুমি আমার প্রেমে পড়ে গেছ?”

“কেন পড়ব না? এর চেয়ে আরো খারাপ কিছু আমি করে বসতে পারতাম।”

“ধন্যবাদ। তোমার জন্য সত্যিই দুঃখিত। কারণ, আমি আর তোমাকে ভালবাসি না।”

কাউণ্ট উঠলেন। চায়ের টেবিলের চারধার ঘুরে এলেন আর তাঁর স্ত্রীর ঠিক পিছনে গিয়ে তাঁর কাঁধে চুম্বন করলেন। স্ত্রী লাফিয়ে উঠলেন, তাঁর চোখ জ্বলতে লাগল, “কি সাহসে এতদূর অগ্রসর হলে? মনে থাকে যেন—আমরা পরস্পরের কাছে অজানা—আমাদের মধ্যে আদৌ কোন পরিচয় নেই।”

“দয়া করে রাগ কোরো না। এ না করে আমি পারছিলাম না। আজ রাতে তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে!”

“তা হলে ইতিমধ্যে আমার রূপ বেড়েছে—বলতে হবে!”

“সত্যিই তোমাকে আজ চমৎকার দেখাচ্ছে। তোমার হাত দুটো, তোমার কাঁধ সুন্দর, সুডৌল আর তোমার গায়ের রং—”

“মঁশিয়ে বুরেলকে মুগ্ধ করবে।”

“উঃ তোমার মন কত নীচ! সত্যি বলছি, মনে পড়ছে না যে তোমার মত এত সুন্দর মহিলা কোন দিন দেখেছি কি না।”

“বর্তমানে কি তোমার উপবাস চলছে?”

“তার মানে?”

“এই বলছি যে, বর্তমানে তুমি নিশ্চয়ই না খেয়ে আছ।”

"কেন? এর মানে কি বলতে চাইছ?"

"যা বলছি তাই বোঝাতে চাইছি। তুমি কিছুকাল অনাহারে আছ, তাই ক্ষিদের জ্বালায় কাতর হচ্ছ। ক্ষুধার্ত হলে লোক এমন জিনিস খায়, যা সে অন্য সময়ে খায় না। আমি হচ্ছি সেই অনাদৃত খাবার, যা আজ রাতে খেতে তোমার অনিচ্ছা হবে না।"

"মার্গারেট, এসব কথা বলতে কে তোমায় শেখালে?"

"তুমিই শিখিয়েছ। আমি যতদূর জানি তোমার চারজন উপপত্নী আছে। অভিনেত্রী, সামাজিক মেয়ে, ফুর্তিবাজ মেয়ে ইত্যাদি। কাজেই আমার প্রতি তোমার এই আকস্মিক ঝোঁক আমি আর কিভাবে ব্যাখ্যা করব? তুমি দীর্ঘকাল উপবাসী—এছাড়া এর আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা কি হবে?"

"তুমি আমাকে পশু ভাবতে পার, আমার এই আবেগকে পাশবিক ভাবতে পার। কিন্তু আমি দ্বিতীয়বার তোমার প্রেমে পড়ে গেছি। আমি তোমার প্রেমে পাগল!"

"বেশ, বেশ, তাহলে তুমি চাইছ—"

"ঠিক বলেছ।"

"আজ রাত্রেই?"

"উঃ, মার্গারেট!"

"এইত! আবার কেলেঙ্কারী করছ! শান্তভাবে কথা কই এস। আমরা পরস্পরের কাছে অপরিচিত, তাই নয় কি? আমি তোমার স্ত্রী— একথা সত্যি কিন্তু তা হলেও আমি স্বাধীন। আমি অন্য কোন লোককে ভালবাসব ভেবেছিলাম কিন্তু আমি তোমাকে অগ্রাধিকার দেব—শর্ত হল, যেন আমি একই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাই।"

"তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি কি বলতে চাইছ বলো ত!"

"আচ্ছা, আরো পরিষ্কার করে বলছি। তোমার উপপত্নীদের মত আমি সুন্দরী কি?"

"হাজার গুণ বেশি সুন্দরী।"

"সবচেয়ে সুন্দরীটির চেয়েও ভাল কি?"

"হ্যাঁ, বলছি ত, হাজার গুণে সুন্দরী—।"

"তিনমাসে তার পিছনে কত টাকা খরচ করেছ?"

"আচ্ছা, এসব কথা অর্থ কি?"

"এই আমি জানতে চাইছি যে, তোমার উপপত্নীদের মধ্যে সবচেয়ে যে সুন্দরী, তার জন্য তুমি কত খরচ করেছ। গয়নাগাঁটি, শাড়ী পোশাক, গাড়ী ভাড়া, হোটেল খরচ—এই সব বাবদ গত তিন মাসে?"

"সে কি করে বলব!"

"তোমার জানা উচিত। ধরো, মাসে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ—প্রায় ঐ পরিমাণ কি?"

"হ্যাঁ, প্রায় ঐ পরিমাণ।"

"তবে শোনো মশাই, আমাকে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ দিও, আমি একমাসের জন্য তোমার হব—আজ রাত থেকে শুরু করে।"

"মার্গারেট, তুমি কি পাগল হলে?"

"না, তা হইনি। তবে তুমি যা বলো। আচ্ছা, শুভরাত্রি।"

কাউণ্টেস তাঁর সাজঘরে ঢুকলেন। একটা মৃদু সুগন্ধ সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। দরজার কাছে কাউণ্টকে দেখা গেল:

"আঃ! এখানে কি সুন্দর গন্ধ আসছে!"

"তাই নাকি? আমি সর্বদা এই এসেন্স ব্যবহার করি। এ ছাড়া অন্য কোন এসেন্স আমি ব্যবহার করি না।"

"তাই বুঝি! আমি লক্ষ্য করিনি—গন্ধটা ভারি চমৎকার।"

"হতে পারে। কিন্তু দয়া করে এখন যাও। আমি শুতে যাবো।"

"মার্গারেট?"

"দয়া করে যাবে কি?"

কাউণ্ট ঘরের মধ্যে এসে চেয়ারে বসলেন।

কাউণ্টেস বললেন, "তুমি তা হলে যাবেনা? বেশ!"

কাউন্টেস ধীরে ধীরে তাঁর কোমর-বন্ধনী খুলে ফেললেন। তাঁর শুভ্র বাহু আর কাঁধ দেখা গেল। তারপর তিনি তাঁর বাহুদ্বয় মাথার উপর তুলে চুল খুলতে শুরু করলেন।

কাউন্ট তাঁর দিকে একপা বাড়ালেন।

কাউন্টেস বললেন, "আমার কাছে এসো না, তা হলে আমি সত্যি সত্যি রেগে যাব। শুনতে পাচ্ছ কি ?"

কাউন্ট তাঁকে তাঁর বাহুর মধ্যে জড়িয়ে এক চুমু খাবার চেষ্টা করলেন। তাড়াতাড়ি কাউন্টেস এক গামলা সুগন্ধি জল টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে কাউন্টের মুখের উপর ছুঁড়ে দিলেন।

কাউন্ট ভীষণ রেগে গেলেন। কয়েক পা পিছিয়ে এসে তিনি বিড় বিড় করে বলে উঠলেন, "এসব কি বোকার মত কাণ্ড করছ ?"

"কিন্তু আমার শর্ত ত তোমার জানা আছে! পাঁচ হাজার ফ্রাঁ।"

"অসম্ভব।"

"কেন, অসম্ভব ?"

"কেন ? কে কবে শুনেছে যে কোন স্বামী তার স্ত্রীকে টাকা দিয়ে উপভোগ করে ?"

"উঃ, তুমি কি ভীষণ অসভ্য !"

"আচ্ছা, ধরে নিলুম আমি অসভ্য। কিন্তু আমি আবার বলছি, নিজের স্ত্রীকে টাকা দিয়ে উপভোগ করার ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর অসম্ভব, অযৌক্তিক।"

"ফুর্তিবাজ মেয়ের পিছনে টাকা খরচ করার চেয়ে খারাপ নয় নিশ্চয় ? তাছাড়া বাড়ীতে স্ত্রী থাকতে এসব করা কি বোকামি নয় ?"

"তা হতে পারে। কিন্তু আমি হাস্যাস্পদ হতে চাই না।"

কাউন্টেস বিছানায় ধারে এসে বসলেন। তাঁর মোজা খুলে ফেললেন। তাঁর খালি লালচে পা দুটো দেখা গেল।

কাউন্ট তাঁর একটু কাছ ঘেঁষে সরে বসে মোলায়েম স্বরে বললেন, "মার্গারেট, এ তোমার কি অদ্ভুত কথা !"

"কি কথা?"

"আমার কাছ থেকে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ চাওয়া।"

"অদ্ভুত? অদ্ভুত কেন হবে? আমরা কি সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়? তুমি বলছ যে, তুমি আমার প্রেমে পড়ে গেছ—বেশ ভাল কথা—অতি উত্তম কথা। তুমি আমাকে বিয়ে করতে পার না—কারণ, ইতিমধ্যেই আমি তোমার স্ত্রী হয়েছি। কাজেই, এখন আমাকে কিনে নাও। ভগবানের দিব্য, অন্য মেয়েদের কি তুমি কিনে নাওনি? আমাকে ঐ টাকা দেওয়া কি অন্য মেয়েকে টাকা দেওয়ার চেয়ে ভাল না? ওরা ত ঐ টাকা বাজে খরচে উড়িয়ে দেবে। শোনো, তুমি বলবে যে, নিজের স্ত্রীকে টাকা দিয়ে উপভোগ করা একটা অভিনব ব্যাপার। তোমার মত বুদ্ধিমান লোক সহজেই বুঝতে পারবে যে, এটা খুব মজার ব্যাপার। তাছাড়া, অনেক টাকা খরচ না হলে, কেউ কোন জিনিসকে সত্যি সত্যি ভালবাসে না। এতে আমাদের দাম্পত্য প্রেমে নতুন উৎসাহ আসবে, অন্ততঃ তোমার অবৈধ প্রেমের তুলনায়। কি, আমি ঠিক কথা বলিনি?"

তিনি ঘণ্টাটার দিকে এগিয়ে গেলেন। "মশাই, এখন যদি না সরে পড়েন, তবে আমি ঘণ্টা বাজিয়ে চাকরানীকে ডাকব।"

কাউণ্ট বিমূঢ়ভাবে উঠে দাঁড়ালেন, মুখে তাঁর অসন্তুষ্ট ভাব ফুটে উঠল। সহসা একমুঠো ব্যাঙ্কনোট তাঁর পকেট থেকে বার করে তাঁর স্ত্রীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "নে, নে ছ হাজার ফ্রাঁ, ডাইনী কোথাকার—কিন্তু মনে রাখিস্—"

কাউণ্টেস নোটগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, কি বলছিলে?"

"এতে অভ্যস্ত হলে চলবে না কিন্তু।"

কাউণ্টেস হো-হো করে হাসিতে ফেটে পড়ে বললেন, "প্রত্যেক মাসের জন্য পাঁচ হাজার ফ্রাঁ। আর তা না হলে, তোমাকে তোমার অভিনেত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেব। আর যদি আমাকে পেয়ে খুশি হও, আমি আরো বেশি চাইব।"

## তিন

### ॥ প্রতিহিংসা ॥

পাওলো স্যাভেরিনির বিধবা স্ত্রী একাকিনী তার পুত্রকে নিয়ে একটা সামান্য ছোট বাড়ীতে থাকত। বাড়ীটি ছিল বনিফেসিও দুর্গের প্রাচীরের উপর। শহরটা পাহাড়ের ধারে পাথরের তৈরি।

সেখান থেকে সমুদ্র দেখা যায়। মনে হয় যেন, বাড়ীগুলো পাহাড়ের গা থেকে ঝোলানো। সার্ডিনিয়ার একেবারে নিম্নাংশ—শহরটা পাহাড়ে কণ্টকিত গিরিপথের মধ্যে অবস্থিত। বিপরীত দিকে সমুদ্রের ওপারে পাহাড়ের ধার কাটা একটা বারান্দার মত—এটাই বন্দর। অনেক দূর ঘুরে তবে প্রথম বাড়ীতে যাওয়া যায়। ছোট ছোট ইতালীয় আর সার্ডিনীয় মেছো নৌকো এখানে দেখা যায়। সপ্তাহে দুবার পুরোণো একটা স্টীমার যাতায়াত করে, এখান আর আজাস্‌সিওর মধ্যে।

পাহাড়ের ওপর বাড়ীগুলো শাদা দেখায়। মনে হয় যেন, নো সামুদ্রিক পাখীর বাসা সব—পাহাড়ের সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে—নীচে ভয়ঙ্কর উত্তাল সমুদ্র, যাতে জাহাজ ভয়ে ভয়ে পাড়ি জমায়। ঝড় কেবল সমুদ্রকে উত্তাল করে দিচ্ছে—বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। ঝড়ের দাপটে তটের ঘাস মনে হয় কে যেন খুবলে খেয়ে নিয়েছে—ঝড় প্রচণ্ড বেগে বয়ে গিরিপথকে গাছপালা-শূন্য করে রেখেছে। পাহাড়ের অনন্ত শ্রেণীর মধ্যে মধ্যে কালো কালো অংশে সমুদ্রের শাদা ফেনা জমে ঝড়ে নড়ছে চড়ছে—মনে হচ্ছে তারা জলের ওপর স্পন্দিত হচ্ছে।

পাহাড়ের চূড়োর কাছে আটকানো বিধবা স্যাভেরিনির বাড়ীটার তিনটি জানলা। সেই জানলা খুললে নির্জন শূন্য আকাশ খাঁ খাঁ করছে দেখা যায়।

সে একাকিনী সেখানে বাস করত। সে, তার একমাত্র ছেলে আন্তোয়েন আর একটা বিরাট কুকুর নিয়ে ছিল তার সংসার। কুকুরটা লম্বা আর রোগা—গাময় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লোম। মেষপাল পাহারাদার জাতের কুকুর। এই কুকুর নিয়ে আন্তোয়েন শিকারে যেত। একদিন সন্ধ্যায় এক ঝগড়া ও বচসায় পরিণামে নিকোলাস র‍্যাভোলাটি নামে একজন তাকে দীর্ঘ ছুরি মেরে হত্যা করে রাতারাতি সার্ডিনিয়ার পালিয়ে যায়।

পথচারীরা মৃতদেহ তার কাছে এনে দিল। বৃদ্ধা যখন ছেলের মৃতদেহ পেল, তখন সে একটুও কাঁদল না, অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল—তার দৃষ্টি মৃত ছেলের উপর নিবদ্ধ করে। তারপর তার শিরওঠা কুঞ্চিত হাত তার দিকে বাড়িয়ে সে প্রতিহিংসা নেবার শপথ নিল। সে কাউকে ডাকল না, একা কুকুরটাকে নিয়ে দোর বন্ধ করে রইল।

কুকুরটা সারারাত গর্জন করল—বিছানার ধারে বসে সে অবিরাম ডাকতে লাগল—সে তার মনিবের দিকে মাথা বাড়িয়ে লেজটা পিছনের দু পায়ের খাঁজে ঢুকিয়ে ডাকতে লাগল। সে যেমন একভাবে বসে রইল, ছেলেটির মাও তেমনি কাঠের মূর্তির মত স্থির হয়ে বসে রইল। তার মা ছেলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কাঁদতে লাগল—তার চোখ ফেটে বড় বড় অশ্রুবিন্দু ছেলের মৃতদেহের উপর ঝরে পড়তে লাগল।

মনে হচ্ছিল, আন্তোয়েন যেন চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। গায়ে তার ধূসর বর্ণের কোট—সে কোটের বুকের কাছটা ছেঁড়া আর রক্তাক্ত। তার সর্বাঙ্গে রক্ত—তার সার্ট আর ওয়েষ্ট-কোট, তার প্যাণ্ট, তার মুখ, তার হাত—তার দাড়িতে রক্ত ডেলা বেঁধে জমে আছে—তার চুলেও রক্ত।

বুড়ী মা তার উদ্দেশে কথা বলতে শুরু করল। তার কণ্ঠস্বর শুনে কুকুরটা চুপ করল।

"শোনো, শোনো, তোমার হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। খোকা আমার, খোকারে, আহা বেচারা খোকা। ঘুমোও, শুনছ ত, তোমার হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। তোমার মা প্রতিজ্ঞা করছে। সে তার কথা রাখে, তুমি ত জানো যে, তোমার মায়ের যেমন কথা, তেমনি কাজ।"

ধীরে ধীরে সে তার সন্তানের দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ল—তার ঠাণ্ডা ঠোঁটের ওপর আবেগে তার মুখ লাগাল। এবার কুকুরটা গোঁয়াতে লাগাল। তার সে দীর্ঘ কাতর কান্না শুনে বুকের মধ্যে কি রকম করে—ভয় ধরে যায়।

এই ভাবে সেই মৃতদেহ, সেই বৃদ্ধা আর তাদের কুকুর সেমিলান্তি সারা রাত কাটিয়ে দিল।

পরদিন আন্তোয়েন স্যাভেরিনিকে কবর দেওয়া হল। তার কিছুদিন পরেই বনিফেসিওয় কেউ আর তার কথা বলত না; সবাই তাকে ভুলে গেল। আন্তোয়েনের কোন ভাই ছিল না, আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না। প্রতিশোধ নেবার মত কেউই ছিল না। তার মা একাকিনীই প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবত।

প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় গিরিপথের বিপরীত দিকে. সে তীরের উপর একটা শাদা জায়গা দেখত। এটা হচ্ছে, সার্ডিনিঃ র একটা ছোট গ্রাম—নাম লংগোসার্ডো। কার্সিকার ডাকাতদের যখন গ্রেপ্তার করার জন্য অনুসন্ধান করা হত, তখন· তারা সবাই এখানে এসে আশ্রয় নিত। এই ভাবে এই ছোট্ট গ্রামটি ডাকাতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাদের দেশের বিপরীত কূলে বসে তারা আবার দেশে ফিরে আসবার সুযোগ খুঁজত। আন্তোয়েনের মা জানত যে, এই গ্রামেই নিকোলাস র‍্যাভোলাটি আশ্রয় নিয়েছে।

জানলার কাছে একাকিনী সারাদিন বসে বসে আন্তোয়েনের মা সেই গ্রামটা দেখত আর প্রতিহিংসার কথা ভাবত। অপরের সাহায্য ছাড়া সে কি করে প্রতিহিংসা নেবে? সে বুড়ী হয়েছে,

গায়ে আর শক্তি-সামর্থ নেই, নিজেই কবে মরে যাবে! কিন্তু সে যে প্রতিজ্ঞা করেছে—ছেলের মৃতদেহ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে! এ-কথা সে ভুলবে কি করে? তার ত আর দেরী করা চলে না! কিন্তু, কি উপায়ে সে এই অসাধ্য সাধন করবে? রাত্রে সে ঘুমুতে পারে না, তার স্বস্তি নেই, সুখ নেই, একগুঁয়ের মত সে চিন্তা করতে লাগল। কুকুরটা তার পায়ের কাছে ঘুমোত আর থেকে থেকে মাথা তুলে ডেকে ডেকে উঠত—যেন তার মনিব তাকে ডাকছে, যেন তার পাশব আত্মায় তার মৃত মনিবের স্মৃতি জেগে উঠছে—সে স্মৃতি কিছুতেই বুঝি মুছে যাবে না।

একদিন রাত্রে সেমিলাস্তি এইভাব ডাকছে, হঠাৎ আন্তোয়েনের মায়ের মাথায় একটা মতলব এল—সে মতলব বন্য, প্রতিহিংসাপরায়ণ আর নৃশংস। সকাল পর্যন্ত এই নিয়ে সে ভাবল, তারপর ভোর না হতে উঠে সে গীর্জায় চলে গেল। মেঝের উপর সটান শুয়ে ভগবানের সাহায্য ভিক্ষা করল। তিনি যেন তাকে শক্তি দেন। সেই শক্তিতে সে যেন তার পুত্রের মৃত্যুর প্রতি শোধ নিতে পারে।

তারপর সে বাড়ী ফিরে এল। তার উঠোনে একটা পুরোনো তেলের খালি পিঁপে ছিল। তার ঢাকনাটা খোলা। ছাদ থেকে নল বেয়ে জল এসে সেটাতে পড়ত। সে সেটাকে খালি করে মাটিতে শুইয়ে পাশে কয়েকটা পাথরের চাঁই আর লাঠি পুঁতে সেটা যাতে নড়বড় না করে, এমনি করে ফেলল। তারপর সেমিলাস্তিকে চেন দিয়ে এর মধ্যে বেঁধে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো।

এবার সে ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। সে কেবলি সার্ডিনিয়ার তীরের দিকে তাকাতো আর ভাবতো আততায়ী নিশ্চয়ই ঐ ওখানেই আছে।

সারাদিন, সারারাত কুকুরটা ডাকতো। সকালে একটা ভাঁড়ে করে বুড়ী তাকে জল দিয়ে আসতো। কিন্তু, তা ছাড়া আর কিছু না, ঝোল নয়, রুটি নয়, কিছুই নয়।

দিন কেটে যেত। খাদ্যাভাবে সেমিলান্তি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়তো আর কেবল ঘুমাতো। তার পরের দিন তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো—গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠতো—সে মরিয়ার মত চেন ধরে টানতে থাক্‌তো।

তবুও বুড়ী তাকে কিছু খেতে দিত না। জন্তুটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো, ভাঙা গলায় ডাকতে লাগলো। এই ভাবে রাত কেটে গেল। তারপর ভোর হলে বুড়ী এক পড়শীর বাড়ি গিয়ে দু আঁটি খড় ভিক্ষে করে নিয়ে এল। তার মৃত স্বামীর পুরোনো জামা-কাপড় সে বার করে নিয়ে এল। সেই জামার মধ্যে খড় ভরে সেটাকে মানুষের মত দেখতে, এক মূর্তি করে ফেললো।

সেমিলান্তির আশ্রয়স্থলের কাছে একটা খুঁটি মাটিতে পুতে, সেই খুঁটিতে সেই খড়ের তৈরী মানুষটিকে সে বেঁধে দিলে। তারপর পুরোনো কাপড়ের একটা পুঁটলি বেঁধে পুতুলটার মাথা করে দিলে।

কুকুরটা আশ্চর্য হয়ে সেই খড়ের মানুষটাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ক্ষুধায় কাতর হলেও, সে চুপ করে রইল।

তারপর বুড়ী মাংসের দোকানে গেল এবং একটা বড় মাংসের পিণ্ড কিনে আনলো। সে বাড়ি ফিরে এলো, উঠোনে কাঠ ধরিয়ে আগুন করে সেই মাংস রান্না করল। সেমিলান্তি লাফ-ঝাঁপ করতে লাগল, তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরুতে লাগল, তার দৃষ্টি মাংসের দিকে নিবদ্ধ—মাংসের গন্ধ আর ধোঁয়া তার পেটে ঢুকতে লাগল।

পরে বুড়ী সেই গরম ধোঁয়া ওঠা রান্না মাংসের পিণ্ড খড়ের মূর্তিটার গলায় বেশ করে জড়িয়ে দিলে। তারপর সে সেমিলান্তির চেন খুলে দিল।

এক বিরাট লাফ দিয়ে সেমিলান্তি সেই খড়ের পুতুলের গলার দিকে ছুটল। তারপর পা দিয়ে তার গলা চেপে ধরে, দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। তারপর বার বার লাফিয়ে পড়ে তার গলায় ঝোলান মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে গোগ্রাসে খেতে লাগল।

বুড়ীর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো—সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করতে লাগল। সে আবার কুকুরকে চেন দিয়ে বেঁধে দুদিন উপবাসে রাখল। তারপর আবার এই ব্যাপার করলো।

তিন মাস ধরে বুড়ী কুকুরটাকে এইভাবে অভ্যস্ত করালো। কি করে থাবা দিয়ে ধরে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে হয়, তা কুকুরটার বেশ রপ্ত হয়ে গেল। এখন সে আর কুকুরটাকে চেন দিয়ে বাঁধে না। সে চোখের ইঙ্গিত করলেই কুকুরটা সেই খড়ের মূর্তিকে আক্রমণ করে।

সে কুকুরটাকে এমন শিক্ষা দিল যে, খড়ের মূর্তির গলায় কোন মাংস না থাকলেও সে তাকে আক্রমণ করে, তার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলত। পরে অবশ্য সে কুকুরের জন্যে মাংস রেঁধে তাকে খাওয়াতো।

খড়ের মূর্তিটা দেখলেই সেমিলান্তি গর্জন করত আর তার মনিব-গিন্নীর দিকে তাকাতো। সে যাও বলে শিস দিয়ে আঙুল তুললে সে ছুটে গিয়ে তাকে আক্রমণ করত।

উপযুক্ত সময় এসেছে বুঝে বুড়ী স্যাভেরিনি একদিন ভক্তিতে ভরপুর হয়ে গীর্জায় গেল। তারপর পুরুষের পোষাক পরে খুব দুর্বল বৃদ্ধ লোক সেজে সার্ডিনিয়ার এক জেলেকে সঙ্গে করে তার কুকুরটা নিয়ে গিরিপথের ওধারে গেল।

একটা কাপড়ের থলিতে সে একটা বিরাট মাংসের পিঠে সঙ্গে নিলে। দুদিন ধরে সেমিলান্তিকে উপোসী রাখা হয়েছিল। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর বুড়ী তাকে মাংসের পিঠের গন্ধ শুঁকিয়ে উত্তেজিত করছিল।

তারা লংগোসার্ডো গ্রামে ঢুকলো। কর্সিকান্টা একটা মদের দোকানে গেল। বুড়ী একটা রুটিওলার দোকানে উপস্থিত হল আর জিজ্ঞাসা করলে, নিকোলাস র‍্যাভোলটি কোথায় থাকে। সে এখন তার পুরোনো ছুতোরের ব্যবসা ধরেছে। দোকানের ভিতরে বসে সে কাজ করছিল।

বুড়ী দরজা খুলে ডাক্‌ল, "এই নিকোলাস্‌!"

সে ফিরে তাকালো। তখন কুকুরটাকে ছেড়ে দিয়ে বুড়ী আদেশ করল, "যা, যা, ওকে ছিঁড়ে খা—ছিঁড়ে খা।"

কুকুরটা উত্তেজিত হয়ে লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আর তার টুঁটি কামড়ে ধরল। লোকটা হাত বাড়িয়ে কুকুরটাকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল আর ভুঁয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগ্‌ল। কিছুক্ষণ সে মাটিতে কুঁকুড়ি মেরে হাত পা ছুঁড়তে লাগল, তারপর সে ঠাণ্ডা হয়ে গেল কিন্তু সেমিলান্তি ততক্ষণে তার টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার করে ফেলেছে।

ছুটি পড়শী তাদের বাড়ীর দোরে বসেছিল। তাদের বেশ স্মরণ হয় যে, একজন বুড়ো দোকান থেকে বেরিয়ে এল। তার সঙ্গে একটা কালো কুকুর। তার মনিব তাকে কালো একটা কি দিলে, সে সেটা খেতে খেতে চলে গেল। সে রাতে বুড়ী তার বাড়িতে ফিরে এল। অনেকদিন পরে সে রাতে সে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমালো।

———

## চার

## ॥ পাহারাদার কুকুর ॥

মাদাম লেফেভার ছিল একজন গ্রাম্য বিধবা মহিলা। এক চাষীর বৌ। কিন্তু সাজ-পোশাকের ঘটা ছিল। কথা বলত চিবিয়ে চিবিয়ে, ভেবে চিন্তে—মনটা ছিল পশুর মত। কিন্তু কথাবার্তায় তা প্রকাশ পেতনা, হাত দুটো খাটুনে চাষীর বৌ-এর মত ফাটা আর মোটা মোটা—কিন্তু সিল্কের পোশাকের তলায় সে দুটো সে যত্নে ঢেকে রাখত।

একটি সাদাসিধে, সরল, বোকাসোকা চাষার মেয়ে তার কাজকর্ম করত। তার নাম ছিল রোজ। ছোট্ট একটা বাড়ীতে এরা দুজন থাকত। বাড়িটার জানলাগুলো ছিল সবুজ। ক' প্রদেশের মধ্যস্থলে নরমাঁদি শহরের বড় রাস্তার ধারে তাদের বাড়ী। বাড়ীর সামনে বাগানের উপযুক্ত একটা জমি ছিল। তাতে তারা শাক-সব্‌জির চাষ করত।

এক রাতে এক চোর তাদের বাগান থেকে গোটা দশ বারো রশুনের ঝাড় চুরি করে নিয়ে গেল। রোজ এই চুরির কথা জানতে পেরে, সে ব্যাপারটা বলতে মাদামের কাছে ছুটে গেল। শুনেত মাদাম হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। প্রথমে দুঃখ, তারপব ভয়। কেউ চুরি করেছে—মাদাম লেফেভারের বাড়ি থেকে চুবি হয়েছে। একবার গ্রামে চুরি হলে আবার চোরের আসার সম্ভাবনা আছে।

দুটি মেয়ের নিদারুণ ভয় ধরে গেল। তারা পায়ের ছাপ লক্ষ্য করল, নানা জল্পনা করল, কত কী অনুমান করল।

তারা বলতে লাগল, "এই যে! এখান দিয়ে চোর গেছে। দেওয়ালে পা দিয়ে সেখান থেকে এই ফুলগাছের ঝাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়েছে।"

ভবিষ্যতের কথা ভেবে তারা কেঁপে উঠল। এখন থেকে ত আর রাত্রে তারা শান্তিতে ঘুমোতে পারবে না!

চুরির কথা ক্রমশঃ গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। পড়শীরা এসে প্রত্যেকে নানা বিষয় আলোচনা করতে লাগল। যা দেখেছে, যা ভেবেছে—মেয়ে দুটি সবাইকে বোঝাতে লাগল। একজন চাষীও এসেছিল। সব দেখে-শুনে সে বললে, "তোমাদের উচিত একটা কুকুর পোষা।"

কথাটা সত্যি! কুকুর পুষলে অন্ততঃ সে একটা সতর্কতাসূচক সংকেত দেবে তো! কিন্তু বড়-সড় কুকুর নয়। বড় কুকুর নিয়ে তারা কি করবে? তাকে খাওয়াতেই ত তারা সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে! একটা কুকুর-বাচ্ছা হলেই হবে—শুধু ঘেউ ঘেউ করতে পারলেই হল।

সবাই চলে গেলে, মাদাম লেফেভার বহুক্ষণ ধরে এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করলেন। অনেক ভেবে তিনি হাজারো আপত্তি তুললেন। বিশেষ করে, এক বাটী দুধভাত খাওয়ানোর কথায় ত তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি হলেন সেই জাতের কঞ্জুষ মেয়ে, যাঁরা সব সময়ে খুচরো পয়সা নিয়ে রাস্তায় বের হন, যাতে কোনক্ষেত্রেই বেশি দিতে না হয়।

রোজ, জন্তু-জানোয়ার ভালবাসতো। সে তার যুক্তি দেখাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে, তারা কুকুর পুষবে, তবে একটা বাচ্ছা-কুকুর।

তারা কুকুরের খোঁজ করতে লাগল কিন্তু কেবল ধাড়ী কুকুরের সন্ধান আসতে লাগল। তাদের খোরাকের কথা ভাবতেই ত তাদের হৃৎকম্প উপস্থিত। বোলভিলের মুদীর একটা কুকুর ছিল, খুব ছোট্ট; কিন্তু সে দু ফ্রাঙ্ক দাম হেঁকে বসল -তাকে সে খরচ করে বড় করেছে, সে খরচটা ওঠা চাইত! মাদাম লেফেভার বললে, "কুকুরকে খাওয়াতে রাজী আছি, কিন্তু পয়সা দিয়ে কুকুর কিনতে পারবো না।"

রুটিওলা সব ব্যাপার জানতো। সে একদিন একটা হলদে জন্তু নিয়ে এল—তার খাবাই সর্বস্ব। তার দেহটা কুমীরের মত লম্বা, মাথাটা শেয়ালের মত…। এই বিনামূল্যে পাওয়া কুকুরটা মাদাম লেফেভারের চোখে লাগল। রোজ কুকুরটাকে আদর করে কোলে তুলে নিল। সে রুটিওলাকে কুকুরটার নাম জিজ্ঞাসা করল। রুটিওলা বললে, "ওর নাম পিয়েরো।"

তাকে একটা সাবানের পুরানো বাক্সের মধ্যে রাখা হল। প্রথমে তাকে জল খেতে দেওয়া হল। সে চুকচুক করে সবটা খেয়ে নিল। তখন তাকে ওরা এক টুকরো রুটি দিল। তাও সে খেয়ে নিল।

মাদাম লেফেভার মনে-মনে বিরক্ত হয়ে বললে, "বাড়ীতে পোষ মানলে, ওকে আমরা ছেড়ে রাখবো। তখন ও ঘুরে ফিরে বাড়ী বাড়ী কিছু কিছু খেয়ে আসতে পারবে।"

বাস্তবিক তারা ওকে ছেড়ে রাখতো, কিন্তু এতে তার খাবারের প্রতি অনীহা দেখা গেল না। খাবারের জন্য দাবী করেই সে কেবল ডাকত। দেরী হলে তার ডাক যেন বেড়ে যেত।

বাগানে কেউ এলে পিয়েরোর কোন আপত্তি দেখা যেত না। যেই আসুক না, সে সকলের কাছে ছুটে যেত, চির-পরিচিতের মত, কোন রকম সাড়া-শব্দ করত না। সে যাই হোক মাদাম লেফেভাব ক্রমশঃ কুকুরটাকে পছন্দ করতে লাগল। সে ক্রমশঃ কুকুরটাকে ভালবাসতে লাগল আর নিজে হাতে তাকে রুটি খেতে দিত, জলের বাটীতে ডুবিয়ে রুটি দিলে, সে খেয়ে নিত।

কিন্তু ট্যাক্সের কথা সে কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি! একদিন ট্যাক্স আদায়কারী এসে বললে, "মাদাম, আট ফ্রাঁ দিতে হবে।" চমকে উঠল মাদাম। কী? এই কুকুরের জন্যে আট ফ্রাঁ ট্যাক্স দিতে হবে? এ কুকুর একটু ডেকেও যে উপকার করে না! মাদামের মাথা ঘুরে গেল। তখনি ঠিক হয়ে গেল যে, পিয়েরোকে বিদায় করে দিতে হবে। কিন্তু কেউ তাকে নিতে রাজী হল না। দশ মাইলের মধ্যে

সবাই তাকে নিতে গররাজী হল। তখন ঠিক হল যে, ওকে সার তোলার গর্তে ফেলে দিয়ে আসতে হবে। এইভাবে সব অবাঞ্ছিত কুকুরকেই ওরা মেরে ফেলত।

বিরাট মাঠের মধ্যে একটা ছোট ঘর দেখা যেত। এইটা হল মাটির তলার গর্তে নামবার পথ। একটা বিরাট লোহার খাঁচা নিচে নেমে যায়—মাটির গভীরে খনির মধ্যে। বছরে, একবার ওরা সারমাটির জন্য খনির মধ্যে নামে। বছরের বাদ বাকী সময় এই গর্তটা অবাঞ্ছিত কুকুরের কবর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর কাছ দিয়ে যাবার সময়ে লোকে কুকুরের কাতর কান্না, ক্রুদ্ধ চিৎকার আর উন্মাদের মত আর্তনাদ শুনতে পায়।

শিকারী বা মেষরক্ষক কুকুর এইসব চিৎকার শুনলে চোঁ-চাঁ দৌড় দেয়। এর কাছে এসে ভিতরে উঁকি মারলে পচা দুর্গন্ধ নাকে আসে। এর মধ্যে ভয়ঙ্কর নারকীয় সব নাটক অভিনীত হয়।

দশ-বারো দিন অনাহারে কেবল ডেকে ডেকে যখন কোন হতভাগা কুকুর মুমূর্ষু হয়ে পড়ে, এতদিন সে তার পূর্ববর্তীদের পচা গলা মাংস খেয়ে জুজছে, হঠাৎ সে শোনে, যেন একটা নতুন তাগড়া কুকুর এসে তার মধ্যে সশব্দে পড়ল। সেখানে শুধু দুটো কুকুর—দুটোই খাদ্যাভাবে ক্ষীণ—তাদের চোখ অন্ধকারে জ্বলছে। তারা পরস্পরকে লক্ষ করে, পরস্পরকে তাড়া করে, ইতস্ততঃ করে। কিন্তু ক্ষুধা সইবে কতক্ষণ? তারা পরস্পরকে আক্রমণ করে—মরণপণ যুদ্ধ চলে—ক্রুদ্ধ চীৎকার, গোঁয়ানি। তারপর যে বলবান, সে দুর্বলকে ছিঁড়ে খায়।

ঠিক হয়ে গেল যে, পিয়েরোকে ফেলে দেওয়া হবে খনির গর্তে, কিন্তু কে করবে এই জহ্লাদের কাজ? একজন মজুর রাস্তা খুঁড়ছিল, সে এ কাজের জন্যে দু স্যু দাবী করে বসল। কিন্তু মাদাম লেফেভারের মনে হল যে, তার দাবীটা বড্ড বেশি। পড়শী একটা ছেলে চাইলে পাঁচ স্যু। এটাত খুব বেশিই।

রোজ বললে, তারা নিজেরাই ফেলে দিয়ে আসবে—ওতে আর হাঙ্গামা কি ? ঠিক হল যে, রাতে তারা দুজনে একাজ করে আসবে।

শেষ সন্ধ্যায় তারা পিয়েরোকে ভাল করে ঝোল রেঁধে খাওয়ালো আর তাতে একটু মাখনও দিল। সে চেটেপুটে সবটা খেয়ে নিল। যখন সে পরিতৃপ্ত হয়ে খুশিতে লেজ নাড়তে লাগল, তখন রোজ তাকে আঁচলের মধ্যে তুলে নিল।

মাঠের ওপর দিয়ে ডাকাতের মত লম্বা লম্বা পা ফেলে তারা চললো। খনির মুখে পৌঁছেই মাদাম লেফেভার ঝুঁকে শুনতে লাগল। সে জানতে চাইলো অন্য কোন কুকুর সেখানে আছে কিনা। নাঃ, আর কোন কুকুরের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। পিয়েরো একা থাকবে। রোজ কাঁদছিল, সে পিয়েরোকে আদর করে তাকে গর্তের মধ্যে ফেলে দিলে। তারা দুজনে ঝুঁকে পড়ে শুনতে লাগল।

প্রথমে তারা একটা ভারী জিনিস 'থপ' করে পড়ার শব্দ শুনল। তারপর আহত পশুর আর্ত, তীক্ষ্ণ চিৎকার। তারপর ক্রমাগত কাকুতি মিনতি, সাধ্যসাধনা—উপরের দিকে মুখ তুলে কাতরানি।

সে ডাকতে লাগল, উঃ! সে কি ডাক!

ওদের মনে অনুশোচনা হল, কেমন এক দুর্বোধ্য ভয় দেখা দিল। লাফিয়ে তারা সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে এল। রোজ খুব জোরে ছুটছিল, মাদাম লেফেভার বলতে লাগল, 'রোজ, একটু দাঁড়া—আমি যে ছুটতে পারছি না!'

রাতে তারা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগল। মাদাম লেফেভার স্বপ্ন দেখল যে, সে টেবিলে বসে ঝোল খেতে যাচ্ছে কিন্তু ঝোলের পাত্রের ঢাকনা খুলে দেখে, ঝোলের পাত্রে পিয়েরো রয়েছে। পিয়েরো ছুটে এসে তার নাক কামড়ে দিল। তার ঘুম ভেঙে গেল। মনে হ'ল সে যেন তখনো কুকুরের ডাক শুনছে। সে কান পেতে শুনতে লাগল, না তার ভুল। সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল—সে দেখলে যে, সে একটা প্রকাণ্ড রাস্তায় এসেছে—সে রাস্তার আর শেষ নেই—তবু তাকে

সে রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। হঠাৎ সে দেখলে রাস্তার মাঝখানে একটা ঝুড়ি—সেই ঝুড়ি দেখে তার ভয় হল। সে যাই হোক, সে সেটা খুলে ফেললে, তার মধ্যে পিয়েরো লুকিয়ে ছিল। সে তার হাত কামড়ে ধরল—সে কিছুতেই তাকে ছাড়ল না। লেফেভার দেখলে সর্বনাশ, সে গেছে! কুকুরটা চিরকাল তার হাত কামড়ে ঝুলে থাকবে।

খুব ভোরে সে উঠে পড়ল। তারপর, পাগলের মতো ছুটলো খনির মুখে।

হ্যাঁ, তখনো পিয়েরো ডাকছে, ডেকে চলেছে—সে সারা রাত এম্‌নি ডেকেছে। মাদাম লেফেভার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল আর হাজারো আদরের নাম ধরে তাকে ডাকতে লাগল। কুকুরটাও যথাসাধ্য তার ডাকে সাড়া দিতে লাগল। তখন কুকুরটাকে আবার তার দেখবার ইচ্ছে হল। মনে মনে সে বলতে লাগল, সে তাকে ফিরে পেলে শেষদিন পর্যন্ত তাকে সুখে রাখবে। যে লোকটা খনির খবরদারী করত, মাদাম তার বাড়ী ছুটে গেল—তাকে সব কথা বলল। লোকটা খুব গম্ভীর হয়ে সব শুনল। মাদামের বলা শেষ হলে, সে বলে উঠল, "তোমার কুকুর ফিরে পেতে চাও? চার ফ্রাঁ পড়বে।"

মাদাম বললে, "চার—ফ্রাঁ—চা—র—ফ্রাঁ! তুমি কি আমার বুকে ছুরি বসাতে চাও?"

সে বললে, "তুমি কি বলতে চাও যে, আমি দড়িদড়া, কলকব্জা খাটিয়ে আমার ছেলেকে নিয়ে নিচে নেমে তোমার কুকুরের কামড় খেতে যাব, শুধু তোমার কুকুর ফিরিয়ে দিয়ে তোমাকে খুসি করার জন্যে? এত আদরের কুকুরটাকে ফেলে দেওয়া তোমার মোটেই উচিত হয়নি।"

রেগে মাদাম চলে গেল। চার ফ্রাঁ?

বাড়ী এসেই সে রোজকে ডাকলে। তাকে খনির চালকের অন্যায় দাবীর কথা বললে। রোজ আর কি করবে, সে বললে, "চার ফ্রাঁ—সে যে এক কাঁড়ি টাকা, মাদাম!" তারপর সে বললে,

"আমরা রোজ তাকে কিছু কিছু করে খাবার দিলে, হয়ত সে বেঁচে যেতে পারে।"

শুনে মাদাম লেফেভার খুসি হল। প্রস্তাবটা তার পছন্দ হল। আবার তারা একটা বড় রুটি আর মাখন নিয়ে সেখানে গেল। তারা রুটিটা ভেঙে ভেঙে ছোট ছোট করে পিয়েরোর নাম ধরে ডেকে ডেকে ছুঁড়ে দিতে লাগল। কুকুরটা এক খণ্ড রুটি পেলেই আর একটার জন্য ডাকতে লাগল। সেদিন তারা ফিরে এল। তারা এই ভাবে প্রত্যহ যেতে লাগল; কিন্তু, দিনে একবারের বেশি যেত না।

একদিন সকালে প্রথম রুটি ফেলবার সময়ে তারা খনির গর্তে একটা বেশ শক্ত-সমর্থ কুকুরের ডাক শুনল। সেখানে দুটো কুকুর ছিল। আরেকটাকে সেখানে কারা ফেলে দিয়ে গেছে—এটা বেশ বড় কুকুর।

রোজ ডাকল, পিয়েরো, পিয়েরো। কুকুর সাড়া দিল, "ভ্যাক্, ভ্যাক্।" তারপর সে তাকে খাওয়াতে শুরু করল, কিন্তু প্রত্যেক বার রুটির টুকরো ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ শোনা যেতে লাগল—তারপর শোনা গেল পিয়েরোর কাতর কান্না, অন্য কুকুরটা তাকে কামড়ে দিয়েছে। সে কুকুরটা বলবান বলে সবই সে খেতে লাগল।

তখন তারা নাম করে করে রুটি দিতে লাগল। "পিয়েরো, এটা তোমার জন্যে।" কিন্তু বেশ বোঝা গেল, পিয়েরো কিছুই পেল না।

অবাক হয়ে মহিলা দুটি পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। মাদাম লেফেভার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, "যারা যত কুকুর এখানে ফেলবে, তাদের সবাইকে ত আমি খেতে দিতে পারি না। এ কাজ এই পর্যন্ত স্থগিত করতে হবে।"

তার খরচে সব কুকুরের খাওয়া হবে—এ কথা ভাবতে মাদাম লেফেভারের মাথা গরম হয়ে উঠল, সে পিয়েরোর জন্যে যে রুটি এনেছিল, সেটাও নিয়ে বাড়ী ফিরে এল।

রোজ আর কি করবে? সে তার আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বাড়ি ফিরে এল।

# পাঁচ

## ॥ মৎস্যশিকারী ॥

প্যারি নগর অবরুদ্ধ—পরিত্যক্ত। সকলেই ক্ষুধায় কাতর। একটা চড়াই পাখিও পাওয়া যায় না—আর না পাওয়া যায় কোন সুখাদ্য।

জানুয়ারি মাসের সকাল। সূর্যের কিরণে নগর উদ্ভাসিত। মিঃ মরিশো একজন ঘড়ি-বিক্রেতা। কাজকর্ম না থাকায় রাস্তার ধারে পায়চারি করছিল। মন মেজাজ খারাপ, ক্ষিদেয় কাতর—প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে ম্রিয়মান হয়ে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় তার সমব্যবসায়ী—আর এক বন্ধুর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

যুদ্ধের আগে মরিশোকে প্রত্যেক রবিবার ভোরে দেখা যেত, সে হাতে একটা বেতের লাঠি নিয়ে আর পিঠে একটা টিনের বাক্স ঝুলিয়ে হন্ হন্ করে হাঁটছে। সে কলম্বোসের ট্রেন ধরবে আর সেখান থেকে হেঁটে মারান্তে দ্বীপে যাবে। এখানে সন্ধে পর্যন্ত সে মাছ ধরবে।

এইখানেই তার মিঃ স্যভাজের সঙ্গে আলাপ হয়। সে রুয়ে নোতরদাম দ্য লবেটোর একজন দোকানদার। খুব আমুদে লোক আর তারই মত মাছ ধরার নেশা। এদের দুজনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল, তারা পাশাপাশি বসে সারাদিন মাছ ধরতো—একেবারে কথাটি না বলে, চুপচাপ। কোন কোন দিন বসন্তকালে সূর্যকিরণে চারদিক তাজা আর নতুন দেখে সকলের মনে যখন ফুর্তি জাগত—তখন মিঃ মরিশো বলে উঠতো, "কি চমৎকার।"

আর মিঃ স্তভাজ উত্তর দিত, "এর কোন তুলনা হয় না।"

আবার সন্ধ্যার ছায়া নামলে, যখন সূর্যের সোনালি আলো রঙিন পাতার ওপর তার পাতলা চাদর বিছিয়ে দিত, আর চারদিকে ছায়া নামত, তখন মিঃ স্তভাজ বলে উঠত, "কি চমৎকার দৃশ্য।"

মরিশো বলতো, "এর কাছে বুলভার্ডের দৃশ্য লাগে না।"

কিন্তু কথা না বললেও তারা পরস্পরের মনোভাব ঠিক বুঝতে পারতো।

দু বন্ধু পরস্পরকে অভিবাদন করে, পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। অতীত ও বর্তমানের কত কথাই না তারা আলোচনা করতে লাগল! তারপর তারা একটা কাফেতে ঢুকলো। তাদের সামনে এক গ্লাস করে অ্যাবসিন্থে মদ পরিবেশন করা হলে, স্তভাজ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্‌লে—"কি ভয়ঙ্কব ব্যাপার!"

মরিশো ম্রিয়মাণ হয়ে বললে, "আর আবহাওয়াই বা কি রকম! এ বছর এই প্রথম একটা সুন্দর দিন পাওয়া গেল। আমাদের সেই মৎস্য শিকারেব কথা মনে পড়ে?"

"তা আর মনে পড়ে না? জানি না আবাব কবে সেখানে যেতে পারবো!"

আবার দ্বিতীয় পাত্র মদ খাবার পর তারা কাফে থেকে বার হয়ে এল। মাথাটা যেন টলছে! খালি পেটে মদ খেলে যেমন অবস্থা হয়, তেমনি। ঠাণ্ডা হাওয়ায় স্তভাজ উত্তেজিত হয়ে উঠে বললে,—"ধরো, যদি সেখানে যাই?"

"মাছ ধরতে?"

"কিন্তু কোথায় মাছ ধরতে যাবার কথা বলছ?"

"আমাদের সেই পুরোনো ঘাটি কলম্বোসে। তার কাছেই ফরাসী সেনারা আস্তানা গেড়েছে। আর আমি জানি, কর্ণেল দুমোলিন আমাদের ছাড়পত্র দেবেন।"

"যদি যাওয়া হয়, তবে আমি তোমার সঙ্গী হতে রাজী।"

একঘণ্টা পরে, ছিপ ইত্যাদি নিয়ে তারা কর্ণেলের বাড়ীতে হাজির হল। তাদের অনুরোধ শুনে তিনি হাসলেন, আর যথারীতি তাদের ছাড়পত্র লিখে দিলেন।

প্রায় ১১টা নাগাদ তারা অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে হাজির হল। আর তাদের ছাড়পত্র দেখিয়ে কলম্বোস ছাড়িয়ে তাদের গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। পথে যেতে যেতে তারা দেখলে, আর্জেণ্টুইল আর ষ্যানতারের মাঠ জনশূন্য—পরিত্যক্ত। মাঠের ওপর অবগেম ও শ্যানোয়ের পাহাড় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে সব কিছু নিখুঁতভাবে দেখা যায়।

স্যভাজ পাহাড়ের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে "ঐ দেখ, ঐখানে প্রাসিয়ান্রা আছে।"

প্রাশিয়ান্রা! তাদের তারা কখনো দেখেনি, তবে তারা জানত যে, তারা প্যারি ঘিরে আছে, অদৃশ্য কিন্তু শক্তিশালী—তারা লুট-তরাজ করছে, ধ্বংস করছে, নরহত্যা করছে।

একেত' প্রাশিয়ানদের তারা ভয় করে, তার ওপর তাদের মনে এইসব বিজয়ীদের প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণা দেখা দিল।

মরিশো বললে, "যদি ওদের সামনে পড়ে যাই?"

স্যভাজ প্যারির লোকের মতই বলে উঠল, "আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলব ওদের।"

তবু তারা আরো অগ্রসর হতে ইতস্ততঃ করতে লাগল। চারিদিকের নিস্তব্ধতায় তাদের কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত স্যভাজের মনে সাহস এল।

"এসো, সাবধানে অগ্রসর হই।"

প্রত্যেক ঝোপঝাড়ের পিছনে লুকোতে লুকোতে আত সন্তর্পণে, প্রত্যেক শব্দে সচকিত হয়ে, তারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল। নদীতে পৌঁছবার আগে একটি খালি মাঠ পড়ে। তারা দৌড়ে মাঠটা পার হল। অবশেষে তারা নদীর ধারে পৌঁছল।

তারপর তারা একটা ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করে কিছুটা স্বস্তি বোধ করল।

মরিশো শুনল, যেন কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সে কান পেতে শুনতে লাগল, কিন্তু না, সে কোন শব্দ শুনতে পেল না। তারা সত্যি সত্যি একাকী। ছোট দ্বীপটা তাদের আড়াল করে রেখেছে। যে বাড়িতে আগে রেস্তোঁরা ছিল, সেটা পরিত্যক্ত বোধ হচ্ছে। সব দিক দিয়ে আশ্বস্ত হয়ে, তারা সারাদিনের শিকারের জন্য নিশ্চিন্ত হল।

স্যভাজ প্রথমে একটা মাছ ধরল, মরিশো দ্বিতীয়টা। প্রায় প্রত্যেক মিনিটে একটা করে মাছ ধরে তারা তাদের পায়ের কাছে রাখা জালে ভরতে লাগল। সত্যিই অদ্ভুত। এতদিন এই আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত ছিল বলে, তাদের আনন্দ যেন আজ আর ধরেনা! আনন্দে তারা সব ভুলে গেল, এমন কি যুদ্ধ পর্যন্ত।

সহসা তারা পায়ের নীচে একটা গুড় গুড় শব্দ শুনতে পেল। যেন পায়ের নীচে মাটি কাঁপছে। মঁ ভ্যালেরিয়েনে কামান দাগা হচ্ছে।

মরিশো আকাশের দিকে তাকালো—দেখলো প্রচুর ধোঁয়া আকাশে উঠছে, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল। তারপর কেবলি শব্দ হতে লাগল, একটার পর একটা।

অসহায়ের মত কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে স্যভাজ বললে, "ওরা শুরু করেছে কি।" মরিশো স্বভাবতঃ শান্ত প্রকৃতির। সহসা তার যেন অদম্য একটা রাগ হল।

"বোকা বুদ্ধু সব! মানুষ মেরে ওরা কি আনন্দ পায়?"

"ওরা পশুরও অধম।"

"যতদিন দরকার থাকবে, এমনি চলবে।"

"দেখছে, জীবন মানেই ত এই।"

মরিশো তখন হাসতে হাসতে বললে, "মানে মৃত্যু, এই কথা বলছ ত?"

তারা নানা রকম রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার কথা আলোচনা করতে লাগল। ওদিকে মঁ ভ্যালেরিয়েনে কামান দাগা চলতে লাগল। ফরাসীদের মধ্যে ধ্বংসলীলা ছড়িয়ে পড়লো।

হঠাৎ তারা চমকে উঠল। তাদের পিছনে তারা পায়ের শব্দ শুনতে পেল। তারা পিছন ফিরে দেখলে, চারজন বিরাট পুরুষ কালো ইউনিফরম পরা তাদের দিকে বন্দুক উঠিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাত থেকে ছিপ জলে পড়ে ভেসে গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রাশিয়ান সৈন্যরা তাদের বেঁধে নৌকোয় তুলে সেই দ্বীপের দিকে চললো। এই বন্ধু দুটি ভেবেছিল যে, দ্বীপ জনশূন্য। তারা অবিলম্বে বুঝতে পারল, বাড়ীটা ফাঁকা নয়, জন কুড়ি প্রাশিয়ান সৈন্য সেখানে রয়েছে। একটি মোটাসোটা অফিসার চেয়ারে বসেছিলেন। বিরাট একটা পাইপ নিয়ে তিনি তামাক খাচ্ছিলেন। তিনি তাদের বিশুদ্ধ ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কি খবর মশাইরা? আশাকরি খুব ভাল শিকার হয়েছে।"

ঠিক তখন একজন সৈন্য তাঁর পায়ের কাছে মাছশুদ্ধ জাল দুটো রেখে দিল। অফিসারটি হেসে বললেন, "তাইত! বেশ শিকার করেছ দেখছি। ও ব্যাপার যাক, এখন আসল কথায় আসা যাক্। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, তোমাদের পাঠানো হয়েছে আমাদের উপর খবরদারী করতে। তোমরা মাছ ধরার ভান করে আমাকে ভুল পথে চালাতে এসেছিলে। কিন্তু আমি অত বোকা নই। আমি তোমাদের ধরে ফেলেছি, তোমাদের আমি গুলি করে মারব। এজন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু যুদ্ধ হচ্ছে যুদ্ধ। তোমরা অগ্রবর্তী ঘাঁটি যখন পার হয়ে এসেছ, তখন বোঝা যাচ্ছে, সাংকেতিক শব্দ তোমরা জান। সেটা আমাকে বলে ফেল, আমি তোমাদের ছেড়ে দিচ্ছি।"

বন্ধু দুজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইল—তাদের মুখে রক্ত নেই, তারা রীতিমত কেঁপে উঠল কিন্তু একটি কথাও বললে না।

"কেউ জানবে না। তোমরা নিঃশব্দে বাড়ী ফিরে যাবে। আর এ রহস্য কেউ জানবে না। যদি অস্বীকার করো—সাক্ষাৎ মৃত্যু—নাও, পছন্দ করো কি করবে।"

তারা নিশ্চল হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। প্রাশিয়ান অফিসার শান্তভাবে নদীর দিক দেখিয়ে দিলে—

"পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমাদের দেহ ঐ নদীর তলায় চলে যাবে। তোমাদের স্ত্রী সংসার আছে ত! তারা তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে।"

তবুও তারা চুপ করে রইল। কামানের শব্দ মুহুর্মুহুঃ আসতে লাগল। অফিসার তাঁর নিজের ভাষায় হুকুম দিয়ে কয়েদীদের কাছ থেকে চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তাদের কুড়ি ফুটের মধ্যে চলে এল একদল সৈন্য, এরা হুকুম তামিল করতে এল।

"আমি তোমাদের আর এক মিনিট সময় দিচ্ছি—এক সেকেণ্ড বেশি না।"

সহসা দুজন ফরাসীদের কাছে এগিয়ে গিয়ে মরিশোকে একান্তে ডেকে ফিসফিস করে বললেন,

"তাড়াতাড়ি—সাংকেতিক শব্দটা চটপট বলে ফেল। তোমার বন্ধু জানতে পারবে না। সে ভাববে যে, আমার মতলব বদলে গেছে।"

মরিশো কোন কথা বললে না।

তারপর সুভাজকে একান্তে ডেকে তিনি ঐ একই কথা বললেন। কিন্তু সেও কোন কথা কইল না। অফিসার আরো কি হুকুম দিলেন। সৈন্যরা তাদের বন্দুক তুলে লক্ষ্য স্থির করল। এই সময়ে মরিশোর চোখ দুটো ঘাসের উপর রাখা মাছের জালটার ওপর পড়ল। দৃশ্যটা দেখে তার কেমন মূর্ছার মত অবস্থা হল—এভাব বহু চেষ্টা করে সে কাটাতে চাইল কিন্তু তার দুচোখ জলে ভরে এল। সে তার বন্ধুর দিকে ফিরে বললে,

"ম'শিয়ে সুভাজ, বিদায়!"

"বিদায়, মঁশিয়ে মরিশো !"

এক মিনিট তারা হাত ধরাধরি করে দাঁড়াল— আবেগে তারা কাঁপতে লাগল।

অফিসার হুকুম দিলে, "ফায়ার।"

সৈন্যরা একযোগে গুলি করল। স্যভাজ মুখ থুবড়ে সটান পড়ে গেল। মরিশো লম্বা ছিল। তাব শরীরটা দুলে উঠে ঘুরে গেল পায়েব ওপর। তারপর সে আকাশেব দিকে মুখ কবে বন্ধুব দেহের ওপর পড়ে গেল। তার বুকের ক্ষত থেকে ঝলকে ঝলকে বক্ত বেরুতে লাগল।

অফিসার আরো কি হুকুম দিলেন। তাঁব সৈন্যরা চলে গেল। তারা তখনি দড়ি আব পাথব নিয়ে ফিবে এল। তাবপর বন্ধু-দুটির পায়ের সঙ্গে দড়ি দিয়ে পাথব বেঁধে চাবজন তাদেব বয়ে নিয়ে গেল নদীর ধারে। তারা তাদেব দুলিয়ে যতদূরে সম্ভব দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। পাথরবাঁধা তাদের দেহ তখনি জলে ডুবে গেল। খানিকটা জল চলকে উঠল, তারপর কয়েকটা বুড়বুড়ি ভেসে উঠল—তারপর আবার জল শান্ত হয়ে গেল। কেবল দেখা গেল, খানিকটা বক্ত জলের উপর ভেসে উঠেছে। অফিসার বাড়ীব দিকে চলে গেলেন। বিড় বিড় কবে বললেন, "মাছগুলো এখনি ওদের সন্ধান পাবে।"

মাছভরা জালটা তুলে নিয়ে হেসে ডাকলেন, "উইল্‌হেল্‌ম !"

শাদা উইনিফর্ম পরা একজন সৈন্য এগিয়ে এল। অফিসাব তার হাতে মাছের জালটা দিয়ে বললেন, "মাছগুলো টাটকা থাকতে থাকতে ভেজে ফেলো—খুব সুস্বাদু খাবাব আজ খাওয়া যাবে।"

তিনি আবার চেয়ারে বসে পাইপ টানতে লাগলেন।

———

## ছয়

### ॥ জ্যোৎস্নায় ॥

আগে ম্যারিগনানকে লোকে বলত ভগবানের সৈনিক। একথা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তিনি ছিলেন ধর্মযাজক, বেশ ঢ্যাঙা—গায়ে পাতলা—কিছুটা গোঁড়া, কিন্তু ন্যায়পরায়ণ—আর তাঁর মন ছিল বড় উঁচু। তাঁর বিশ্বাস ছিল দৃঢ়, তার নড়চড় হত না। তিনি মনে করতেন যে, তিনি ঈশ্বরকে খুব ভাল করে বুঝতেন—ভগবানের উদ্দেশ্য তাঁর কাছে জলের মতো পরিষ্কার ছিল। ভগবানের ইচ্ছে, উদ্দেশ্য সব কিছু তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে প্রতিভাত হত।

তাঁর বাসস্থানটি ছোট্ট আর ছিমছাম। সংলগ্ন বাগানে বেড়াতে বেড়াতে মাঝে মাঝে একটা কথা তাঁর মনে জাগত, কেন ভগবান এটা করলেন? তারপর মনে মনে তিনি নিজেকে ভগবানের স্থানে বসিয়ে অত্যন্ত একগুঁয়ে ভাবে তর্ক জুড়ে দিতেন আর প্রায় সব ক্ষেত্রেই তিনি একটা যুক্তি বার করতেন। তিনি একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। ভক্তের মত বিনীতভাবে কোন দিনই মেনে নিতেন না যে, ভগবানের নিয়ম জটিল, মীমাংসা করা যায় না। তিনি বলতেন, "আমি তাঁর দাস, তিনি কি করেন, তার কারণ আমার জানা থাকলে সেটা ভেবে বার করা আমার উচিত।"

প্রকৃতির সব কিছুই ভগবান ভেবেচিন্তে করেছেন—কোনটির উদ্দেশ্য অজ্ঞেয় নয়। কেন হয়েছে আর তার কারণটি ওজন করে করা—হিসেবে কোথাও এতটুকু বেশি-কম নেই। ভোরের সৌন্দর্য শুধু মানুষের জেগে উঠে আনন্দ করার জন্যে। দিনগুলোর সৃষ্টি শস্য পাকাবার জন্যে, বৃষ্টির সৃষ্টি জল দিয়ে শস্য ও ফসলকে জন্মাবার জন্যে, সন্ধ্যার সৃষ্টি নিদ্রার আয়োজনের জন্যে আর রাত্রির অন্ধকার ঘুমের জন্যে।

চারটি ঋতুর সৃষ্টি শুধু কৃষিকার্যে সাহায্য করার জন্যে। তাঁর মনে কোন দিন কোন সন্দেহ হয় না যে, প্রকৃতির কোন মতলব নেই, উদ্দেশ্য নেই আর প্রাণের ধারা গতানুগতিক নিয়মে ভেসে চলেছে। বরং তাঁর মনে হয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রাণকে তৈরী করে, ঘাতসহ করে, আর করে তোলে কঠিন ও দৃঢ়।

কিন্তু নারী জাতিকে তিনি ঘৃণা করতেন, আপনার অজ্ঞাতে তিনি তাদের ঘৃণা করতেন। আর সহজাত প্রবৃত্তির বশে তাদের তিনি এড়িয়ে চলতেন। তিনি প্রায়ই মহাত্মা যীশুর কথার পুনরাবৃত্তি করতেন—

"হে নারী, তোমার প্রতি আমার কর্তব্য কি?" আর সেই সঙ্গে তিন যোগ করে দিতেন, "ভগবান নিজেই তাঁর এই সৃষ্টির জন্যে অখুসী ছিলেন।" তাঁর মতে নারী, শিশু প্রকৃতির আর শিশুর চেয়ে বারো গুণ অপবিত্র। নারী প্রলোভনকারিনী, প্রথম মানুষকে সে ভুলিয়ে ছিল আর আজো সে তার এই সর্বনাশা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সে দুর্বল, ভয়ঙ্কর, রহস্যময় আর বিরক্তিকর। তার বিষাক্ত সৌন্দর্যের চেয়ে তার প্রেমপ্রবণ হৃদয়কে তিনি বেশি ঘৃণা করতেন।

তিনি প্রায়ই অনুভব করতেন, নারীব কোমলতা তাঁকে আক্রমণ কবত কিন্তু তাঁকে কায়দা করতে না পারলেও তিনি তাদের এই স্নেহমমতার প্রয়োজন দেখে বিমূঢ়, হতভম্ব হয়ে পড়তেন।

তাঁর মনে হত, ভগবান নারীকে সৃষ্টি করেছেন শুধু মানুষকে ভোলাতে, তাকে পরীক্ষা করতে। আত্মরক্ষার উপযোগী হয়ে সতর্ক না হয়ে মানুষ যেন নারীর কাছে না যায়। সে যেন মনে মনে ভয় করে, যে-কোন মুহূর্তে তার উপর আক্রমণ হতে পারে। সত্যিই ত নারী যেন ফাঁদ—এই ফাঁদে মানুষকে বন্দী করবার জন্যে সে দুইটি বাহুলতা বিস্তার করে, অধরোষ্ঠ ঈষৎ বঙ্কিম করে।

তিনি শুধু সন্ন্যাসিনীদের বেলায় উদার ছিলেন। কিন্তু তবুও তাদের ওপর তাঁর ব্যবহার যথেষ্ট কর্কশ ছিল। তাদের সংযত হৃদয়ের

তলায়, পবিত্রতার গভীরে তিনি দেখতে পেতেন, অনন্ত কোমলতা যেন তাঁর দিকেও উৎসারিত হচ্ছে—যদিও তিনি একজন পুরোহিত।

তাঁর বাড়ীর কাছেই তাঁর এক ভাগনী, তার মায়ের সঙ্গে থাকত। তাদের বাড়ীটি ছোট্ট। তাঁর মতলব ছিল, ভাগনীটিকে তিনি সন্ন্যাসিনী বানাবেন। মেয়েটি দেখতে সুন্দরী, বোকাসোকা আর তাঁকে সে বড় বিরক্ত করত। পুরোহিত যখন ধর্মোপদেশ দিতেন, তখন সে বোকার মত হাসত। যখন তিনি রেগে যেতেন, তখন সে তাঁকে বুকে জড়িয়ে মুহুর্মুহু চুমু খেতো—সে এমন করে তাঁকে জড়িয়ে ধরতো যে ছাড়ানো দায় হয়ে পড়তো। তাঁর মধ্যে যে সুপ্ত পিতৃত্ববোধ, জেগে উঠে তাঁকে খানিকটা মাধুর্যের স্বাদ এনে দিত।

তিনি প্রায়ই তার সঙ্গে ঈশ্বরের কথা বলতেন—তাঁরা দুজনে মাঠের আল-পথে বহুদূব বেড়াতে যেতেন। কিন্তু তার কানে এসব কথা তেমন ঢুকতো না, সে আকাশের দিকে তাকাত, ঘাসের দিকে তাকাত, ফুল দেখত—এসব দেখে সে যেন অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করত। তার চোখে ফুটে উঠত বাঁচার আনন্দ। কখনও কখনও সে ছুটে গিয়ে কোন উড়ন্ত ফড়িং বা প্রজাপতি ধরত আর ছুটে এসে বলত, "দেখ মামা, কি সুন্দর এটা—আমার ওটাকে চুমু খেতে ইচ্ছে করছে।" তার এই চুম্বনের প্রয়োজন—বিশেষ করে ফড়িং বা ফুলকে চুমু খাবার মতলব তাঁর একেবারেই ভাল লাগত না, তিনি বিশেষ বিরক্ত হতেন, উত্তেজিত হতেন আর একেবারে ক্ষেপে যেতেন। এসবের মধ্যে তিনি দেখতেন নারীজাতির কোমলতা—যা কিছুতেই তাদের মন থেকে মুছে দেওয়া যায় না।

পুরোহিতের বাড়ীর গৃহকর্ম করতো একটি স্ত্রীলোক। সে একদিন খুব সাবধানে এবং সংযত ভাষায় পুরোহিতকে জানাল, তাঁর ভাগনী একটি ছেলের সঙ্গে প্রেমে পড়েছে।

কথাটা শুনে পুরোহিতের মনের অবস্থা ভীষণ হয়ে দাঁড়াল। তখন তিনি দাড়ি কামাবার জন্যে মুখে সাবান মাখিয়েছেন। রাগে

তিনি দাড়ি কামাতে পারলেন না—তাঁর মুখ দিয়ে খানিকক্ষণ একটা কথাও বার হল না।

তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে তিনি বললেন, "না, এ কখনো সত্যি না, মেলানী, তুমি মিথ্যে কথা বলছ।"

কিন্তু কৃষক মেয়েটি তার বুকে হাত দিয়ে বলল, "ভগবান যেন আমাকে মিথ্যে কথা বলবার শাস্তি দেন। পুরুতমশাই, সত্যি বলছি রোজ রাতে আপনার ভগ্নি শুয়ে পড়বার পর, আপনার ভাগনী বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে। নদীর ধারে ওরা দুজন একত্র হয়। রাত দশটা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত আপনি যে-কোন সময়ে গিয়ে নিজের চোখে দেখতে পারেন।"

দাড়ি কামানো সেরে, তিনি ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। তখন তিনি গভীরভাবে কোন কিছু চিন্তা করতেন, দাড়ি কামাবার সময়ে তাঁর গাল দু তিন জায়গায় কেটে যেতো।

সারাদিন তিনি চুপচাপ রইলেন। একটি কথাও তিনি কাউকে বললেন না! রাগে, আক্রোশে মুখখানা গম্ভীর করে রইলেন। একেইত একজন পুরোহিত হিসেবে ভাব-ভালবাসা তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না, তার উপর চেপে বসল পিতার কর্তব্য, শিক্ষকের দায়িত্ব আর পুরোহিতের নীতিনিষ্ঠা। এ যেন সেই ধরণের উষ্মা, যা কৃষকরা অনুভব করে, যখন তাদের মেয়ে এসে বলে যে, সে স্বামী পছন্দ করে ফেলেছে।

রাত্রের ভোজনের পর, তিনি কিছু পড়বার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁর পাঠ্য বিষয়ে মন বসল না। তাঁর কেবলই রাগ বেড়ে চলতে লাগল। ঘড়িতে দশটা বাজবামাত্র, তিনি তাঁর নিত্যসঙ্গী লাঠিটি হাতে নিয়ে বাড়ী থেকে বার হলেন। রাত্রে কোন পীড়িত লোকের শয্যা-পার্শ্বে তাঁর ডাক পড়লে, তিনি লাঠি ছাড়া বার হতেন না। বলিষ্ঠ মুঠোয় লাঠিটা ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে চললেন। তারপর সহসা লাঠিটা উঁচিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে তিনি একটা চেয়ারের

পিঠে সজোরে আঘাত করলেন। চেয়ারের পিঠটা ভেঙে খান খান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

এবার দোর ঠেলে তিনি বাইরে এলেন। কিন্তু দরজার চৌকাঠের উপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, আহা কি অপূর্ব জ্যোৎস্না—এ ঐশ্বর্য কদাচিৎ চোখে পড়ে!

তাঁর মনটা ছিল উঁচু—সে যেন কবির মন—তাঁর মন গলে গেল—নরম হয়ে পড়ল—রাত্রের স্নিগ্ধ ম্লান সৌন্দর্য তাঁকে অভিভূত করে ফেলল।

তাঁর ছোট্ট বাগানের গাছপালা যেন সেই স্নিগ্ধ আলোয় স্নান করে—পথের মাঝে আবছা ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। দেয়াল বেয়ে যে লতা উঠেছে, তার ফুল এক বিচিত্র মধুর গন্ধে বাতাস ভরিয়ে দিয়েছে।

সে সৌন্দর্যে নেশা ছিল—তিনি পাত্রের মদের মত সেই মাদকতা পান করে মাতাল হয়ে উঠলেন। ভাগনীর কথা তখন তাঁর মনের কোন আঁধারে ডুবে গেছে।

যেই বাগান পার হয়ে, তিনি গ্রামের খোলা মাঠের মধ্যে এসে পড়লেন, তখন তিনি এই মাঠের কথা ভাবতে লাগলেন। জ্যোৎস্নার বন্যা-ধারায় শান্ত রাত্রি এক মোহময় সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। ব্যাঙ চীৎকারে মেতে উঠেছে, জ্যোৎস্নার মোহে দূরবর্তী বাগান থেকে কোকিল পঞ্চমে তান তুলেছে—সব মিশিয়ে যেন একটা স্বপ্ন, তার মধ্যে কোন চিন্তা থই পায় না—এই সৌন্দর্য ও মাধুর্য যেন চুম্বনের মাধুর্য।

পুরুতমশাই হাঁটতে লাগলেন, তাঁর সাহস যেন কমে আসছে। কিন্তু কেন, তা যেন তিনি ঠাহর করতে পারলেন না। কি এক দুর্বলতায় তিনি যেন ভেঙে পড়ছেন—তাঁর সব শক্তি যেন স্তিমিত হয়ে আসছে। তাঁর কেবল মনে হতে লাগল, সেখানে বসে তিনি যেন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান।

অনেক দূর নীচে নদীর বাঁক ধরে পপলার গাছের সারি। ছায়া-স্নিগ্ধ এক স্বর্গীয় আলোকে নদীর সব বঙ্কিমতা অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছে। কুয়াসার মত একটা পাতলা স্বচ্ছতা যেন সব কিছুকে আবৃত করে রেখেছে। মুক্তার দ্যুতির মত একটা আভা যেন সব থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

পুরোহিতের আত্মাকে এই আলোক এসে স্পর্শ করল। মনের মধ্যে এক আবেগ জন্মে তার গতি স্তব্ধ করে দিল। একটা সন্দেহ, একটা অনির্দেশ্য আকুতি যেন তাঁকে পেয়ে বসল। সে প্রশ্ন তিনি বার বার মনে মনে মীমাংসা করবার চেষ্টা করেছেন, তা যেন আবার তাঁর মনের মধ্যে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠতে লাগল।

কেন ভগবান এমন করেছেন? রাত ত ঘুমের জন্যে, অঘোরে অচেতন হয়ে থাকবার জন্যে, বিশ্রামের জন্যে, সব কিছু ভুলে যাবার জন্যে। তবে কেন তাকে তিনি দিনের চেয়েও মোহময় সুন্দর করেছেন, ভোরের চেয়েও, সূর্যাস্তের চেয়েও তাকে সুন্দর করার উদ্দেশ্য কি? আর ঐ যে তারার আলো, ও মানুষকে সব ভুলিয়ে দেয় কেন? সূর্যের চেয়েও ওর কাব্য সুন্দর—মনে হয় এর আলো বুঝি রহস্যময়। গভীর কিছু উদঘাটিত করবার জন্যে—কেন সব কিছু ছায়াকে সে জাগিয়ে তোলে? কোকিল কেন অন্য পাখীদের মত রাতে ঘুমিযে না পড়ে এমন মধুর পঞ্চমে গান গায়? তার গান যেন রাত্রির অন্ধকা..ক নাড়া দিয়ে দিয়ে আরো রহস্যময় করে তোলে? জগতের উপর এই অর্ধেক ঘোমটা ঢাকা দিয়ে রাখার কারণ কি? এই জ্যোৎস্নায় প্রাণ কেন উদাস হয়? আত্মা কেন এক অজানা আকূতিতে চঞ্চল হয়? শরীর কেন এমন অবশ হয়ে আসে? কেন এই মোহ, যা মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে বলে অনুভব করতে পারেনা? এই মহান কাব্য কার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে—স্বর্গ থেকে এ সৌন্দর্য কেন অকৃপণ ধারায় পৃথিবীকে উচ্ছ্বসিত করে দেয়? এর অর্থ যেন পুরোহিত একেবারেই বুঝতে পারলেন না।

কিন্তু দূরে—বহু দূরে মাঠের ধার ধরে দুটি ছায়া এগিয়ে চলেছে। তাদের মাথার ওপর গাছের ডালের কালো ছায়া—চাঁদের আলোয় তাদের দেহ যেন গলে মিশে যাচ্ছে।

পুরুষ মানুষটি একটু ঢ্যাঙা—তার হাতটা তার প্রেমিকার কাঁধের উপর নিবিড় অন্তরঙ্গতায় ন্যস্ত। থেকে থেকে সে প্রেমিকার কপালে চুমু খাচ্ছে। তারা যেন সমস্ত দৃশ্যটিকে সজীব করে তুলেছে—মনে হচ্ছে—এই জ্যোৎস্না যেন তাদের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে। ওদের দুজনকে মনে হচ্ছে একটি সত্ত্বা—এই শান্ত রাত্রি যেন তাদের জন্যে সৃষ্টি। পুরোহিতের মনে হল তাঁর প্রশ্নের যেন ওরা সজীব উত্তর।

তাঁর বুক দুর-দুর করতে লাগল। তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বাইবেলে পঠিত রুথ আর বোয়াজের কথা তাঁর মনে হল। এ যেন ভগবানের ইচ্ছার পরিণতি। কোমলতা ও প্রেমের উচ্ছ্বাসভরা বাইবেলের পংক্তিগুলো তাঁর মনে পড়তে লাগল। তিনি আপন মনেই বলে উঠলেন, "ভগবান মানব প্রেমকে আদর্শ করে তোলবার জন্যে এমন মোহময় রাত্রি সৃষ্টি করেছেন।"

তিনি ধীরে ধীরে প্রেমিক যুগলের কাছ থেকে সরে এলেন। মেয়েটি তাঁরই ভাগনী! তিনি নিজের মনকে প্রশ্ন করলেন—তিনি কি ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করতে যাচ্ছিলেন না? প্রেম ভগবানের অনুমোদিত, তা না হলে কেন তিনি তাকে এরকম মাধুর্যময় সৌন্দর্যে মণ্ডিত করবেন?

তিনি সেখান থেকে দ্রুত চলে এলেন। মন ভরা তাঁর বিস্ময়—তাঁর মনে হ'ল, তিনি কোন মন্দিরে অনধিকার প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন, সেখানে প্রবেশ করার তাঁর যেন কোন অধিকারই নেই।

## সাত

## ॥ একটি যাত্রীর গল্প ॥

### ১

যখন ক্যানিস্ ছাড়লাম, তখন গাড়ী ছিল যাত্রী বোঝাই। সকলে পরিচিত—আমরা গল্প করছিলাম। যেই আমরা তারাস্কন্ ছাড়লাম, কে একজন অমনি বলে উঠল, "এই জায়গায় খুব নরহত্যা হয়—আর হয় খুন, জখম, রাহাজানি।"

আমাদেব গল্প শুরু হয়ে গেল রহস্যজনক হত্যা আর যে সব হত্যার কোন কিনারাই শেষ পর্যন্ত হয়নি, সেই সব বিষয় সম্বন্ধে। গত দু বছরে কত পথযাত্রীর জীবনই না এইভাবে শেষ হয়েছে। প্রত্যেকেই আন্দাজমতো তার মত দিতে লাগল। গাড়ীর জানালা দিয়ে অন্ধকাবের দিকে তাকিযে মেয়েরা ভয়ে শিউরে উঠে কল্পনা কবতে লাগল, এখনি দবজার সামনে একজনের মাথা দেখা যাবে। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ—চলন্ত গাড়ীতে উন্মাদের সাক্ষাৎকার—এইসব নানারকম গল্প কবতে করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল।

প্রত্যেকেই এক একটা গল্প বলে বাহাদুরি দেখাতে গেল। প্রত্যেকে নিজে কিভাবে দুর্বৃত্তের সম্মুখীন হয়েছে, কিভাবে নিজে তার গলা টিপে দিয়েছে—এমন অদ্ভুত উপস্থিত বুদ্ধির সব গল্প বলতে লাগলো।

একজন ডাক্তার প্রত্যেক বছর শীতকালে দক্ষিণ দেশে কাটাতেন। তিনি একটা গল্প বলতে চাইলেন। তিনি বললেন, "এ রকম কোন ব্যাপারে পড়ে নিজের সাহস পরীক্ষা করার সুযোগ আমার কোনদিন ঘটেনি। কিন্তু আমি এমন একজন মহিলাকে জানি—তিনি এখন বেঁচে নেই। তিনি ছিলেন আমার একজন রোগী—তাঁর জীবনে

একটি আশ্চর্য এবং অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনা যেমন রহস্যজনক আবার তেমনি মর্মস্পর্শী।

তিনি ছিলেন রুশ-মহিলা—কাউণ্টেস মারিয়া বারানৌ—বেশ মহীয়সী আর অপূর্ব সুন্দরী রমণী। আপনারা সবাই জানেন, রুশ-মহিলারা বেশ সুন্দরী হন। আমাদের চোখে, অন্ততঃ তাঁদের কত সুন্দর দেখায়—তাঁদের নাকের গড়ন সুন্দর—মুখগুলো সুকুমার আর তাঁদের চোখের রং অবর্ণনীয়—নীলাভ-ধূসর আর সব জড়িয়ে কেমন একটা স্নিগ্ধ মাধুরী! এ-সব সৌন্দর্যের মধ্যে মোহময় একটা আকর্ষণ আছে। উদ্ধত অথচ মধুর, কোমল অথচ কঠিন—সব যেন ফরাসীদের কাছে মনোমুগ্ধকর। হয়ত, অন্য জাতি বলেই এরকম মনে হয়—আর আমিও তাদের মধ্যে এর সব কিছুই দেখতে পাই।

মহিলাটির চিকিৎসক বহু বছর থেকে লক্ষ্য করছিলেন যে, তাঁর ভয়ঙ্কব ফুসফুসের পীড়া হয়েছে। আর তিনি তাঁকে ফ্রান্সের দক্ষিণে বায়ু পরিবর্তনে আসবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছেন। কিন্তু, তিনি একগুঁয়ে ভাবে পীটাসবাগ ছাড়তে অস্বীকার করছেন। শেষ পর্যন্ত, গত হেমন্তকালে ডাক্তার তাঁর স্বামীকে সাবধান করে দিলেন। তাঁব স্বামী তাঁকে তখনি মেনটনে যাবাব সকল রকম ব্যবস্থা করে দিলেন।

তিনি একাকী নিজের গাড়ী চেপে ট্রেনে এসে চড়লেন, তাঁর সহকারা গাড়ীর অন্য কামরায় আসছিল। তিনি কিছুটা বিমর্ষভাবে দরজার পাশে বসেছিলেন। তিনি দেখছিলেন, মাঠ গ্রাম সব দূরে চলে যাচ্ছে। তাঁব বঁড় একা-একা ঠেকছিল। তিনি বন্ধুহীন, তাঁর ছেলে নেই, মেয়ে নেই—স্বামীব ভালবাসাতেও এখন ভাটা পড়েছে। তিনি তাঁকে পৃথিবীর সুদূব প্রান্তে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, অথচ তিনি সঙ্গেও আসেননি, যেন কোন রোগগ্রস্ত চাকরকে হাসপাতালে পাঠান হচ্ছে।

প্রত্যেক স্টেশনে মহিলার চাকর আইভান এসে খোঁজ নিয়ে যাচ্ছে—গিন্নীর কিছু দরকার আছে কিনা। সে বাড়ীর বুড়ো চাকর। তাঁর অন্ধ ভক্ত—মনিবের হুকুম তামিল করার জন্য সর্বদা উৎসুক।

রাত নেমে এল, ট্রেন দ্রুত গতিতে ছুটছে। তাঁর চোখে ঘুম আসছে না—একে ক্লান্ত, তার উপর তাঁর যেন কেমন ভয় ভয় করছিল।

সহসা তাঁর মনে হল, আসার আগে তাঁর স্বামী তাঁকে যে মুদ্রা দিয়েছেন, সেগুলো গোণা দরকার। তিনি থলি খুলে সমস্ত মুদ্রা কোঁচড়ে ঢেলে ফেললেন।

কিন্তু সহসা একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝটকা তাঁর মুখে লাগল। চমকে তিনি মুখ তুললেন।

দরজাটা সদ্য খোলা হয়েছে। কাউন্টেস মারিয়া বিমূঢ় হয়ে তাড়াতাড়ি মুদ্রার উপর একটা শাল দিয়ে মুদ্রাগুলো ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ কেটে গেল—তারপর সান্ধ্য পোশাক-পরা জনৈক ভদ্রলোককে দেখা গেল, তার মাথায় কোন টুপী ছিল না—তার হাতে ক্ষত—আর সে হাঁপাচ্ছিল। সে দরজা বন্ধ করে বসল, উজ্জ্বল চোখ মেলে তার সঙ্গিনীকে দেখল। একটা রুমাল দিয়ে তার হাতের ক্ষত স্থান জড়িয়ে নিল। সেখান থেকে তখনো রক্ত পড়ছিল।

মহিলাটি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়বার মত হলেন। তিনি ভাবলেন—লোকটা নিশ্চয়ই তাঁকে মুদ্রা গুণতে দেখেছে, আর তাঁর সব অর্থ কেড়ে নিয়ে তাঁকে খুন করতে এসেছে।

লোকটা মহিলাটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল—তার যেন নিঃশ্বাস পড়ছে না। তারপর তার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। এবার নিশ্চয় সে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সে সহসা বলে উঠল, "ভয় পাবেন না।"

মহিলাটি কোন উত্তর দিলেন না, তাঁর মুখ খোলবার ক্ষমতা ছিলনা। তাঁর বুকের ধ্বক্ ধ্বক্ শব্দ তিনি নিজেই শুনতে পাচ্ছিলেন আর তাঁর কান ভোঁ ভোঁ করছিল।

সে বললে, "আমি ডাকাত নই।"

তিনি তখনো চুপ করে রইলেন, কিন্তু সহসা তিনি নড়ে বসায় তাঁর কোল থেকে স্বর্ণমুদ্রাগুলো ঝরণার জলস্রোতের মত মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল।

লোকটা এত মুদ্রা মেঝেতে পড়া লক্ষ্য করে হেঁট হয়ে সেগুলো কুড়োতে উদ্যত হল।

তিনি অত্যন্ত ভয় পেয়ে মেঝের কার্পেটের উপর তাঁর যথাসবস্ব ফেলে বাইরে লাফ দিয়ে পড়বার জন্যে দরজার দিকে ছুটে গেলেন।

কিন্তু তিনি কি করতে যাচ্ছেন, তা সে বুঝতে পারলো আর সামনে লাফ দিয়ে তাঁর হাত ধরে ফেললে। তাঁকে জোর করে বসিয়ে শক্ত করে তাঁর হাত ধরলে।

সে বললে, "আমার কথা শুনুন। আমি ডাকাত নই। তার প্রমাণ স্বরূপ, আমি আপনার সব স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করে আপনাকে ফেরৎ দিচ্ছি। কিন্তু আমার দফাবফা হয়ে গেছে এবং আমার মৃত্যু নিশ্চিত। এর বেশী কিছু আমি আপনাকে বলতে পারছি না। এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা রাশিয়ার সীমান্ত স্টেশনে পৌঁছে যাব। আমরা রাশিয়া সাম্রাজ্যের সীমান্ত পার হব আর একঘণ্টা কুড়ি মিনিটের মধ্যে। যদি আপনি আমাকে সাহায্য না করেন, আমার সব শেষ। অথচ আমি কাউকে খুন করিনি, কারো কিছু চুরি করিনি, অসম্মানজনক কোনও কাজ করিনি। আমি একথা শপথ করে বলতে পারি। এর বেশি আর কিছু আমি আপনাকে বলতে পারি না।

সে হাঁটু গেড়ে বসে একটি একটি করে স্বর্ণমুদ্রাগুলো খুঁটে তুললো, সীটের তলায় যেগুলো গড়িয়ে গেছিল সেগুলোও সে দূর থেকে সংগ্রহ করে দিল। তারপর চামড়ার থলিটা ভরে উঠতে সে কোন কথা না বলে নীরবে মহিলাটিকে দিয়ে তার নিজের আসনে গিয়ে বসল। ওদের কেউ নামল না। তিনি তখনো ভয়ে নিশ্চল প্রতিমূর্তির মত বসে রইলেন। কিন্তু একটু একটু করে তিনি যেন

ধাতস্থ হতে লাগলেন। আর সে? সে কোন সাড়াশব্দ করলে না, বা নড়াচড়া করলে না। সে সামনের দিকে তাকিয়ে সিধে হয়ে বসে রইল—তার মুখ রক্তহীন, যেন সে মৃত। মাঝে মাঝে তিনি দ্রুত তার দিকে তাকাচ্ছিলেন, আব দ্রুত তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন। লোকটার বয়স মনে হয় ত্রিশ বছর, আর দেখতে বেশ সুশ্রী এবং সে একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ট্রেন ছুটছে—মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ বাঁশির শব্দ শোনা যাচ্ছে, কখনো মৃদু, কখনো দ্রুত। কিন্তু সহসা ট্রেনের গতি শ্লথ হয়ে এল, তাবপর কয়েকবাব তীক্ষ্ণ হুইশেল দিয়ে ট্রেন থেমে গেল।

আইভানকে গাড়ীব দরজার কাছে দেখা গেল। সে গিন্নীব হুকুম তামিল করতে এল!

কাউন্টেস একবাব তার সঙ্গীব দিকে দেখে, কম্পিত গলায় তাঁর চাকরকে বললেন, "আইভান, তোমাকে আব আমার দরকাব নেই। তুমি কাউন্টের কাছে ফিরে যাও।"

লোকটা হতভম্ব হয়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে তাঁর দিকে তাকিয়ে কি যেন বলবার চেষ্টা কবল,

"কিন্তু মা—"

তিনি বললেন, "না, তোমাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে না। আমি মত পরিবর্তন করেছি। আমি চাই যে, তুমি রাশিয়া থেকে যাও। বাড়ী যাবার জন্যে এই খরচ নাও। তোমার টুপী আর পোশাক আমাকে দাও।"

বুড়ো চাকর ভয় পেয়ে গেল। সে টুপী ও পোশাক খুলে দিল! সে মনিবদের খেয়াল অনুযায়ী কাজ করতে সর্বদা অভ্যস্ত। জলভরা চোখে বিদায় নিয়ে সে চলে গেল।

আবার সীমান্তের দিকে ট্রেন চলতে লাগল।

তখন কাউন্টেস মারিয়া তাঁর সঙ্গীকে বললেন, "শুনুন, এগুলো আপনার জন্যে, আপনি এখন আমার চাকর আইভান। আমি যা

করছি তা একটি শর্তে। আপনি আমার সঙ্গে একটি কথাও বলবেন না বা আমাকে কোন কিছুর জন্যে ধন্যবাদ দেবেন না।

অপরিচিত লোকটি একটি কথাও উচ্চারণ না করে, নত হয়ে তাঁকে অভিবাদন জানালো।

অবিলম্বে সীমান্তে ট্রেন থামল। উর্দীপরা রেল কর্মচারী ট্রেনের কামরায় এসে হাজির হল।

কাউন্টেস্ তার হাতে কাগজপত্র দিয়ে বসে থাকা লোকটিকে দেখিয়ে বললেন, ঐ আমার চাকর আইভান—ওর পাশপোর্ট এইটা।"

আবার ট্রেন ছেড়ে দিল।

সে রাত্রি তারা তুজন সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে মুখোমুখি বসে রইল।

সকাল হলে, একটা জার্মান স্টেশনে গাড়ী থামলে অপরিচিত লোকটি নেমে গেল। দরজার কাছ থেকে সে বললে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করছি বলে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আপনাকে একজন চাকরের সাহায্য থেকে বঞ্চিত করেছি বলে, আমার উচিত তার স্থলাভিষিক্ত হওয়া। আপনার কিছু চাই কি?"

সহজ কণ্ঠে তিনি বললেন, "আমার চাকরাণীকে ডেকে দিন।" সে তাকে ডেকে দিতে গেল এবং তারপর আর তাকে দেখা গেলনা।

মধ্যাহ্ন-ভোজের সময় মহিলাটি যখন একটা স্টেশনে নামলেন তখন দেখলেন, লোকটা দূর থেকে তাঁকে দেখছে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা মেনটনে পৌঁছলেন।

## ২

মিনেটের জন্যে ডাক্তার চুপ করলেন।

তারপর আবার শুরু করলেন।

একদিন আমি চেম্বারে বসে রোগী দেখছি, এমন সময় একটি লম্বা যুবক এসে চেম্বারে ঢুকল। সে আমাকে বললে, ডাক্তারবাবু,

আমি আপনার কাছ থেকে কাউন্টেস মারিয়া বারানোর খবর জানতে এসেছি। আমি তাঁর স্বামীর একজন বিশিষ্ট বন্ধু, যদিও তিনি আমাকে চেনেন না।"

আমি বললাম, তাঁব আর আশা নেই। তিনি আর কোনদিন রাশিয়া ফিরতে পারবেন না।"

লোকটি হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর সে উঠে চলে গেল—মাতালেব মত সে টলতে টলতে চলে গেল।

সেই সন্ধ্যায় আমি কাউন্টেসকে বললাম, একজন অপরিচিত লোক তাঁর খবর নিতে এসেছিল। তিনি বেশ অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং আমাকে এই গল্পটা বললেন। তিনি আরো বললেন, "ঐ লোকটিকে আমি আদপেই জানিনা। কিন্তু ও আমাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে .েড়াচ্ছে। আমি বাইরে বার হলেই ওর সঙ্গে আমার ·দেখা হয়। আমার দিকে ও এক অদ্ভুতভাবে তাকায়, কিন্তু ও কোনদিন আমাব সঙ্গে কথা বলেনি।

তিনি একটু থামলেন। তারপর আরো বলতে লাগলেন, আমি বাজি রেখে বলতে পাবি যে, সে এখন জানলার নীচে অপেক্ষা করছে।"

তিনি তাঁর হেলানো চেয়াব ছেড়ে জানলার দিকে গেলেন আব পর্দাটা সরিয়ে দিলেন। আর সত্যি সত্যি আমাকে সে লোকটিকে দেখালেন। সে বেঞ্চিতে বসে বাড়ীর দিকে চেয়ে আছে। সে আমাদের দেখতে পেয়ে উঠে চলে গেল। একবারও আমাদের দিকে ফিরে তাকালো না।

তখন আমি বুঝলাম—সেই আশ্চর্য করুণ কাহিনী! এই দুটি প্রাণীর মূক ভালবাসা—অথচ এরা কেউ কাউকে চেনে না।

সে তাঁকে নিবিড়ভাবে ভালবাসে—যেমন কোন জন্তুকে উদ্ধার করলে, সে তার উদ্ধারকর্তাকে ভালবাসে। সে প্রত্যহ আসত এবং শুধু আমাকে জিজ্ঞাসা করতে, "তিনি কেমন আছেন?"

সে বেশ বুঝত যে, আমি তার মনোভাব বুঝি। তাঁকে প্রত্যহ যেতে দেখে, আর তাঁর ক্রমশঃ দুর্বল ও পাণ্ডুর অবস্থা দেখে সে কাঁদত।

মহিলাটি আমাকে বলেছিলেন, "ঐ অদ্ভুত লোকটির সঙ্গে আমি শুধু একবার কথা বলেছি, কিন্তু তবু মনে হয় আমি যেন তাকে কুড়ি বছর ধরে জানি।"

তারা যখন মুখোমুখি হত, তিনি তার প্রতি নমস্কারে গম্ভীরভাবে মনোমুগ্ধকর হাসি হাসতেন। আমি অনুভব করলাম যে, তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে—একথা তিনিও জানতেন—কিন্তু এইভাবে ভালবাসা পেয়ে তিনি সুখী হতেন—এই শ্রদ্ধা, এই একনিষ্ঠতা আর এই ভক্তি খুবই দুর্লভ।

সে যাই হোক, তিনি অত্যন্ত একগুঁয়েভাবে তার নাম পর্যন্ত জানতে চাইতেন না, তার পরিচয়ও জানতে চাইতেন না বা তার সঙ্গে কথা বলতে চাইতেন না।

"না, না, ওতে এই অদ্ভুত বন্ধুত্ব মাটি হয়ে যাবে। আমাদের পরস্পরের কাছে অপরিচিত থাকতেই হবে।"

আর সেই লোকটা? সেও কেমন হাস্যাস্পদ, ভীরু প্রকৃতির ছিল, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার কোন চেষ্টাই সে কোনদিন করেনি। সে তাঁর কাছে যে আজগুবি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, কোন দিন তাঁর সঙ্গে সে কথা বলবেনা, তা সে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেছিল।

প্রায়ই তাঁর দীর্ঘ অসুখের সময়ে তিনি তাঁর হেলানো চেয়ার থেকে উঠে জানলার পর্দা টেনে দেখতেন যে, সে জানলার নীচে বসে আছে কিনা আর যখন তিনি তাকে দেখতেন বরাবরের মতই নিশ্চল হয়ে বেঞ্চে বসে থাকতে। তিনি ফিরে এসে চেয়ারে শুয়ে পড়তেন আর তাঁর ঠোঁটে ফুটে উঠত এক অপূর্ব পরিতৃপ্তির হাসি।

একদিন সকাল দশটায় তিনি মারা গেলেন।

আমি যেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, অমনি সে আমার কাছে এল। তার মুখ দেখে বোঝা গেল যে, সে ইতিমধ্যেই খবর পেয়ে গেছে।

সে বললে, "আপনার উপস্থিতিতে আমি তাঁকে ক্ষণিকের জন্য একবার দেখতে চাই।"

আমি তাকে হাত ধরে নিয়ে গেলাম। আমরা দুজনে বাড়ীর মধ্যে এক সঙ্গে ঢুকলাম।

মৃতা মহিলার বিছানার পাশে এসে যে তাঁর হাতটা তুলে নিয়ে দীর্ঘসময় গভীর আবেগে চুম্বন করল। তারপর সে অজ্ঞান, অচৈতন্য লোকের মত বেরিয়ে গেল।

ডাক্তার আবার চুপ করলেন। তারপর তিনি পুনরায় বলতে আরম্ভ করলেন, হয়ত এ রকম অদ্ভুত রেলপথের অভিযান আপনারা নিশ্চয় আর কোন দিন শোনেননি। তবে একথা বলতেই হবে যে, মানুষটি অদ্ভুত আর পাগল।

একজন মহিলা খাটো সুরে মন্তব্য করলেন, "এরা কিন্তু আপনি যত উন্মাদ ভেবেছেন তত উন্মাদ নয়। এঁরা হলেন—এঁরা হলেন—।

কিন্তু তিনি আর কথা বলতে পারলেন না। তিনি তখন কাঁদছেন। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য অন্য বিষয়ে কথা শুরু হল বলে, কেউই জানতে পারল না যে, তিনি কি বলতে চাইছিলেন।

———

## আট

### ॥ লিলি লালা ॥

লুই দ্য আরেন্দেল কথা বলছিল। মনে হচ্ছিল, যেন সে স্বপ্ন দেখছিল, আর যেন কি স্মরণ করবার চেষ্টা করছিল। প্রথমবার আমি যখন মেয়েটিকে দেখি, তখন আমার মনে হয়েছিল, যেন কবেকার একটা ঢিমে তালে শোনা আবেগময় সঙ্গীত শুনছি। সে সঙ্গীত কে গেয়েছিল, তা আমার মনে পড়ছিল না। সে সঙ্গীতে ছিল, কেশবতী এক কন্যার কথা, যার চুল ছিল রেশমের মত আর সোনালী ঢেউয়ের মত সুন্দর। তার মৃত্যুর পর তার প্রেমিক তার চুল কেটে নিয়ে, তা দিয়ে একটা বেহালার ছড় করিয়েছিল। সেই ছড় দিয়ে বেহালা বাজালে এক স্বপ্নিল প্রেমের মাধুরি ছড়াতো, আর সে যে সুর শুনতো, আমৃত্যু সে প্রেমিক হয়ে যেতো।

"তার চোখ ছিল গভীর জলের মত রহস্যময়। যে দেখত, সেই রহস্যের অতল গভীরে ডুবে যেত। আর তার মুখবিবরের দুধারের কূপে এক নির্মম হাসির রেখা ফুটত। মনে হত যে, সে নিষ্ঠুর রাণীর মত দর্শকদের উপর বিজয় গর্বে প্রভুত্ব করত। এই সব মেয়েদের হৃদয় মঠের সন্ন্যাসিনীদের মত স্মিত পবিত্র থাকতো, যতই তারা কামনার মধ্যে কাল কাটাক না কেন।

আমি তাকে দেখেছি। তার মাথা দেখলে মনে হত, যেন সে স্বর্গের দেবী। চুল তার এমনভাবে বাঁধা থাকত যে, মনে হত যেন সোনা দিয়ে বাঁধানো—দীর্ঘ সুঠাম তার দেহ, হাত দুটি ছোট্ট আর কোমল। গীর্জার জানলার শার্সিতে আঁকা শিশুর মত তাকে দেখাতো এবং যে চিত্রে দেবদূত গ্যাব্রিয়েল মেরীকে যীশুর জন্মবার্তা জানাচ্ছেন, সেই ছবির কথা মনে পড়ে যেত। ঘন নীল ডানা মেলে দেবদূত নেমে আসছেন আর মেরী বসে চরকা কাটছেন—তার

পাশে যে সব লিলি আর গোলাপ ফুল ফুটে আছে, মেরী যেন তার একটি প্রকাণ্ড লিলি ফুল।

তাকে প্রথম রাতে রঙ্গমঞ্চে দেখলাম। বাবলা বনের মধ্যে সে একাকী ভ্রমণ করছে। মনে হল, জীবন তার কাছে যেন একটা ভার-বোঝা—এ জীবন বদল করবার ক্ষমতা তার নেই, যতই শুষ্ক একঘেয়ে হোক—তাকে দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না যে, একদা সে জীবনের খরস্রোতে ভেসেছিল—স্বেচ্ছাচারী জীবনের বিলাস-তরঙ্গে ভাসার জন্য তার নাম হয়েছিল 'লিলি লালা'। যে তার সংস্পর্শে একবার এসেছিল, তার আর কোনরকম নিস্তার ছিল না। তার জন্যে তাকে সর্বস্বান্ত হতে হয়েছিল।

লিলি লালা সম্বন্ধে যতই কেন জানা যাক না, তার কণ্ঠস্বর ছিল পড়ুয়া বালিকার মত—যেন সে নির্দোষ, নিষ্পাপ—এখনো দড়ি নিয়ে লাফ কাটে—হাটুর উপরে পোশাক পরে। আর, কি নিরীহ তার হাসি। শুনলে মনে হয়, যেন মন্দিরের পবিত্র ঘণ্টা বাজছে। কখন কখন মজা করবার জন্যে আমি তার সামনে নত জানু হয়ে, জোড় হাত করে, প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে প্রার্থনা করেছি।

একদিন সন্ধ্যায় আকাশে যখন দারুণ গ্রীষ্মের আমেজ আর সমুদ্র বর্ষাকালের মত নীল আর দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠে কন্‌ফরাসের দ্যুতি ছড়াচ্ছে, এমন সময় সমুদ্রের বেলায় বসে লিলি যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। জুতো দিয়ে বালির উপর গর্ত করতে করতে হঠাৎ কেমন করে সে নিজের কথা বলে ফেলল। অনেক সময় মেয়েরা এমন স্বীকৃতি দিয়ে ফেলে।

"দেখ হে, আমাকে দেবী বলে এত ভক্তি করবার উপযুক্ত পাত্রী আমি মোটেই নয়। আমার জীবন মোটেই বাইবেলের মত পবিত্র নয়, বরং নাটকের মত রোমাঞ্চকর। যতদূর মনে করতে পারি, একজন মেয়ে আমাকে রেশমের কাপড়ে জড়িয়ে রাখতো—কত আদর করত। এরূপ আদরে আদরে আমার দফা রফা করে ফেলেছিল।

কি আদরেই না আমাকে সে চুমু খেত—কি মধুর আমেজ সেই চুম্বনের—আমার হৃদয়ের এককোণে তার স্মৃতি চিরজাগরূক হয়ে আছে। আমি সেই স্মৃতি সৌভাগ্য-মণির মত সযত্নে পুষে রেখেছি। মনে হয়, সে দিনের স্মৃতির ওপর যেন ঝাপসা কুয়াশা নেমে এসেছিল —যেন কোন হ্রদে রাজহাঁস খেলা করছিল কিন্তু একটা ঝড় এসে তাকে কালো ছায়ায় ঢেকে দিল। মাঝে মাঝে যখন আমি অনেকক্ষণ ধরে আয়নায় মুখ দেখি, তখন যেন সেই মেয়েটিকে মনে করতে পারি, সে আমাকে আদরে মুহুর্মুহু চুমু খেতো আর স্নেহভরা স্বরে আমার সঙ্গে কথা কইতো। কিন্তু পরে কি হল ?

"আমাকে কি কেউ চুরি করে নিয়ে পালালো ? না, আমাকে কোন সার্কাসের দলে বিক্রী করে দিয়ে গেল ? জানিনা, কোন অসৎ চাকর এ কাজ করল, না কিসে কি হল ? এ রহস্য আমি শত চেষ্টা করেও জানতে পারিনি। তবে মনে পড়ে যে, আমার সারা শৈশবই সার্কাসের দলে কেটেছে—এই সার্কাসের দল মেলায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতো। এক জায়গায় খেলা দেখাবার পর জীবজন্তুদের নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা করে বাজনা বাজাতে বাজাতে অন্য জায়গায় যেত।

আমি তখন ছোট—তাদের বিরাট দলে পতঙ্গের মত। ওরা আমাকে কঠিন কঠিন কসরৎ শেখাতো—টান করে বাঁধা দড়ির উপর নাচা আর আলগা দড়ির ওপর খেলা দেখানো। আমাকে ঠ্যাঙানো চলত নির্মমভাবে, কোন মায়া দয়া করা হত না। যেন আমি রবারের মানুষ। কখনো আমাকে খেতে দিত এক টুকরো মাংস, আর অধিকাংশ সময়ে দেওয়া হত বাসি রুটি। মনে আছে, একদিন পালিয়ে গিয়ে আমি এক পাত্র ঝোল খেয়ে ফেলি—একটা ক্লাউন তার প্রিয় পোষা কুকুরদের জন্যে এই ঝোল বিশেষ যত্ন করে রেঁধেছিল।

বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন আমার কেউ ছিল না। সবচেয়ে নোংরা কাজগুলো আমাকে দিয়ে ওরা করাতো আর আমার সারা অঙ্গে এখনও বহু মারের দাগ অনেক আছে। সারা দলের মধ্যে যে

মালিক আমাকে সবচেয়ে বেশি ঠ্যাঙাতো—আমাকে শাস্তি দিয়ে সে খুব আনন্দ পেত। দলের সকলে ছিল তার উপর চটা—লোকটার দয়ামায়া কিছু ছিল না। সে লুকিয়ে টাকা জমাতো আর লোকসানের কথা বলে দলের লোকের মাইনে কমাতো।

লোকটার নাম ছিল রাকা গিনেসটাস। অন্য কোন মেয়ে হলে, কবেই ত পটল তুলতো কিন্তু আমার জান ছিল কড়া। আমি টিকে গেলাম। শুধু টিকে যাওয়া নয়, আমার শরীরে মাংস গজাল, দেহ চেকনাই হল আর আমি অনেকের কামনার বস্তু হয়ে উঠলাম। যখন আমার বয়স পনের বছর হ'ল, তখন থেকেই আমার নামে প্রেমপত্র আসতে লাগল, সার্কাসের বহু দর্শক আমার দিকে ফুলের বুকে ছুঁড়ে দিতে লাগল। সার্কাসের সকল দর্শকের চোখ যেন আমাকে গিলে খেত—সবাই যেন আমাকে পেতে চাইত। তাঁবুর এ থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত আঁট করে টানা দড়ির উপর দাঁড়িয়ে আমি যখন খেলা দেখাতুম, তখন আমার আঁট সাট পোশাকের উপর দর্শকের চক্ষু নিবদ্ধ থাকত—তাদের চোখের কামনা যেন আমাকে গিলে খেতে আসতো।

ক্রমশঃ তারা আমার কাছে আসতে লাগল, মধুর স্বরে কথা কইতে লাগল আর আমি যখন সাজঘরে এসে পোশাক বদল করতুম তখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত।

এসব দেখে রাকা গিনেসটাসের মাথা একেবারে ঘুরে গেল। আমার কাছে এলে, তার বুকের ধ্বক্ ধ্বক্ শব্দটি পর্যন্ত আমি শুনতে পেতুম। সে কত রকম প্রস্তাব আমার কাছে করতো—সে সব শুনে আমার গাল কপোল লাল হয়ে উঠত—আমি বিরক্ত হতাম আর তার প্রতি আমার দারুণ ঘৃণা থাকায়, আমি সর্বশক্তি দিয়ে সে সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতাম—সারা অন্তর আমার বিদ্রোহী হয়ে উঠত—আর সে আমার উপর যেসব উপদ্রব করেছে, তার শতগুণ, আমি তাকে জ্বালাতন করতাম।

সে বশীভূত পশুর মত আমার সব অত্যাচার সহ্য করত আর আমি নানা রকম নতুন নতুন শয়তানীর ফন্দি এঁটে তাকে বিপর্যস্ত করে তুলতুম। সে আমাকে ভালবাসত—সত্যি সত্যি ভালবাসত—সেই কামুক লোকটা—যে কোনদিন নারীর মধ্যে সুখের ইন্ধন ছাড়া আর কিছু দেখেনি—যাকে সে সাময়িক ভুলে থাকার বস্তু ছাড়া আর কিছু মনে করত না। বুড়ো মানুষ যেমন ভালবাসে—সে ভোগ করবার কামনায় ভরপুর অথচ ভোগ করবার শক্তিশূন্য—সেই রকম নিষ্ফল কামনায় সে আমাকে ভালবাসতো। আর আমি—পশুকে যেমন করে চেনে বেঁধে সংযত রাখে, তেমনি—তাকে সেরূপ সংযত রাখতাম।

আমি এমনি করে মালিকের ওপর খবরদারী করতাম। আশার ছলনায় ভুলে বেচারা দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগল। আমার আঙুলে ডগাও সে ছুঁতে পারেনি—সে আমার জুতো, আমার কর্সেট, পরচুলা এইসব নিয়ে সে ভাবে বুঁদ হয়ে থাকত। কাজেই আসল অন্তরঙ্গতা তার সঙ্গে হল না। আমি তাকে আদপেই আমল দিতাম না। ফলে, সে ক্রমশঃ অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগল আর কেমন যেন বোকা হয়ে যেতে লাগল। সে সাধ্যসাধনা করতে লাগল, আমাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিল। সে কান্নায় ভেঙে পড়ে কাকুতি জুড়ে দিত, কিন্তু আমি তার কথায় কেবল উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠতাম। তাকে মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দিতাম যে, সে আমাকে কি নিদারুণ ভাবে মেরেছে, কি নিষ্ঠুর নির্যাতন করেছে—কি অপমানটাই না আমাকে করেছে—যার ফলে, আমি রাতদিন তার মৃত্যু কামনা করেছি। তারপর সে আমার কাছ থেকে গিয়ে বোতল নিয়ে বসত আর গ্লাসের পর গ্লাস মদ টেনে সে টেবিলের নীচে অজ্ঞান হয়ে সব ভুলে যেত।

হীরেমুক্তো পান্নায় সে আমাকে ঢেকে দিল। আর তার স্ত্রী হবার জন্যে আমাকে নানা উপায়ে লোভ দেখাত। আমি দুনিয়ার কিছুই না জানলেও সে সব কাজে আমার পরামর্শ নিত। একদিন

আমি শুধু তার গালে হাত বুলিয়ে তার সবই উইল করে নিলাম ; এই উইলে সে তার সর্বস্ব আমাকে দান করে ফেলল।

তখন শীতকালের মাঝামাঝি। আমরা মস্কোর কাছাকাছি রয়েছি। রোজ বরফ পড়ছে—ঠাণ্ডা থেকে বাঁচবার জন্যে সবাই আগুনের কাছে থেকে থেকে প্রায় ঝলসে উঠছি। রাকা গিনেসটাস বড় ভ্যানটাতে সান্ধ্য ভোজ আনিয়ে সার্কাসের শেষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খানাপিনা চালাচ্ছে। আমি তার ওপব একটু ভাল ব্যবহার করছি—তার পাত্র শূন্য হলেই মদ ঢেলে দিচ্ছি ; ওর কোলে বসে ওর তুএকটা চুমুও খাচ্ছি। প্রেম আর মদের নেশা তখন তার মাথায় চড়ে বসেছে—আহা বেচারী নেশায় একেবারে চুর হয়ে পড়েছে—হঠাৎ সে চেয়ার থেকে গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেল—একটা কথাও আর বলতে পারলো না।

সার্কাসের আর সকলে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। সব তাঁবুর আলো নিভে গেছে—চারিদিক নিথর, নিঃশব্দ। শুধু বাইরে ঝুপঝাপ তুষার পড়ছে। আমি পেট্রোম্যাক্সটা নিভিয়ে দরজা খুলে মাতালটার ঠ্যাং ধরে টানতে টানতে বাইরে তুষারের মধ্যে ফেলে দিয়ে এলাম।

পরদিন রাকা গিনেসটাসের শক্ত মৃতদেহ তুলে আনা হল রাস্তা থেকে। সকলেই তার মদ খাবার কথা জানত, কেউই তার মৃত্যু সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করলো না কিম্বা আমাকে কেউ দোষারোপ করল না। এইভাবে আমি প্রতিশোধ নিলাম। এখন আমার বাৎসরিক আয় দাঁড়াল পনের শ ফ্রাঁ। ভাল হয়ে, সৎ হয়ে কি লাভ বলতে পারো ? শত্রুকে ক্ষমা করতে বলেছে বাইবেল, কিন্তু ক্ষমা করে আমার লাভ কি ?"

লুই দ্য আরেন্দেল সবশেষে মন্তব্য করলে, "চলো, এবার ক্যাসিনোতে গিয়ে তু এক পাত্র ককটেল টানি। মনে হয়, জীবনে কোনদিন এত কথা বলিনি।"

## নয়

# প্রেম

এইমাত্র খবরের কাগজে নানা রকম খবরের মধ্যে বেশ একটা নাটকীয় প্রেমের বৃত্তান্ত পড়লুম! লোকটি মেয়েটিকে হত্যা করে, সে নিজেও আত্মহত্যা করেছে; কাজেই লোকটি নিশ্চয়ই মেয়েটিকে ভালবাসত। পুরুষই হোক্ আর নারীই হোক্, তাতে কি যায় আসে? তাদের প্রেমের কথাটাই আমার কাছে আসল কথা। এ ব্যাপারটা যে আমার কৌতূহল উদ্রেক করেছে, তার কারণ এই নয় যে, এতে আমি অভিভূত বা আশ্চর্য হয়েছি কিম্বা এতে আমার হৃদয় গলে গেছে অথবা আমাকে ভাবুক করে তুলেছে। আমার কৌতূহল হবার কারণ এই যে, এই ঘটনা আমাকে আমার শিকার-জীবনের এক অদ্ভুত ঘটনা মনে করিয়ে দিয়েছে—এই ঘটনায় আমি সর্বপ্রথম প্রেমের রূপ উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ করি।

আদিম মানুষের প্রবৃত্তি ও বোধ নিয়ে আমি জন্মেছিলাম। সভ্য মানুষের চিন্তা ও অনুভূতি একে খানিকটা সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করেছিল। শিকার আমার একটি তীব্র নেশা—রক্তাক্ত পশুর দৃশ্য, রক্ত এবং হাতে লাগা রক্ত দেখলে আমার হৃদয়ের স্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে যায়!

সে বছর হেমন্তের শেষে হঠাৎ ভীষণ শীত পড়ল। আমার এক জ্ঞাতিভাই কার্ল দ্য রাভিল্ আমাকে ভোরে জলাভূমিতে হাঁস শিকার করতে যাবার নিমন্ত্রণ করল।

আমার জ্ঞাতি ভাইয়ের বয়স চল্লিশ বছর—তার মাথায় চুল লাল, সে বেশ হৃষ্টপুষ্ট, তার মুখে ঘন দাড়ি খুব। তার বাস গ্রামে, বেশ

অমায়িক কিন্তু লোকটি আধাজন্তু বললেই হয়। লোকটা দিল্‌খুস্‌ প্রকৃতির। তার বাড়ীটা আধা গোলাবাড়ী বলা চলে। একটা উপত্যকার ওপর তার বাড়ী—এই উপত্যকার মধ্য দিয়ে একটা নদী বয়ে গেছে। ডাইনে-বাঁয়ে পাহাড়ের ওপর কেবল জঙ্গল আর জঙ্গল। প্রাচীন কালের জঙ্গল—বিরাট বিরাট গাছ মাথা উঁচু করে রাজ-মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। এই জঙ্গলে নানা রকম পাখী শিকার করা যায়। এখানে মাঝে মাঝে ঈগল পাখীও পাওয়া যায়; তাছাড়া পাওয়া যায়, নানা রকম যাযাবর পাখী। এরা আকাশ-পথে উড়তে উড়তে রাত্রের আশ্রয় হিসাবে এই প্রাচীন জঙ্গলে গাছের ডালে অবস্থান করে। এই উপত্যকায় বড় বড় খোলা মাঠ আছে—মধ্যে খানা-খন্দে জল আছে—মাঝে মাঝে ঝোপ-জঙ্গল আছে—তাছাড়া নদীর পাশে আছে বিরাট এক জলাভূমি। এই জলাভূমির মত সুন্দর শিকারের জায়গা আমি আর কোথাও দেখিনি।

এই জায়গাটা ছিল আমার জ্ঞাতি ভাই-এর তদাবকে। লোকে যেমন যত্ন করে বাগিচা তদারক করে, সেও তেমনি করে এই জলাভূমি রক্ষা করত। এই জলাভূমির নল-খাগড়া রাতদিন প্রাণের হিল্লোলে কাঁপত। এর মধ্য দিয়ে একটা সরু পথ তৈরি করা হয়েছিল। সেই পথ দিয়ে একটা বড় নৌকো যেতে পারতো। বাঁশের লগি ঠেলে এই নৌকো চালিয়ে নিয়ে যেতে হত। নল-খাগড়ার গা ঘেঁষে নিস্তরঙ্গ জলের ওপর দিয়ে যখন নৌকো চালানো হত, তখন নল-খাগড়ার মধ্য থেকে মাছগুলো লাফিয়ে অন্যত্র আশ্রয়ের জন্য ছুটতো। আর বুনো পাখীরা টুপ্‌ করে জলের তলায় ডুব দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতো।

জল আমি বেশ ভালবাসি। সে ভালবাসা যেন নেশার মত আমাকে পেয়ে বসেছে। সমুদ্র যদিও অনন্ত প্রসারিত, অনন্ত গতিশীল, তবুও তাকে যেন কোনমতে ধরে রাখা যায় না। সুন্দর নদী চলছে ত চলছে, ছুটছে ত ছুটছেই! সবার চেয়ে সুন্দর জলাভূমি—

তার রহস্যময় বুকে জলজন্তুদের অজ্ঞাত উপস্থিতি অনন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে নিরন্তর স্পন্দমান। পৃথিবীর বুকে এ জলাভূমি যেন এক সম্পূর্ণ পৃথক জগৎ। এর জীবকূল পৃথক, এখানে স্থায়ী অস্থায়ী দুরকম জীব থাকে। এর কোলাহল, এর ভাষা, এর রহস্য সবই বিচিত্র। এরকম জলাভূমিতে এবকম ভয়ঙ্কর বিপদের আতঙ্ক থাকবে কেন? নল-খাগড়ার মৃদু মর্মর, আলেয়ার চকিত দীপ্তি। রাত্রে এর মৌন নিস্তব্ধতা বা অদ্ভুত কুজ্ঝটি, যখন এব বুকের ওপর মড়ার গায়ে জড়ানো চাদরের মত পাতা থাকে, তখন মনে হয়, এর মধ্যে এক ভয়ঙ্কর অজ্ঞাত রহস্য ওৎ পেতে বসে আছে।

না, আরও কিছু আছে। আর এক রহস্য আরো গভীর, আরো অতলস্পর্শ—এর কুয়াসার ঘন আস্তরণের তলায় ভেসে বেড়ায় আদিম সৃষ্টির রহস্য! এই রকম স্রোতহীন পেঁকো জলে, আর্দ্র স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ায় সৌর তাপের স্পর্শেই নাকি প্রথম জীব-শৈবাল স্পন্দিত হয়েছিল এবং দিবালোকে বিকশিত হয়েছিল।

সন্ধ্যা নাগাদ আমার জ্ঞাতি ভাই-এব বাড়ীতে হাজির হলাম। তখন বরফ জমেছে, শীত এত যেন মনে হয় পাথরও ফেটে যাবে!

নৈশ ভোজের সময়ে বড ঘরটিতে দেখলাম, পাশের আলমারীতে, দেওয়ালে, ছাদ থেকে মরা পাখীর স্টাফ্ করা দেহ ঝোলানো রয়েছে —কারুর ডানা দুটো প্রসারিত, কাউকে বা পেরেক দিয়ে গাছের ডালে আট্‌কানো হয়েছে—কত রকমের পাখী—বাজপাখী, বক, পেঁচা, নাইট্‌জার, বাজার্ড, টিয়ারশেল, শকুন, শিক্‌রেল। শীলের চামড়ার জামা-পরা আমার জ্ঞাতি ভাইটিকে যেন শীতের দেশের এক অদ্ভুত জন্তুর মত মনে হচ্ছিল। ভোজের সময়ে সে সেই রাত্রে শিকারের যে সব তোড়জোড় করেছে, তা আমাকে বলল।

ভোর সাড়ে-তিনটায় আমাদের যাত্রা করতে হবে। তবেই, আমরা সাড়ে-চারটায় আমাদের নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়ে, শিকারের জন্য অপেক্ষা করতে পারবো। সেই জায়গায় বরফের চাঁই সাজিয়ে

একটা কুঁড়েঘর তৈরি করা হয়েছিল—তার মধ্যে থাকলে ভয়ঙ্কর হিমেল হাওয়া থেকে আমরা কথঞ্চিৎ বাঁচতে পারবো। এই হিমেল হাওয়া ভোরের আগে থেকে বইতে থাকে—এ-হাওয়া এত ঠাণ্ডা যে, যেন গায়ে করাতের মত দাঁত বসায়, যেন ধারালো ছুরি দিয়ে মাংস কেটে নেয়, বিষাক্ত হুলের মত যেন গায়ে বেঁধে—সাঁড়াসি দিয়ে যেন মাংস চিমটে ধরে—যেন আগুনের মত শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

আমার জ্ঞাতি ভাই দু হাত ঘসে বললে : এরকম তুষারপাত আমি দেখিনি, এখন সন্ধ্যে ছটা, এর মধ্যেই তাপমান-যন্ত্র শূন্যের নীচে বারো ডিগ্রীতে নেমে এসেছে।

খাওয়াব পব আমি আমার বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। আগুনশালায় গন্‌গনে আগুন জ্বলতে রইল, তার আলোকে ঘব আলোকিত। সেই আলোর মধ্যেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঠিক তিনটেয আমাকে জ্ঞাতি ভাই জাগিয়ে দিল। আমি একটা ভেড়ার চামড়াব পোষাক পরে নিলাম। আমাব জ্ঞাতি ভাই একটা কাল ভালুকেব চামড়াব পোষাক পরল। ফুটন্ত কফি এক কাপ করে খেয়ে, কয়েক বোতল মদ টেনে, আমরা শিকার করবার জন্যে একজন লোক এবং প্লঁজাঁ ও পীরো নামক দুটো কুকুর নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বাইরে বেরুবার পর মুহূর্তেই মনে হল, যেন আমার মজ্জা পর্যন্ত ঠাণ্ডায় জমে গেল। এক একদিন এত ঠাণ্ডা পড়ে যে, পৃথিবী শীতে মরে গেছে বলেই মনে হয়—এই দিনটা ঠিক যেন তেমনি! বাতাস এত ঘন এবং জমাট মনে হয় যেন, তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—তার মধ্য দিয়ে অতি কষ্টে যেতে হয়। বাতাসের ধাক্কায় তা একটুও সরে না—এ যেন নিশ্চল, অনড়। এ ঠাণ্ডা শরীরে দাঁত ফোটায়, হাড়ের মধ্যে এসে বেঁধে—গাছপালা শুকনো করে মেরে ফেলে, পতঙ্গকুল ধ্বংস করে। ছোট ছোট পাখী গাছের ডাল থেকে ঠাণ্ডায় জমে মরে মাটিতে এসে পড়ে এবং ঠাণ্ডায় পাথরের মত শক্ত হয়ে যায়।

চাঁদ তখন শেষ পক্ষে পড়েছে, একদিকে বাঁকা হয়ে ঢলেছে, মনে হয় যেন অনন্ত শূন্যে সে মূর্ছিত হয়ে গেছে—তাকে এত দুর্বল মনে হচ্ছে যে, বিদায় নেবার শক্তি পর্যন্ত যেন তার নেই! তাই আকাশে আটকে রয়েছে, শীতের প্রকোপে যেন তার পক্ষাঘাত হয়েছে। সারা পৃথিবীতে সে শীতার্ত বিষণ্ণ ম্লান একটা আলো পাঠিয়ে দিচ্ছে—অমাবস্যার আগে প্রতি মাসে যেমন হয়ে থাকে।

কার্ল ও আমি পাশাপাশি চলতে লাগলাম—আমাদের বগলের নীচে বন্দুক। যাতে আমরা নদীর উপর দিয়ে চলতে চলতে পিছলে পড়ে না যাই, সেজন্য আমাদের বুটজুতোর তলা পশম দিয়ে জড়ানো ছিল। ফলে পথে চলার সময় কোন শব্দ হচ্ছিল না। কুকুর দুটোর নিঃশ্বাস থেকে শাদা বাষ্প উঠছিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা জলাভূমির ধারে এসে পৌঁছে গেলাম। শুকনো নল-খাগড়ার মধ্য দিয়ে সরু পথ ধরে আমরা নীচু জঙ্গল দিয়ে চলতে লাগলাম। আমাদের কনুই ফিবনের মত পাতার স্পর্শ লাগায় অল্প অল্প শব্দ হচ্ছিল। জলাভূমি আমার মনে যে অদ্ভুত ভাব জাগায়, সেই ভাবের ঘোরে আমি আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। এই জলাভূমি যেন মৃত, ঠাণ্ডায় গতাসু। আমরা এর ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, এর চতুর্দিকে শুকনো খালি নল-খাগড়া আর কিছু নেই।

এই গলি-পথের একটা বাঁকে এসে হঠাৎ আমি সেই বরফের তৈরি কুঁড়ে ঘর দেখতে পেলাম: এই কুঁড়ে ঘরটা আমাদের আশ্রয়ের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। যাযাবর পাখীদের জেগে ওঠার তখনো প্রায় এক ঘণ্টা দেরী ছিল বলে, আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে। কাজেই, আমি তার মধ্যে ঢুকে একটু গরম হবার জন্যে কম্বলে আপাদ-মস্তক মুড়ে নিলাম।

চিৎ হয়ে শুয়ে আমি কিম্ভূতকিমাকার চাঁদটার দিকে তাকালাম—এই মেরুপ্রদেশের মত বরফের ঘরের স্বচ্ছ দেওয়ালের মধ্য দিয়ে মনে হল যেন চাঁদটার চারটে কোণ…।

কিন্তু জলাভূমির কুয়াসা, দেওয়ালের শৈত্য আর আকাশ থেকে ঝরে-পড়া ঠাণ্ডা আমাকে এত ভীষণভাবে বিঁধতে লাগল যে, আমার কাশি এসে গেল।

আমার জ্ঞাতি ভাই কার্ল অধৈর্য ও চঞ্চল হয়ে উঠল। সে বললে, এর ওপর আজ যদি তেমন শিকার না জোটে ত গেছি। ভাই! আমি চাইনি যে তোমার ঠাণ্ডা লাগে—এসো আগুন জ্বালি।

সে শিকার কুড়োনো লোকটাকে কতকগুলো শুকনো নল-খাগড়া কেটে আনতে বললে।

কুঁড়েঘরের মাঝখানে আমরা নল-খাগড়ার একটা ঢিপি করলাম—এই কুঁড়ে ঘরের ওপরে ধোঁয়া বেরুবার জন্য একটা গর্ত রাখা হয়েছিল। আগুনের লাল শিখা যখন সেই দিকে উঠতে লাগল, তখন বরফ গলতে লাগল, বরফের গা বেয়ে যেন ঘাম ঝরছে মনে হল। কার্ল ঘরের বাইরে ছিল। সে আমাকে ডেকে বললে: ওহে, বাইরে এসে একবার দেখো! কুঁড়েঘরের বাইরে গিয়ে আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলাম। আমাদের কুঁড়ে ঘরটা একটা মোচার মাথার মত দেখাচ্ছিল। মনে হতে লাগল, কে যেন একটা অগ্নিগর্ভ বিরাট জ্বলন্ত হীরকের চাঁইকে এনে সহসা এই জলাভূমির জমাট-বাঁধা জলের ওপর বসিয়ে দিয়ে গেছে। সেই হীরকের মধ্যে দুটি অদ্ভুত আকৃতির জীব দেখা যাচ্ছিল—ভিতরে যে কুকুর দুটো আগুন পোহাচ্ছিল, বাইর থেকে তাদেরই ঐ রকম দেখাচ্ছিল।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত কান্না, একটা পথহারা ভ্রাম্যমাণ কান্না, আমাদের মাথার ওপর দিয়ে দূরে ভেসে গেল।

আমাদের আগুনের আভায় আমরা বুনো পাখীদের দেখতে পেলাম। দিনের আলো দিগন্তে দেখা দেবার আগে প্রথমেই যে প্রাণীর চীৎকার শোনা যায় অথচ দেখা যায় না—যে চীৎকার দ্রুত নিস্তব্ধ বাতাসের মধ্য দিয়ে দূর দূরান্তে ভেসে যায়, তা আমাদের যত অভিভূত করে, অন্য কিছু তত করতে পারে না। ভোরের পূর্ব মুহূর্তে

পাখীর পাখায় যে শব্দ বহন করে নিয়ে যায়, তা শুনে আমার মনে হয়, যেন পৃথিবী থেকে চলে যাওয়া কোন আত্মার দীর্ঘ নিঃশ্বাস!

কার্ল বললে: আগুন নিভিয়ে দাও; ভোর হচ্ছে।

আকাশ ক্রমশঃ ফর্সা হতে সুরু করেছে, উড়ন্ত হাঁস, আকাশে দীর্ঘ দ্রুত রেখা এঁকে দিয়ে যাচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে তা যেন আকাশের বুক থেকে মুছে যাচ্ছে।

হঠাৎ একটা আলোর ফোয়ারা রাত্রির মধ্য দিয়ে ছুটে গেল; কার্ল গুলি করেছে, কুকুর দুটো সামনে ছুটে গেল।

তারপরে প্রায় প্রতি মিনিটে কখনো কার্ল, কখনো আমি যেই আকাশে উড়ন্ত হাঁসের দলের ছায়া নল-খাগড়ার ওপর দিয়ে ভেসে যায়, অমনি লক্ষ্য স্থির করে গুলি করি। পীরো আর প্লঁজঁ৷ হাঁফাতে হাঁফাতে মহানন্দে ছুটে রক্তাক্ত পাখীগুলো মুখে করে নিয়ে আসে। তখনো তাদের চোখ যেন আমাদের দিকে নিবদ্ধ।

পরে সূর্য আকাশে ওঠে—উজ্জ্বল দিন; আকাশ নীল—মেঘশূন্য। আমরা যখন বিদায় নেবার কথা ভাবছি, এমন সময় একজোড়া পাখী ডানা মেলে গলা বাড়িয়ে আমাদের মাথার উপুর দ্রুত ভেসে এলো। আমি গুলি করলাম। একটা পাখী প্রায় আমার পায়ের কাছে এসে পড়ল। পাখীটা সরাল, বুকটা তার রূপোর মত সাদা। তারপর আমার মাথার ওপরে নীল আকাশে একটা পাখীর স্বর শোনা গেল। এ স্বর অল্পকালস্থায়ী, পুনরাবৃত্ত কিন্তু হৃদয়-বিদারক ও ব্যথাতুর; যে ক্ষুদ্র পাখীটাকে গুলি করা হয়নি তারই কান্না! সে আমাদের মাথার ওপর চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল। আমার হাতে তার সঙ্গীটি ছিল, সে যেন তাকে দেখেই এমনি করতে লাগল! বন্দুক কাঁধে করে হাঁটু গেড়ে বসে কার্ল পাখীটিকে উদ্গ্রীব ভাবে লক্ষ্য করছিল, কখন সে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসবে। সে বললে: তুমি মেয়ে-পাখীটিকে মেরেছ, কাজে কাজেই পুরুষটা উড়ে পালাবে না।

সত্যিই সে উড়ে গেল না! সে অনবরত আমাদের মাথার ওপর ঘুরতে লাগল, আর চীৎকার করতে লাগল। এর আগে বা পরে, কখনও কোনদিন কোন কাতরোক্তি আমাকে এমন অভিভূত করেনি! সেদিনকার সেই হতাশ আবেদন, সেই হতভাগ্য পাখীর বেদনার্ত ভর্ৎসনা যেন মহাশূন্যে ব্যর্থতায় বিলীন হয়ে যেতে লাগল।

বন্দুকের ভয়ে মাঝে মাঝে সে উড়ে পালাচ্ছিল। কিন্তু বন্দুকের লক্ষ্য তার দিকেই থাকায় সে নিঃসঙ্গ যাত্রার উদ্যোগ করেও আবার যেন সঙ্গিনীকে দেখবার জন্য তার কাছে ফিরে আসছিল—কিছুতেই মনস্থির করতে পারছিল না।

কার্ল আমাকে বল্লে: মরা পাখীটাকে মাটিতে ফেলে রাখ, শীঘ্রই ও বন্দুকের পাল্লায় মধ্যে এসে যাবে।

সত্যি সত্যিই সে তার সঙ্গিনীর কাছে এলো। বিপদে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, প্রাণীসুলভ প্রেমের মাদকতায় উন্মাদ হয়ে, সে তার সঙ্গিনীর কাছে এলো—সঙ্গিনীর প্রতি ভালবাসা তাকে টেনে আনল।

কার্ল গুলি করলে। যেন মনে হল, পাখীটাকে যে সূতো দিয়ে ঝোলান ছিল, সেটা হঠাৎ কেউ কেটে দিয়েছে। আমি দেখলাম, কালো মত কী একটা নেমে এল—নল-খাগড়ার মধ্যে কি একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ হল।

পীরো ছুটে গিয়ে পাখীটা আমার কাছে এনে দিল।

আমরা তাদের দুজনকে সেই থলিতে ভরে নিলাম। ইতিমধ্যেই তারা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল।

সেই দিনই সন্ধ্যায় আমি প্যারী ফিরে এলাম।

---

## দশ

# একটি ছাতার জন্য

মাদ্‌মোজেল অরিয়েল ছিলেন অত্যন্ত হিসেবী ; আধ পয়সার দাম যে কত, তা তিনি হাড়ে হাড়ে জানতেন। এজন্যেই কি করে টাকা বাড়ানো যায়, সে সম্বন্ধে তাঁর কতকগুলো বাঁধা নিয়ম ছিল। কাজেই বাজার থেকে এক আধ পয়সা চুরি করতে তার রাঁধুনীকে রীতিমত কষ্ট করতে হত। তাছাড়া, তিনি তাঁর স্বামীকে হাতখরচা বাবদ প্রায় কিছুই দিতেন না। সে যা হোক্ না কেন, তাঁরা কিন্তু বেশ সচ্ছলভাবেই সংসার চালাচ্ছিলেন। তাঁদের কোন ছেলেপুলে ছিল না। কিন্তু কোন টাকা খরচ হয়ে গেলে, সত্যিসত্যি মাদ্‌মোজেল অরিয়েল ভারী কষ্ট পেতেন। তাঁর পকেট থেকে যখন টাকা বার করতে হত, তখন তাঁর মনে হত—কেউ যেন তাঁর হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে বার করছে। যত দরকারেই হোক্ না কেন—যেদিন তাঁকে কিছু খরচ করতে হত—সেদিনই রাত্রে তাঁর ভাল করে ঘুম হত না।

অরিয়েল অনবরত তাঁর স্ত্রীকে প্রায়ই বলতেন : তুমি আর একটু খরচে হতে পারো, আমাদের যখন ছেলেপুলে নেই, আর আমাদের সব রোজগারই যখন আমরা খরচ করে ফেলছি না, তখন এতে আর এমন কি খারাপ হবে !

অরিয়েল-গিন্নী অভ্যাসমত একই উত্তর দিতেন : কখন কি ঘটে বলা ত যায় না ! খুব কম থাকার চেয়ে, খুব বেশী থাকা ভাল।

অরিয়েল-গিন্নী ছিলেন বেঁটে-খাটো, বয়স প্রায় চল্লিশ-ঘেঁষা—খুব চট্‌পটে ও কর্মঠ ; তবে একটু তড়্‌বড়ে ; গায়ের চামড়া কোঁচ্‌কানো, খুব ছিম্‌ছাম্‌, ফিট্‌ফাট্‌ আর ভারী বদ্‌রাগী।

তাঁর স্বামী প্রায়ই ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ করতেন। এত কষ্ট করে তাঁকে থাকতে হয়—এসব কেবল তাঁর স্ত্রীর জন্যে। এর মধ্যে কতক কষ্ট সহ্য

করা তাঁর পক্ষে খুব বেদনাদায়ক ছিল—তাতে তাঁর আত্ম-সম্মানেও বাধতো।

ওয়ার অফিসে তিনি উর্ধ্বতনস্তরের কেরানী ছিলেন, এ চাকরী কেবল তাঁর স্ত্রীর ইচ্ছা পূরণের জন্য তিনি বজায় রেখেছিলেন। এতে তাঁদের আয় বাড়বে, জমান টাকা সব খরচ হয়ে যাবে না—শুধু এই জন্যে।

দু বছর ধরে তিনি সেই করেকার পুরোনো তালিমারা ছাতা নিয়ে অফিসে আসছিলেন—এতে তাঁর সহকর্মীরা ভারী আমোদ পেতেন। শেষে তাদের ঠাট্টায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে তিনি তাঁর স্ত্রীকে একটা নতুন ছাতা কিনে দেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী সাড়ে-আট টাকা দিয়ে একটা ছাতা কিনে আনলেন—বড় বড় ছাতার দোকান বিজ্ঞাপনের জন্যে যে সব ছাতা সস্তায় বেচে, এ সেই ছাতা। অফিসের সবাই ছাতাটা দেখে ঠিক ধরলে, এ সেই গুদাম সাবাড়ের ছাতা, যা তখন প্যারিসে হাজার হাজার বিক্রী হচ্ছিল। তাদের ঠাট্টা-তামাসা নতুন করে আবার শুরু হল। অরিয়েল তাদের সঙ্গে আঁটতে না পেরে, খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। এই ছাতা নিয়ে, তারা একটা ছড়া বানিয়ে ফেললে এবং সকাল থেকে সন্ধ্যে সারা অফিস বাড়ীতে অরিয়েলকে সেই ছড়া শুনতে হত।

অরিয়েল ভীষণ চটে গেলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বেশ হুকুমের সুরে তাঁর জন্যে একটা নতুন ছাতা কিনে দিতে বললেন—বেশি দাম দিয়ে বেশ ভাল একটা সিল্কের ছাতা, আর বিলটা তাঁকে দেখাতে বলে দিলেন, তিনি দেখবেন ঠিকমত সব হয়েছে কিনা!

মাদ্‌মোজেল অরিয়েল আঠারো টাকা দিয়ে একটা ছাতা কিনে আনলেন। ছাতাটা তাঁর স্বামীকে দেবার সময়ে রাগে লাল হয়ে বললেন : এটা অন্ততঃ যেন পাঁচ বছর চলে, মনে থাকবে ত!

অরিয়েল বিজয় গর্বে ফুলে উঠলেন। এটা নিয়ে অফিসে যেতে সকলেই তাঁকে অভিনন্দিত করল।

সন্ধ্যায় যখন তিনি বাড়ি ফিরলেন, তখন তাঁর স্ত্রী ছাতাটা দেখে অস্বস্তিভরা স্বরে বললেন : এইভাবে এলাস্টিক দিয়ে বেঁধে রেখো না। এতে সিল্ক কেটে যেতে পারে। ছাতার যত্ন নেবে। হঠাৎ আর তোমাকে নতুন ছাতা কিনে দিচ্ছি না।

ছাতাটা নিয়ে এলাস্টিক খুলে মাদ্‌মোজেল অরিয়েল রাগে বিস্ময়ে একেবারে বাক্যহারা হয়ে গেলেন—ছাতার মাঝখানে ঠিক একটা পয়সার সমান গর্ত হয়ে গেছে—চুরুটের আগুনে এই গর্ত হয়েছে।

তিনি ভীষণ চীৎকার করে উঠলেন : এ কি ?

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে শান্তভাবে অরিয়েল বললেন : এ কী ? এর মানে কী !

মদ্‌মোজেল রাগে কথা বলতে পারছেন না ; কথা যেন তাঁর মুখ দিয়ে ফুটছে না। তুমি—তুমি—তোমার ছাতা—পুড়িয়েছ ! নিশ্চয়ই তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এইভাবে কি একেবারে তুমি ধ্বংস হতে চাও ?

অরিয়েল ফিরে তাকালেন। মনে হল, যেন তাঁর মুখে রক্ত নেই। তুমি কিসের কথা বলছ ?

: আমি বলছি যে, তুমি তোমার ছাতা পুড়িয়ে এনেছ। এই ত একবার নিজেই দেখো।

এই বলে তিনি তাঁর স্বামীর দিকে দৌড়ে গেলেন—তিনি রেগে গেছেন এমনি। ভাবটা তিনি যেন তাঁর স্বামীকে মারবেন। তিনি ছাতার সেই পোড়া গর্তটা একেবারে অরিয়েলের চোখের কাছে এনে ধরলেন।

এ-দেখে অরিয়েলের যেন বাক্যস্ফূর্তি হয় না। তিনি তোত্‌লাতে থাকেন : কি—কি—একি···আমি কি করে জানবো ? আমি কিছু করিনি, আমি দিব্যি করে বলছি ! ছাতা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।

: তুমি নিশ্চয়ই অফিসে গিয়ে ছাতা নিয়ে কসরৎ দেখাচ্ছিলে ? বোকার মত ছাতাটা খুলে সকলকে জাঁক করে দেখাচ্ছিলে ?

আমি একবারমাত্র ছাতাটা খুলেছিলাম—ওদের দেখাচ্ছিলাম। ওদের দেখাচ্ছিলাম ছাতাটা কী সুন্দর—আমি আর কিছু করিনি—

মাদ্‌মোজেল অরিয়েল রাগে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগলেন! তারপরেই সুরু হল দাম্পত্য কলহ। শান্তিপ্রিয় লোক এ জন্য সংসারকে যুদ্ধক্ষেত্রের মত ডরায়।

পুরোনো ছাতা থেকে সিল্ক কেটে মাদ্‌মোজেল অরিয়েল্‌ ছাতাটা মেরামত করে দিলেন কিন্তু তার রং হল অন্য রকম। পরদিন মেরামত করা ছাতাটি হাতে নিয়ে অরিয়েল বিনীতভাবে অফিসে গেলেন। তিনি সেটা একটা আলমারীর মধ্যে রেখে, সে সম্বন্ধে আর কোন খেয়ালই রাখলেন না। কেননা, কোন অপ্রিয় স্মৃতি যতক্ষণ ভুলে থাকা যায়, ততক্ষণই ভাল।

কিন্তু সেদিন বাড়ি ফেরামাত্র তাঁর স্ত্রী তাঁর কাছ থেকে ছাতাটা নিয়ে, সেটা খুলে ব্যাপার দেখে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন আর কি। কিন্তু এবার যা সর্বনাশ হয়েছে, তা আর মেরামত করা সম্ভব নয়। ছাতাময় ছোট ছোট গর্ত, কেউ তার ওপর তামাক খাবার পাইপের আগুনশুদ্ধ ছাই ঝাড়লে, যে অবস্থা হয়, তাই হয়েছে। ছাতার দফা যাকে বলে ইতি—আর মেরামত করা চলবে না।

সে দিকে তাকিয়ে অরিয়েল-গিন্নীর মুখ দিয়ে কথা ফোটে না। অরিয়েলও ক্ষতি দেখে একেবারে মূক হয়ে গেলেন—আতঙ্ক আর ভয় তাঁকে অভিভূত করে ফেললে।

অরিয়েল একবার তাঁর গিন্নীর দিকে তাকালেন আর অরিয়েলের গিন্নীও তাকালেন অরিয়েলের দিকে। তারপর অরিয়েল মুখ নীচু করে মেঝের দিকে তাকালেন। তারপর অরিয়েল-গিন্নী ছাতাটা অরিয়েলের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে, রেগে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন!

জানোয়ার! জানোয়ার! এ তুমি ইচ্ছে করেই করেছ—কিন্তু এর শোধ আমি তুল্‌ব। তোমাকে আর ছাতা কিনে দেওয়া হবে না।

তারপরই আবার অভিনয় সুরু হল—একঘণ্টা ধরে শ্রীমতী অরিয়েল ঝড় তুললেন—অরিয়েল কি কৈফিয়ৎ দেবেন? তিনি কিছুতেই ব্যাপারটা কিভাবে ঘটেছে—তা বলতে পারেন না—শেষে বললেন, হয় কেউ হিংসে করে কিম্বা প্রতিশোধ নেবার জন্যে এ কাজ করে থাকবে।

এই সময়ে হঠাৎ দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠতে তাঁরা বেঁচে গেলেন। একজন বন্ধুকে তাঁরা নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং সে জন্যে অপেক্ষা করছিলেন; তিনি এসে গেছেন।

মাদ্‌মোজেল অরিয়েল সমস্ত ব্যাপার তাঁর কাছে খুলে বললেন। নতুন ছাতা কেনার কথাই ওঠে না—স্বামীকে আর তিনি ছাতা কিনে দেবেন না।

বন্ধু বিবেচক, বললেন: তাহলে ত' ওঁরই পোষাক নষ্ট হয়ে যাবে—আর পোষাকের দাম নিশ্চয়ই ছাতার দামের চেয়ে অনেক বেশী।

অরিয়েল-গিন্নীর রাগ তখনো কমেনি। তিনি বললেন: বেশ! তা হলে বৃষ্টির দিন উনি রান্নাঘরের ছাতাটা নিয়ে যাবেন—আর আমি ওঁকে নতুন সিল্কের ছাতা দিচ্ছি না।

অরিয়েল একথা শুনে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। বললেন: বেশ, তাহলে চাকরি ছেড়ে দেব। রান্নাঘরের ছাতা নিয়ে আমি অফিস যেতে পারবো না।

বন্ধু এই অবস্থায় মধ্যস্থতা করে বললেন: এই ছাতাটার কাপড় বদলে নিন—বেশী খরচ পড়বে না।

কিন্তু শ্রীমতী আরিয়েল তখনও রীতিমত রেগে আছেন। কাজেই শ্রীমতী বললেন: কাপড় বদ্‌লাতে অন্ততপক্ষে আট টাকা খরচ পড়ে যাবে। গেছে আঠারো—তার ওপর যাবে আরও আট, একুনে ছাব্বিশ। একবার ভেবে দেখুন ত! একটা ছাতার জন্যে ছাব্বিশ টাকা খরচ! এ-কী পাগলামী নয়!

বন্ধুটি গরীব—মধ্যবিত্ত ঘরের লোক—হঠাৎ তাঁর বুদ্ধি এসে গেল ঃ আপনাদের অগ্নি-বীমা কোম্পানীর কাছে এ টাকা আদায় করুন না। যা কিছু পুড়ুক না কেন, কোম্পানী তার দাম দেয়—অবশ্য যদি দুর্ঘটনাটা আপনার বাড়ীতে ঘটে।

একথা শুনে আরিয়েল-গিন্নী বেশ খানিকটা শান্ত হলেন।

তারপর একটু ভেবে নিয়ে তিনি তাঁর স্বামীকে বললেন ঃ কাল অফিসে যাবার আগে মেটারনেল্ বীমা কোম্পানীতে যাবে—সেখানে তোমার ছাতার অবস্থা দেখাবে—আর তাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করবে।

এ প্রস্তাবে আরিয়েল যেন লাফিয়ে উঠলেন। তিনি বললেন ঃ না—না। প্রাণ থাকতে আমি ও কাজ করতে পারবো না! আঠারো টাকা গেছে যাক্। এতে আমার কিছু এসে যাবে না!

এর পরদিন আরিয়েল ছাতার বদলে একটা ছাড়ি নিয়ে অফিস গেলেন। তাঁর ভাগ্য ভাল ছিল, সে দিন বৃষ্টি হল না।

বাড়ীতে একলা বসে, আঠারো টাকার ক্ষতির কথাটা যেন শ্রীমতী আরিয়েল কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলেন না। তিনি খাবার-ঘরের টেবিলে ছাতাটা রেখেছিলেন। তিনি কি যে করবেন, তা ঠিক করে ওঠবার আগে বার বার সেটা দেখতে লাগলেন।

প্রত্যেক বারেই বীমা কোম্পানীর কথা তাঁর মনে হতে লাগল। কিন্তু সেখানে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে তাকে দেখা করতে হবে, তাঁর সপ্রশ্ন দৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে যেন তাঁর ভরসা কুলোচ্ছিল না। তিনি লোকজনের সামনে ভড়কে যেতেন, অকারণেই লাল হয়ে যেতেন, আর অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলতে তিনি বিব্রত বোধ করতেন।

কিন্তু এই আঠার টাকার ক্ষতির দুঃখ তাঁকে বড় বেদনা দিতে লাগল—তাঁকে যেন কে ছুরি মেরেছে। তিনি একথা ভোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু মনে পড়ামাত্র তাঁর মনে বড় কষ্ট হতে

লাগ্‌ল। তবে, তিনি কি করবেন? সময় চলে যাচ্ছে কিন্তু কি যে করবেন তা যেন তিনি ঠিক করে উঠতে পারছেন না। অবশেষে মুখচোরা ভীরু লোকদের মত হঠাৎ তিনি কৃতসঙ্কল্প হয়ে উঠলেন:

আমি যাবই; কি হয় একবার দেখতেই হবে!

কিন্তু প্রথমে তাঁকে ছাতাটাকে তৈরী করে নিতে হবে—ক্ষতিটা পুরোপুরি দেখান চাই তাদের! তাছাড়া, কিসে যে ছাতাটা পুড়েছে, সেটাও তাদের দেখান চাই। কুলুঙ্গী থেকে তিনি একটা দেশলাই বার করে, ছাতার খাঁজে আগুন দিয়ে, হাতের চেটো গলে, এমনি একটা ফুটো তিনি তৈরী করে নিলেন। তারপর সুন্দর করে ছাতাটা পাকিয়ে, এলাষ্টিক ব্যাণ্ড দিয়ে ছাতাটা আটকে মাথায় বনেট্‌ এঁটে শাল চড়িয়ে তাড়াতাড়ি রূদ্য রিভোলিতে বীমা কোম্পানীর অফিসের দিকে চললেন।

কিন্তু অফিসের যত কাছে তিনি আসেন, ততই তাঁর গতি শ্লথ হয়ে আসে। তিনি কি বলবেন? কি উত্তর পাবেন?

তিনি বাড়ীর নম্বর লক্ষ্য করতে লাগলেন; তখনও মোটে ২৮ নং। ভালই হ'ল, এখনও তিনি মনস্থির করতে সময় পাবেন—তাঁর গতি যেন আরো কমে আসতে থাকে। হঠাৎ তিনি দেখলেন একটা দরজায় পেতলের প্লেটে "লা মেটারনেল্‌ বীমা কোম্পানী" খোদাই করা রয়েছে। এরি মধ্যে এসে গেলেন! তিনি একটু অপেক্ষা করলেন—তিনি যেন ভড়কে গেছেন! তাঁর লজ্জা করতে লাগল। বাড়ীটা ছাড়িয়ে চলে গেলেন কিছু দূর, কিন্তু আবার ফিরে এলেন।

শেষটা আপন মনেই বললেন: যা হোক্‌! ভিতরে ত যাই! যখন কাজটা করতেই হবে, তখন আর বিলম্বের প্রয়োজন কি?

ঢোকবার সময় তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে, তাঁর বুক রীতিমত ধড়ফড় করতে সুরু করেছে।

একটা প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে ঢুকে, তিনি দেখলেন চারিদিকে গরাদে দেওয়া ছোট ছোট কাউণ্টার—প্রত্যেক কাউণ্টারের ভেতরে একজন

করে কর্মচারী বসে আছে। একতাড়া কাগজপত্র নিয়ে, একজন ভদ্রলোক তাঁর পাশ দিয়ে গট্ গট্ করে চলে গেলেন—তাঁকে থামিয়ে শ্রীমতী অরিয়েল ভয়ে ভয়ে বললেন: মাফ করবেন মঁসিয়ে, দৈবাৎ কোন কিছু পুড়ে গেলে কোথায় তার ক্ষতিপূরণের জন্যে আবেদন করতে হয়, বলে দেবেন কি ?

চাঁচা গলায় সে ভদ্রলোকটি বললেন: বাঁদিকে প্রথম দরজায়; আপনি যে ডিপার্টমেণ্ট খুঁজছেন ঐটা ওখানেই।

এতে তাঁর আবও ভয় হয়ে গেল—মনে হল এখনি দৌড়ে পালাবেন—আর দাবী করে কাজ নেই—আঠারো টাকা যায় যাক্। কিন্তু টাকার কথা মনে হতেই আবার তাঁর সাহস ফিরে এলো—তিনি ওপরে উঠে গেলেন—সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তাঁর এত হাঁফ ধরছিল যে, প্রায় প্রতি ধাপেই তিনি একটু করে থামছিলেন।

প্রথমেই একটা দরজা দেখে তিনি থামলেন এবং দরজায় টোকা দিলেন। উত্তরে পরিষ্কাব কণ্ঠেব আওয়াজ এল: ভেতরে আসুন।

যন্ত্র-চালিতের মত তিনি আদেশ পালন করলেন—ঘরটা বেশ বড। সেখানে গম্ভীর প্রকৃতির তিনজন ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁরা দাঁড়িয়ে কি কথাবার্তা কইছিলেন। প্রত্যেকেব জামার বোতামে ফুল গোঁজা।

তাঁদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন: হ্যাঁ বলুন, আপনাব কি চাই ?

তাঁর মুখে যেন কথা জোগায় না! তিনি তোত্‌লাতে লাগলেন: আমি এসেছি—একটা—এই দুর্ঘটনার জন্যে—আমি এসেছি—কিছু—।

ভদ্রলোক তাঁকে একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন: ওখানে দয়া করে একটু বসুন, আমি এখনিই আপনার কথা শুনছি—।

এই বলে তিনি অপর দুজন ভদ্রলোকের দিকে ফিরে তাঁদের আলোচনায় আবার যোগ দিলেন।

ঃ বুঝলেন, চার লাখ টাকার বেশী দিতে কোম্পানী বাধ্য নয়—আপনারা যে আরও এক লাখ টাকা দাবী করেছেন, ওবিষয়ে আমরা কিছুই করতে পারবো না। তাছাড়া সার্ভেয়ার যা মূল্য ঠিক করে দিয়েছেন—

অপর দুজন ভদ্রলোকের এক জন তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন ঃ মঁশিয়ে, ঐ পর্যন্তই যথেষ্ট। আইন-আদালতের দ্বারা বাকীটা ঠিক করা যাবে. এখন আমাদের বিদায় দিন।

এই বলে তাঁরা পরস্পরকে অভিবাদন করে চলে গেলেন।

যদি শ্রীমতী অবিয়েলও ওদের সঙ্গে সরে পড়তে পারতেন, তা হলে তিনি কি শান্তিই না পেতেন—তা হলে তিনি সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ছুটে পালাতেন। কিন্তু এখন ত আর তা সম্ভব নয়।

সে ভদ্রলোক ফিরে এলেন আর নমস্কার করে বললেন ঃ হ্যা, বলুন, আপনার জন্যে কি করতে হবে ?

শ্রীমতী অবিয়েলের মুখে আর কথা ফোটে না।—শেষটা কোন রকমে বললেন ঃ আমি এ জন্যে এসেছি। এই বলে ছাতাটা দেখালেন।

ম্যানেজার নিবাক বিস্ময়ে জিনিষটার দিকে তাকালেন।

কাঁপা হাতে এলাস্টিক খুলতে চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হলেন এবং তাড়াতাড়ি ছাতার অবশিষ্ট অংশ খুলে দেখালেন।

ভদ্রলোকের মনে দয়া হল, বললেন ঃ এর অবস্থা ত দেখছি খুব কাহিল !

একটু ইতস্ততঃ করে তিনি বললেন ঃ এর জন্য আমাকে কুড়ি টাকা ব্যয় করতে হয়েছে।

ভদ্রলোক যেন রীতিমত বিস্মিত হলেন ঃ তাই নাকি ? অত ?

ঃ হাঁ, চমৎকার জিনিষ ছিল মশাই। এর অবস্থা আপনাকে দেখাতে চেয়েছিলাম।

বেশ ত, আমি দেখলাম। কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা—এ ব্যাপারে আমার কি করবার আছে ?

শ্রীমতী অরিয়েল বেশ খানিকটা অস্বস্তি বোধ করলেন; তাঁর মনে হল, বোধহয় এঁরা এরকম ছোটখাট জিনিষের ক্ষতিপূরণ দেন না। তিনি বললেন: কিন্তু এটা ত পুড়ে গেছে!

সে কথা তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না।

সে ত আমি ভালভাবেই দেখতে পাচ্ছি!

শ্রীমতী অবিয়েল হাঁ হয়ে গেলেন: এবার কি বলবেন, তা যেন তিনি ঠিক করতে পারলেন না! তারপর হঠাৎ তাঁর মনে হল যে, আসল কথাটাই বলতে তিনি ভুলে গেছেন। তিনি বললেন: আমি হচ্ছি মাদ্‌মোজেল্‌ অরিয়েল। আমবা আপনাদের এখানে বীমা করেছি— লা মেটার্নেলে। এই ক্ষতির টাকা দাবী করতেই আমি এসেছি।...

: আমি শুধু চাইছি যে আপনারা এটার কাপড়টা পালটে দিন।

পাছে কোম্পানী আর কিছু দিতে অস্বীকার করে, সেজন্য তিনি এই কথা কটা যোগ করে দিলেন।

ম্যানেজার বিব্রত বোধ করলেন; বললেন: কিন্তু সত্যি বলছি, আমাদের ছাতার ব্যবসা নেই, আমরা ছাতা বিক্রী করিনা; এবকম ছাতা মেরামতের কাজ আমরা নিতে পারি না।

এতক্ষণে যেন অরিয়েল-গিন্নীর সাহস বাড়তে লাগল। বিনা চেষ্টায় হাল ছাড়বার পাত্র তিনি নন। তাঁর আর মোটেই ভয় নেই। তিনি বললেন: আমি চাইছি আপনারা এর মেরামতের খরচ দিন; তা হলে, আমি অনায়াসে নিজেই ছাতাটা মেরামত করিয়ে নিতে পারবো।

ভদ্রলোক যেন ভড়কে গেলেন।

: সত্যি মিসেস, এসব খুব তুচ্ছ ব্যাপার; এরকম সামান্য ক্ষতির জন্য আমাদের কাছে কোনদিন কেউ ক্ষতিপূরণ দাবী করেন না। আপনাকেও স্বীকার করতে হবে যে, আমরা পকেট-রুমাল, দস্তানা, ঝাঁটা, চটিজুতো ইত্যাদি ছোটখাট যে সব জিনিস প্রত্যহ আগুনে পোড়বার সম্ভাবনা, তা তৈরী করতে পারি না!

শ্রীমতী অরিয়েল রাগে লাল হয়ে উঠলেন, মনে হল যেন তিনি এখনি রাগে ফেটে পড়বেন :

কিন্তু ম'শিয়ে, গত ডিসেম্বর মাসে আমাদের একটি চিমনীতে আগুন ধরে যায়, তাতে আমাদের অন্তুতঃ পাঁচ শ টাকা ক্ষতি হয়েছিল! ম'শিয়ে অরিয়েল কোম্পানীর কাছে কোন কিছু দাবী করেননি; কাজেই ন্যায় ও ধর্মের দিক থেকে এখন এই ছাতার ক্ষতিপূরণ দেওয়া আপনাদের উচিত।

ম্যানেজার বেশ বুঝতে পারলেন যে, শ্রীমতী অরিয়েল ডাহা মিথ্যে কথা বলছেন। তিনি মৃদু হেসে বললেন :

"মহাশয়া, একথা আপনিও নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, এটা সত্যিই একটা বড় তাজ্জব ব্যাপাব। অরিয়েল পাঁচ শ টাকাব দাবী ছেড়ে দিয়ে, এখন সামান্য একটা ছাতা মেরামতেব জন্য মাত্র পাঁচ ছ টাকা দাবী নিয়ে কেন এত লড়ালড়ি কববেন।

এতে কিন্তু মিসেস অবিয়েল একেবাবে দমলেন না : মাফ করবেন ম'শিয়ে, ঐ পাঁচ শ টাকা গেছে ম'সিয়ে অবিয়েলের পকেট থেকে, আর এই আঠারো টাকা যাচ্ছে আমাব পকেট্ থেকে,—কাজেই দুটো ব্যাপার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ভদ্রলোক দেখলেন, শ্রীমতী অরিয়েলের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া কঠিন। তিনি ভাবলেন এ চেষ্টায় বাজে সময নষ্ট করে কিছু হবে না। তিনি মন স্থির করে বললেন : আচ্ছা, এবাব দয়া করে বলুন ত ব্যাপারটা কি কবে ঘট্‌লো!

অবিয়েল-গিন্নীব মনে হল যে, যুদ্ধে তাঁর জয় হয়েছে। তিনি বললেন : কিভাবে হল জানেন ম'সিয়ে? আমাদের হলঘরে একটা ব্রোঞ্জের স্ট্যাণ্ডে ছাতা-ছড়ি থাকে। সেদিন বাড়ী ফিরে আমি ছাতাটা তাতে রেখেছিলাম। এই স্ট্যাণ্ডের ওপরেই বাতি আর দেশলাই রাখবার সেল্‌ফ্। আমি হাত বাড়িয়ে তিন চারটে দেশলাই কাঠি নিয়ে দেশলাই জ্বালাতে গেলাম। কিন্তু প্রথম

কাঠিটা জ্বলল না, কাজেই আরেকটা কাঠি জ্বাললাম, সেটা জ্বলল কিন্তু তখুনি নিভে গেল। তৃতীয় কাঠিটার বেলায়ও ঠিক ঐ রকম হল।

ঠাট্টা করে ম্যানেজার বাধা দিলেন: বোধহয় সেগুলো স্বদেশী দেশলাই ?

তাঁর রসিকতা শ্রীমতী অরিয়েল বুঝতে না পেরে বলে চললেন: সম্ভবতঃ। সে যাই হোক, চতুর্থ কাঠিটা ধরল; অমি বাতি জ্বেলে ঘরের মধ্যে এলাম শুতে। কিন্তু মিনিট পনেরোর মধ্যে মনে হল যেন একটা পোড়া-পোড়া গন্ধ আসছে। আগুনের ভয়টা আমার বরাবরের। যদি বাড়ীতে কোনদিন আগুন লাগে, জানবেন, আমার দোষে লাগবে না! আগেই বলেছি, আমাদের বাড়ীতে চিমনিতে আগুন লেগেছিল। সেই থেকে আমি একটু ভীতু হয়ে গেছি—কাজেই আমি উঠলাম, সব জায়গায় খুঁজতে লাগলাম—বাড়ীর সর্বত্র গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়াতে লাগলাম—শেষে লক্ষ্য করলাম, আমাব ছাতা পুড়ছে। খুব সম্ভবতঃ একটা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ছাতার খাঁজে পড়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কি ভাবে যে এটা পুড়েছে, আপনি নিজেই দেখতে পারেন।

ম্যানেজার সমস্যা-সমাধানের উপায় ঠিক করে ফেললেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার হিসাবে ক্ষতির পরিমাণ আন্দাজ কত হবে বলুন তো ?

শ্রীমতী অরিয়েল কি যে বলবেন ঠিক করে উঠতে পারলেন না। শেষে তিনি বললেন: তার চেয়ে আপনি নিজেই সারিয়ে দিন, আমি আপনার হাতে সব ছেড়ে দিচ্ছি।

এতে ম্যানেজার রাজী নন। বললেন: না, মহাশয়া, সে আমি করতে পারবো না। আপনি কত টাকা দাবী করেছেন বলুন, আমি সেইটাই জানতে চাই।

: বেশ! আমার মনে হয়—দেখুন ম'সিয়ে, আমি এর থেকে লাভ করতে চাই না—আমি যা করতে চাই, বলছি—আমি ছাতাটা

মেরামতের দোকানে নিয়ে গিয়ে ভাল, টেঁকসই সিল্ক দিয়ে ছেয়ে এনে বিল্‌টা আপনাকে পাঠিয়ে দেব! তাহলেই ত আপনার সুবিধে হবে, কি বলেন?

ঃ খুব ভাল হয়, তা হলে। তবে তাই হোক্‌। এই আমি কেশিয়ারকে লিখে দিলুম; এইটা নিয়ে যান, আপনার যা খরচ হবে, কেশিয়ার আপনাকে দিয়ে দেবে।

তিনি মাদ্‌মোজেল অরিয়েলকে একটা স্লিপ্‌ দিলেন। মাদ্‌মোজেল সেটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ম্যানেজারকে ধন্যবাদ দেবার সময় পর্যন্ত নষ্ট করলেন না—পাছে ম্যানেজার আবার মত বদ্‌লায়।

রাস্তা দিয়ে হন্‌হন্‌ করে চললেন অরিয়েল-গিন্নী—ভাল ছাতা মেরামতের দোকান খুঁজতে খুঁজতে চললেন। ভাল একটা দোকানে এসে তিনি তার মধ্যে ঢুকে বললেন ঃ

ঃ এই ছাতাটা সিল্ক দিয়ে ছেয়ে দিতে হবে, ভাল সিল্ক চাই কিন্তু। দোকানে সবচেয়ে ভাল, সবচেয়ে টেঁকসই যে সিল্ক আছে, তাই দেবেন। যা দাম পড়ে পড়ুক গে!

———

## এগার

# একটি সুতোর কাহিনী

সেদিন হাটবাব, গদারভিলের চাবদিকের রাস্তা দিয়ে চাষী ও চাষী-বৌরা দলে দলে সহরের দিকে আসছিল। পুরুষবা সহজভাবে হেঁটে আস্‌ছে—প্রত্যেক পদক্ষেপে শরীরটা আগিয়ে দিয়ে দিয়ে। তাদেব পা দীর্ঘ কিন্তু বাঁকা—গাঁয়ের কষ্টসাধ্য কাজ কবে করে পা কদাকার হয়ে গেছে—লাঙলের মুঠি ধরে ঝুঁকে কাজ করাব জন্যে তাদের বাঁ কাঁধগুলো বেশী উঁচু আর শরীরটা বাঁকানো। তাছাড়া, ধানকাটার সময় হাঁটু দুটো বেশী ফাঁক করে দাঁড়াতে হয় বলে, তাদের শরীর বাঁকা। তাদের গায়ে মাড় দেওয়া খড়খড়ে নীল জামা, বার্ণিশ করার মত চক্‌চক্ করছে—কলাবের কাছে আর হাতের কাছে তালি মারার জন্য চিত্র-বিচিত্র শাদা সুতোর সেলাই-এব বড় বড় ফোঁড় দেখা যাচ্ছে—হাওয়ায় তাদের জামা ফুলে উঠে ঠিক যেন বেলুনের মত দেখাচ্ছে—যেন এখনি উড়ে যাবে। কিন্তু সে বেলুনের যেন একটা মাথা, দুটো হাত আর দুটো পা গজিয়েছে!

কেউ কেউ গরু বা বাছুর দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চলেছে। গরু-বাছুরের পিছনে পাতাশুদ্ধ ডাল দিয়ে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে তার বৌ—মাথায় প্রকাণ্ড ঝাঁকা, তার ওপর দিয়ে মুরগীর আর হাঁসের মাথা দেখা যাচ্ছে। মেয়েরা দ্রুত, ঘন ঘন পা ফেলে চলেছে—তারা রোগা শুকনো, কিন্তু সিধে হয়ে চলেছে, তাদের বুকের ওপর একটা করে শাল জড়ানো—মাথায় একটা শাদা কাপড় দিয়ে ঘোমটার মত করে তার ওপরে টুপি এঁটে তারা চলেছে।

একটা ছ্যাকড়া গাড়ী চলেছে। পা ছেত্‌রে খট্ খটাখট্ করে একটা মাদী ঘোড়া ছুট্‌ছে। আসনে যে দু'জন লোক বসেছিল তারা,

টাল খেতে খেতে চলেছে—নীচে পাদানীতে যে মেয়েটি বসেছে, সে গাড়ীর দু ধার দু হাতে আঁকড়ে ধরে ঝাঁকুনি সামলাচ্ছে।

গদারভিলের বাজারে ভীষণ ভীড়। জন্তু আর পশুর একটা মেলা বললেও হয়। সেই জনসমুদ্রের ওপরে দেখা যাচ্ছে—গরুর শিং, বর্ধিষ্ণু চাষীদের উঁচু টুপী, আর মেয়েদের টুপী ও বনেট্।

কোলাহল, চীৎকার, চেঁচামেচি, হাঁকাহাঁকি, হৈ-হৈ-এর তীব্র, তীক্ষ্ণ সুউচ্চ-শব্দে যেন এক বন্য ধ্বনি নিরন্তর শব্দিত হচ্ছে। কখনো বা কোন রগুড়ে ব্যবসায়ীর বলবান ফুস্‌ফুসের উচ্চ অট্টহাস্য উঠ্‌ছে, কখনো বা বাড়ীর দেওয়ালে-বাঁধা কোন গরুর দীর্ঘ হাম্বারব শোনা যাচ্ছে।

বাজারে কেবল গোয়ালঘরের মত গন্ধ, দুধের গন্ধ, ঘাস-খড়ের গন্ধ, ঘামের গন্ধ—আর মেঠো লোকের গা দিয়ে যে আধা-মানুষ আধা-পশুর গন্ধ ছাড়ে, সেই গন্ধ।

ব্রেঅটের মেতর্ হসেকর্ণ সবে গদারভিলে পৌঁছেছে—সে যেই পার্কের পথে পা দিতে যাবে, তখন দেখলে মাটীতে একটা সুতো পড়ে রয়েছে। মেতর্ হসেকর্ণ নরম্যান—সে নরম্যান-সুলভ হিসেবী। সে ভাবলে, কাজের জিনিষ হলে কুড়িয়ে নেওয়া দরকার। সে ঝুঁকে সেটা তুলতে গেল—তার কোমরে বাত, সে জন্যে একটু কষ্ট হল বৈকি! সরু সুতোটা সে মাটি থেকে উঠিয়ে নিল এবং সেটা গুটিয়ে নিতে যাবে, এমন সময়ে দেখলে মেতর্ মালাঁদেঁ তার গাড়ী মেরামতের দোকানের দরজা থেকে তাকে লক্ষ্য করছে। একবার কি নিয়ে তাদের মধ্যে খুব ঝগড়াঝাটি হয়েছিল—সেই থেকে উভয়ে উভয়ের ওপর রাগ পুষে রেখেছিল। ময়লার মধ্য থেকে একখণ্ড সুতো তুলে নিতে গিয়ে মেতর্ হসেকর্ণ এভাবে ধরা পড়ে লজ্জায় যেন মরে গেল। সে তাড়াতাড়ি সুতোটা জামার মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে পকেটে রেখে, তখনো যেন ঝুঁকে পড়ে কি খুঁজতে লাগলো; তারপর যেন কিছু না পেয়ে, সে কোমরে বাতের জন্য দোভাঁজ হয়ে ঝুঁকে হাঁটতে হাঁটতে বাজারের দিকে আস্তে আস্তে চলে গেল।

তখনি সে ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল—ভীড়ের মধ্য থেকে কখনো চেঁচামেচি, কখনো স্তব্ধতা, কখনো উত্তেজনার শব্দ উঠতে লাগ্‌ল। চাষীরা গরু পরীক্ষা করে চলে যায়—আবার ফিরে আসে, কি করবে যেন ঠিক করে উঠতে পারে না—সব সময়ে যেন ঠকবার ভয়—কোন কিছু স্থির করতে যেন সাহস হয় না—বিক্রেতার চোখের দিকে দৃষ্টি তাদের—লোকটার কৌশল ধরে ফেল্‌তে হবে, গরুর যদি কোন রকম খুঁত থাকে!

মেয়েরা পায়ের কাছে বড় বড় ঝাজ্‌রা নামিয়ে মুরগী, হাঁস বার করে পায়ে দড়ি বেঁধে মাটীতে শুইয়ে রেখেছে—তাদের চোখে ভয়ের দৃষ্টি—মোরগদের ঝুঁটিগুলো টক্‌টকে লাল।

কত খদ্দের কত দর বলে যাচ্ছে—তারা তাদের দর কিছুতে কমাচ্ছে না। আবার হঠাৎ কম দামেই দেবার জন্যে তারা খদ্দেরকে ডাকছে—বেশ, ঐ দরেই দেব, আসুন মেতর এন্‌দিম্!

তারপর ক্রমশঃ পার্কটা খালি হয়ে যায়—ঠিক দুপুরের সময়ে দূরের লোকরা সব হোটেলে গিয়ে ঢোকে।

জুরদেঁর হোটেলের বড় ঘরটা লোকে ভরে গেছে—উঠোনটা নানা রকমের গাড়ীতে ভর্তি—ঠেলাগাড়ী, মালবহা বড় ভ্যান, গরুর গাড়ী, ছ্যাকড়া গাড়ী, এক্কা—সব গাড়ী ধুলোয় ধূসর—বিতিকিচ্ছিরি—।

টেবিলে বসে লোকজন খাওয়া-দাওয়া করছে, ওদিকে উনুনে রান্না হচ্ছে। তিনটে বড় উনুনে ভেড়ার মাংস, মুরগী ও পায়রার মাংস চড়েছে—কষা মাংসের মিষ্টি গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে।

মেতর জুরদেঁর হোটেলে সম্ভ্রান্ত চাষীরাই খেতে বসেছে—লোকটা ঘোড়া কেনা-বেচার কাজও করে—লোকটা শানশা—এ বাজারে বেশ দু পয়সা উপার্জন করেছে।

ডিশভর্তি খাবার দেওয়া হচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে যাচ্ছে—আর খরচ হচ্ছে, জগভর্তি সাইডার মদ। সকলেই কথা কইছে—লেন-দেনের কথা—কেনা-কাটার কথা, বেচা-কেনার কথা। এ বছর

ফসলের অবস্থা সম্বন্ধেও নানা আলোচনা হচ্ছে—এ বছর শাক-শব্জি ফসলের বছর—কিন্তু গমের পক্ষে সুবিধা হবেনা, মাটি বড় ভিজে।

হঠাৎ বাড়ীর সামনের উঠোনে ঢোল বেজে উঠ্‌ল—কয়েকজন ছাড়া প্রায় সবাই আগ্রহে উঠে দাঁড়াল—কেউ কেউ দরজার কাছে ছুটে গেল—কেউবা জান্‌লার কাছে—সকলের মুখে খাবার, হাতে গামছা। ঢ্যাঁড়াওলা বাজ্‌না থামিয়ে—টানা টানা সুরে, থেমে থেমে বলতে লাগ্‌ল : গদারভিলের সকলে জেনে রাখো—বাজারে যারা এসেছে, তারাও জেনে রাখো—আজ সকালে বোজেভিল্ রাস্তার ওপর—এই নটা-দশটার মধ্যে—কালো চামড়ায় বাঁধাই একটা পকেট বুক হারিয়েছে—সেই পকেট বুক-এ পাঁচশ ফ্রাঁ এবং দরকারী কাগজ-পত্র ছিল। যে এই পকেট বুক পেয়েছে, তাকে সেটা মেয়রের অফিসে কিম্বা ম্যানারভিলের মেতর ফরচুন হুলব্রেকের কাছে এখনি জমা দিতে বলা হচ্ছে। এজন্য কুড়ি ফ্রাঁ পুরস্কার দেওয়া হবে।

ঢ্যাঁড়াওলা চলে গেল। আর একটু দূরে তারা ঢ্যাঁড়ার শব্দ শুনতে পেল—ঢ্যাঁড়াওলার চিৎকারও তাদের কানে এল।

তারপর তারা এই ব্যাপাব সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলে—এই পকেট বুক মেতর হুলব্রেক্ আবার পাবে কি পাবেনা, সে সম্বন্ধে জোর বিতর্ক শুরু হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে খাওয়া-দাওয়া চল্‌ছে।

কফি খাওয়া সবে আরম্ভ হয়েছে, এমন সময়ে থানার কর্তা দরজার চৌকাঠে এসে দাঁড়ালেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এখানে কি ব্রেঅটের মেতর হসেকর্ণ আছে?

হসেকর্ণ টেবিলের অপর দিকের প্রান্তে বসেছিল ; সে বললে : এই যে হুজুর।

থানার কর্তা বললেন : মেতর্ হসেকর্ণ, তুমি কি একবার দয়া করে আমার সঙ্গে মেয়রের অফিসে আসবে? মশিয়েঁ লে মেয়র তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

চাষীটি এতে ভারী আশ্চর্য হল—অস্বস্তিও অনুভব করল—ছোট গ্লাসের কগ্‌নাগ টুকু কোঁৎ করে গিলে ফেল্‌ল—তারপর উঠে দাঁড়াল—সে যেন সকালের চেয়ে আরও বেশী ঝুঁকে গেছে—। বিশ্রামের পর প্রথম চল্‌তে শুরু করলে কষ্ট ত হবেই—সে বার বার বল্‌তে লাগ্‌ল : এই যে আমি—এই যে আমি।

সে থানার কর্তার অনুসরণ করল।

একটা আরাম-কেদারায় শুয়ে মেয়র তখন তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এই জায়গার তিনি একজন বিচারক—ইনি লম্বা, গম্ভীর আর বক্তৃতাবাজ।

তিনি বললেন : মেতর্ হসেকর্ণ, আজ সকালে বোজেভিল্ রোডে তোমাকে ম্যানারভিলের মেতর হুজব্রেকের হারানো নোট বই কুড়োতে দেখা গেছে।

হসেকর্ণ একেবারে থ হয়ে গেল! সে মেয়রকে লক্ষ্য করতে লাগ্‌ল। কিন্তু এই সন্দেহের জন্যে তার মনে ইতিমধ্যেই ভয় দেখা দিল। কিন্তু কেন যে তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে, তা সে বুঝতে পারলো না।

: আমি, আমি পকেট বুক কুড়িয়ে নিয়েছি?

: হ্যাঁ, তুমি।

: আমি শপথ করে বলছি, আমি ও সম্বন্ধে একেবারে কিছুই জানি না।

: লোকে যে দেখেছে!

: আমাকে দেখেছে? আমাকে? কে সে, যে আমাকে দেখেছে?

: গাড়ী মেরামতের দোকানদার মেতর্ মালাঁদেঁ।

তখন বুড়ো হসেকণের মনে পড়ল, সে বুঝল ব্যাপারটা; রাগে লাল হয়ে সে বললে : ওঃ, সে দেখেছে, সেই ভীরু বর্বরটা? সে আমাকে এই সুতোটা কুড়োতে দেখেছে।

এই বলে পকেট হাতড়ে সে একটা ছোট সুতো বার করে দেখালে।

কিন্তু মেয়রের এ কথা বিশ্বাস হল না। তিনি মাথা নেড়ে বললেন : মেতর্ হসেকর্ণ, তোমার ও কথা আমাকে বিশ্বাস করাতে পারবে না—মেতর মাল্যাদেঁ নির্ভরযোগ্য ভদ্রলোক…এই সুতোটা সে পকেট বুক বলে ভুল করবে বলে ত, আমারও বিশ্বাস হয় না।

চাষী হসেকর্ণ একেবারে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে দুহাত ওপরে তুলে মাটিতে থুথু ফেলে বলতে লাগল : যে যাই বলুক, এইটাই সত্যি, ভগবানের সত্যি, মঁসিয়ে মেয়র, আমি আমার আত্মা, আমার মুক্তির দিব্যি করে বলছি—আমি যা বলেছি তা সত্যি।

মেয়র বলতে লাগলেন : সেটা কুড়িয়ে নেবার পর কোন টাকা তা থেকে মাটীতে পড়ে গেছে কিনা, দেখবার জন্য তুমি মাটীর দিকে আরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে খুঁজেছ।

ভয়ে আর রাগে বুড়োর যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে বলে বোধ হতে লাগ্ল : একথা যদি তারা বল্তে পারে—যদি একথা কেউ বল্তে পারে—এই রকম মিথ্যে কথা বলে একজন ভালো লোকের নিন্দে করা—কলঙ্ক দেওয়া! যদি তারা বলতে পারে!…

সে যতই প্রতিবাদ করুক, তার কথা মেয়র বিশ্বাস করলেন না।

তাকে মেতর্ মাল্যাদেঁর সামনে ভজানো হল। মাল্যাদেঁ তার সাক্ষ্যের কথা পুনরাবৃত্তি করল। এক ঘণ্টা ধরে তারা পরস্পর পরস্পরকে গালাগালি করল। মেতর্ হসেকর্ণ নিজেই তার শরীর তল্লাসী করতে বলায়, তাকে তল্লাসী করা হল। কিছুই পাওয়া গেল না।

মেয়র বিরক্ত হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়ে শাসালেন যে, তিনি তার বিরুদ্ধে নালিশ করবেন।

এ খবর ইতিমধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেল। মেয়রের অফিস থেকে বের হবার পর থেকে সবাই তাকে ঘিরে ধরল, কেউ কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে তাকে প্রশ্ন করে, কেউ বা কেবল ঠাট্টা করে—এতে হসেকর্ণ মোটেই রাগ করে না। এই ভাবে সে সুতোর কাহিনী বিবৃত করে চলে। তার কথা কি তারা বিশ্বাস করে? তারা সবাই মুখ বেঁকিয়ে

খালি হাসে। যেখানেই যায়, সকলে তাকে প্রশ্ন করে—সেও গায়ে পড়ে লোককে বলে—প্রত্যেকবারেই প্রতিবাদ করে, পকেট উল্টে দেখায় যে, তার পকেটে কিছু নেই।

তারা বলে : তুমি একটি পাকা শয়তান!

শুনে সে চটে যায়, ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে, তার গা গরম হয়ে যায়—মনে দারুণ হতাশা এই যে, কেউ তার কথা বিশ্বাস করে না—কিন্তু নিজের কথা বলতেও সে ছাড়ে না।

রাত হয়ে এলো—এবার বাড়ী ফিরতে হবে। তিনজন পড়শীর সঙ্গে সে যাত্রা করে। যেখানে সে সূতোটি কুড়িয়ে পেয়ে ছিল, সে জায়গাটা সে দেখিয়ে দেয়। সারা পথ ধরে এই গল্পই চলতে থাকে।

রাত্রে সে ব্রেঅটে গ্রাম চক্কর দিয়ে আসে—সকলকে গল্পটা বলে। কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করবার মত লোক একটিও সে পায় না—সকলের চোখে-মুখেই অবিশ্বাস।

সারা রাত এই চিন্তায় সে অস্থির হয়ে পড়ে।

পরদিন দুপুর একটা নাগাত মারিউস্ পমেল্—মেতর ব্রেটনের খামারের চাকর—যে ইম্যভিলের মালীর কাজ করে—সে ম্যানারভিলের মেতর হুল্‌ব্রেককে টাকাশুদ্ধ পকেট বুক ফেরৎ দিয়ে এল।

এই লোকটা সত্যিই বলেছে যে, সে এটা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিল; নিজে পড়তে জান্‌ত না বলে, সে সেটা বাড়ী নিয়ে গিয়ে তার মনিবকে দিয়েছিল।

চতুর্দিকে এ খবর রটে গেল। মেতর হসেকর্ণের কাছেও খবর এল। সে আবার সর্বত্র গিয়ে শেষ পরিণতির কথাটাও সকলকে জানিয়ে এল। এবার যেন তার জয়!

সে বললে, ব্যাপারটা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই—বুঝলে কিনা—কিন্তু ঐ মিথ্যে কথাগুলোই সর্বনেশে। মিথ্যে কথা বলে অপদস্থ হওয়ার মত ক্ষতিকর আর কিছুই হতে পারে না।

সারা দিন সে তার অভিজ্ঞতার গল্প করল। পথচারী লোকদের পর্যন্ত ডেকে ডেকে বলতে লাগ্‌ল—ভাটিখানার যারা মদ গিল্‌ছে সেখান পর্যন্ত গিয়ে বল্‌তে লাগল। রবিবার যখন লোক গির্জে থেকে ফিরছে তখনও সে তাদের ডেকে ডেকে বল্‌তে লাগল। সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকদেরও সে একথা বলতে লাগল। এতক্ষণে সে যেন অনেকটা সহজ স্বাভাবিক হয়েছে, কিন্তু তবুও কি যেন তার মনে খচ্‌খচ্‌ করতে লাগ্‌ল। তার কথা শুনে লোকে বেশ আমোদ পেতে লাগ্‌ল, এতেও তাদের কিন্তু ঠিক বিশ্বাস হল না! তারা চলে গেলে তাদের টুকিটাকি মন্তব্যগুলো তার গায়ে যেন বেশ বিঁধতে লাগ্‌লো।

পরের সপ্তাহে মঙ্গলবার সে গদারভিলের বাজারে গেল—এ গল্প বলার জন্যেই তার উৎসাহ বেড়ে গেল।

দরজাব চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মাল'াদেঁ তাকে যেতে দেখে হাসতে লাগল—কিন্তু কেন? কেন হাসল?

ক্রিকেতভের একজন চাষীকে পাকড়ে সে একথা বলতে লাগ্‌ল। সে তাকে গল্পটা শেষ করতে না দিয়েই—তার পেটে একটা গোঁতা দিয়ে তার মুখের ওপরেই বললে, "অ শয়তান!" বলেই সটান চলে গেল।

মেতর হসেকর্ণ একেবারে চুপ মেরে গেল। এতে যেন তার অস্বস্তির মাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়তে লাগ্‌লো। তারা তাকে "আদত শয়তান" বা "পাকা শয়তান" বলবে কেন?

জোরদেঁর হোটেলে টেবিলে খেতে বসে সে আবার সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি করলে।

মন্তি ভিলিয়ের এক ঘোড়া-ব্যবসায়ী তাকে দেখে উচ্চৈঃস্বরে বললে: বেরোও, বেরোও, পাকা চোর—তোমার ও সূতোর গল্প আমি আগাগোড়া জানি।

হসেকর্ণ তোত্‌লাতে থাকে। কিন্তু, তারপর ত' তারা সেটা পেয়েছে—সেই পকেট বইটা!

কিন্তু লোকটা বললে ঃ আর মুখ নাড়তে হবে না বাপু ; একজন পায় আর আরেকজন ফেরৎ দেয়। এ কথা কি বোঝা এত কঠিন নাকি!

হসেকর্ণের গলা যেন বুজে আসে। সে সব শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারে। তারা তাকে দায়ী করছে, ভাবছে সে-ই পকেট বুকটা পেয়ে অপর এক সাকরেদকে দিয়ে ফেরৎ পাঠিয়েছে।

এর প্রতিবাদ করতে সে চেষ্টা করে। কিন্তু ঘরশুদ্ধ লোক হাসতে শুরু করে দেয়।

শেষ পর্যন্ত সে খেতে পাবে না—সকলেব মিলিত বিদ্রূপের মধ্যে সে ঘর থেকে চলে যায়।

বাড়ী ফেবে সে ভীষণ লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে—রাগে তার মুখে কথা ফোটেনা—সে যেন হতভম্ব হয়ে যায়—ভড়কে যায়। মনে মনে সে দমে যায়---নবম্যান-সুলভ ধূর্ততা থেকে সে বুঝতে পারে যে, সে এরকম কাজ করে—চালাকি করে—এখন বাহাদুরি মারতে পারে—একথা সঙ্গত। তাব মনে হয় যে, তার নির্দোষিতা প্রমাণ করা শক্ত—সে যে খুব চতুর, তা যে সবাই জানে। কাজেই অবিচাব করে তাকে যে সন্দেহ কবা হয়েছে, এই অনুভূতি যেন তাকে আহত করতে থাকে, তাব বুকের মাঝে ক্ষত সৃষ্টি করে।

তারপরে সে আবার তার কথা বলতে থাকে—গল্প ক্রমশঃ দীর্ঘায়িত হতে থাকে—প্রতিবারে সে নতুন নতুন প্রমাণ প্রয়োগ করে। আরো মোক্ষম প্রতিবাদ করে আর গুরুগম্ভীর দিব্যি করে—এই সব দিব্যি সে নির্জনে বসে বানায়—তার মনে আর কোন চিন্তা নেই—একমাত্র চিন্তা—এই সূতোর কাহিনী। কিন্তু সে যত জটিল প্রমাণাদি উপস্থিত করে, যত কৌশলে যুক্তির জাল বোনে, ততই লোকে তাকে অবিশ্বাস করে।

তার পিছনে সবাই বলে ; ওসব মিথ্যেবাদীর প্রমাণ।

এটা সে অনুভব করে—এতে তার হৃদয়ের যাতনা বাড়ে। নিজের নির্দোষিতা প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টায় সে ক্রমশঃ কাহিল হয়ে পড়ে।

বেশ দেখা যায় যে, তার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

এখন বিদ্রূপ করার জন্যেই লোকে তাকে সুতোর কাহিনী বলতে বলে। সৈনিককে যেমন যুদ্ধের গল্প বলতে বলে, এ যেন তেমনি। তার মর্মমূলে আঘাত লাগায় তার মন ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে।

ডিসেম্বর মাসের শেষে সে বিছানা নেয়। জানুয়ারীর প্রথম দিকে তার জীবন-দীপ নিভে যায়। মৃত্যুযন্ত্রণায় অসাড় হয়ে সে ভুল বকতে থাকে—আপনার নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য সে প্রতিবাদ করে—বার বার বলতে থাকে : এক টুকরো সুতো—শুধু এক টুকরো সুতো—এইত দেখুন না, মঁশিয়ে লে মেয়র, এইত দেখুন না!

———

## বারো

### ॥ একটি সংসার ॥

পনের বছর বন্ধুর সঙ্গে দেখা নেই। সাইমন রাদেভিন্‌কে আবার দেখতে যাচ্ছি। আগে সে-ই ছিল আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু—তার সঙ্গে কতদিন সন্ধ্যোয় শান্তিতে ও সুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেছি! যে সব লোকের কাছে মানুষ মনের গোপনতম চিন্তার দোর খুলে দিতে পারে, সে ছিল সেই ধরণের। তার কাছে গল্প করতে করতে কত যে দুর্লভ, বুদ্ধিদীপ্ত, নতুন, চৌকষ সব ভাব আমার মনে জেগে ওঠে—মনকে অনুপ্রাণিত করে শান্তি এনে দিত—তা বলবার নয়।

বছরের পর বছর আমাদের কখনও ছাড়াছাড়ি হয়নি। আমরা এক সঙ্গে বাস করেছি, এক সঙ্গে বেড়িয়েছি, এক সঙ্গে চিন্তা করেছি, এক সঙ্গে স্বপ্ন দেখেছি, একই জিনিস দুজনে সমান আগ্রহে পছন্দ করেছি, একই বই দুজনের প্রশংসা লাভ করেছে, একই কাজ করেছি, একই উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়েছি, একই লোকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছি এবং এক নজরে দুজনেই তাদের সম্পূর্ণ বুঝে নিয়েছি।

তারপর সে করল বিয়ে; হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সে একটি গ্রাম্য বালিকাকে বিয়ে করে বসল—মেয়েটি প্যারিতে এসেছিল বিয়ে করবার জন্যে। সেই ছোটখাটো পাতলা, সুন্দর অথচ জোলো বিস্বাদ মেয়েটা তার দুর্বল হাত, ফ্যালফেলে চোখ আর বোকা-বোকা গলার স্বর—হাজার হাজার বিয়ের যুগ্যি পুতুলের মত, এই মেয়েটা কি করে তার মত বুদ্ধিমান, চতুর যুবককে বেছে বার করল, তা সত্যি আশ্চর্য! এ-সব ব্যাপার কি কেউ বোঝে? সে যে সুখ খুঁজেছিল—সাদাসিধে, নিরুদ্বেগ, দীর্ঘস্থায়ী সুখ—একটি সাধ্বী, কোমলস্বভাবা রমণীর বাহুবন্ধন চেয়েছিল, তাতে আর সন্দেহ কি!

ফুরফুরে পাৎলা চুলের ঐ স্কুল-বালিকাটির স্বচ্ছ দৃষ্টি থেকে সে সমস্তই অনুমান করে নিয়েছিল।

এ-কথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি যে, মানুষ যতই কর্মঠ, জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হোক না, বাস্তব বিষয়ে সচেতন হওয়ামাত্র সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, জীবন সম্বন্ধে বীতরাগ হয়ে পড়ে, তবে যদি সে নেহাৎই পশু-ভাবাপন্ন হয়, যদি তার বোধশক্তি নষ্ট হয়ে যায়, সে অবশ্য অন্য কথা।

আবার যখন তাকে দেখ্‌ব, কেমন দেখ্‌ব? এখনও কি তাকে তেমনি আমুদে, তেমনি স্ফূর্তিবাজ, তেমনি লঘুচিত্ত, তেমনি উৎসাহী দেখ্‌ব? না গ্রাম্য লোকের মত মানসিক জড়তাপন্ন দেখ্‌ব? পনের বছরে মানুষের অনেক পরিবর্তন ঘট্‌তে পারে।

একটি ছোট্ট ষ্টেশনে ট্রেণ থাম্‌ল। গাড়ী থেকে নামতেই একজন বলবান, বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট, লালচে-গাল, বিরাট ভুঁড়িওয়ালা লোক দৌড়ে এসে দুই বাহু প্রসারিত করে চেঁচিয়ে উঠল: জর্জ। আমি তাকে আলিঙ্গন করলাম, কিন্তু তাকে ঠিক চিনতে পারলাম না: তারপর আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম: ভগবানের দিব্যি! তুমি ত রোগা হয়ে যাওনি! সে হেসে বললে: তুমি কী আশা করেছিলে? ভাল খাওয়া-দাওয়া, ভালভাবে জীবনযাপন, মধুময় রাত্রি যাপন! খাওয়া আর ঘুম—এই ত জীবন!

আমি তাকে ভালভাবে লক্ষ্য করতে লাগলাম। তার প্রশস্ত মুখে আমার সেই সব প্রিয় চিহ্নগুলি যদি কোথাও কিছু দেখা যায়। তার সবই পরিবর্তন হয়েছে, কেবল চোখ দুটি অপরিবর্তিত আছে—কিন্তু সে দৃষ্টি নেই। মনে মনে বললাম: চোখের দৃষ্টিতে যদি মনের ছাপ পাওয়া যায় ত বলতে হবে, আগেকার সেই সব চিন্তা এখন আর তার মাথায় নেই—সে সব চিন্তার কথা আমি যে খুব ভাল করেই জানতাম!

তবুও তার চোখ দুটি উজ্জ্বল, আনন্দ ও প্রীতিতে ভরপুর; কিন্তু সে চোখে আগেকার মত স্বচ্ছতা বা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা নেই—মনের খবর

বিনা ভাষায় তা থেকে মেলে না। সহসা সে আমাকে বললে : এই দুটি আমার বড় ছেলে-মেয়ে। একটি চৌদ্দ বছরের মেয়ে—প্রায় কিশোরী বললেই হয়—আর একটি ছেলে—তেরো বছরের। তারা ইতস্ততঃ করতে করতে এগিয়ে এলো ; আমি শান্তকণ্ঠে বললাম : এগুলি কি তোমার—?

: নিশ্চয়ই ; সে হেসে বললে।

: ছেলে-মেয়ে মোট কটি ?

: পাঁচটি ; আরো তিনটি বাড়ীতে আছে।

গর্বিত, আত্মতৃপ্ত, বিজয়ীর মত সে কথাগুলি বলল। আমার মনে করুণা হল—সেই করুণার সঙ্গে একটু মৃদু ঘৃণার ভাব মিশ্রিত ছিল। এই সব লোক গ্রামে এসে কেবল বংশবৃদ্ধি করে, আর তাতেই তাদের কতই না দম্ভ.

একটা ঘোড়ার গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ীটা সে নিজেই হাঁকাতে লাগল। একটা বিবর্ণ, ঘুমন্ত, অন্ধকার শহরের মধ্য দিয়ে আমরা যাত্রা করলুম। রাস্তায় লোকজন নেই—মাঝে মাঝে দু-একটা কুকুর বা একটা-দুটো ঝি দেখা যাচ্ছিল। এখানে-ওখানে হয়ত কোন দোকানদার দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে সাইমনকে অভিবাদন করছিল, সাইমনও টুপী তুলে প্রত্যভিবাদন জানিয়ে, আমাকে তাদের নাম বলে দিচ্ছিল ; এই সব লোকদের সঙ্গে যে তার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে, তা আমাকে জানাবার জন্যই সে যে এ-রকম করছিল, তাতে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। তখন আমার মনে হচ্ছিল, সে হয়ত চেম্বার অফ্ ডেপুটিস্-এ নির্বাচনপ্রার্থী হতে চায়—গ্রামে যারাই এসে বাস করে, তাদের অধিকাংশই এরকম উদ্দেশ্যেই আসে।

শীঘ্রই আমরা শহর ছেড়ে গেলাম। গাড়ীটা এক বাগানের দিকে মোড় ঘুরল। এই বাগানটিকে দেখলে প্রায় পার্ক বলে মনে হয়—গাড়ী একটা বাড়ীর সামনে দাঁড়াল—বাড়ীটাকে 'স্যাটো' বলা চলতে পারে।

সাইমন বললে, "ঐ আমার আস্তানা।" মনে হল, সে যেন আমার প্রশংসা শুনতে চাইছে। আমি বলে উঠলাম, চমৎকার!

বাড়ীতে নিমন্ত্রিত অতিথি আস্‌ছে বলে সেজেগুজে একজন ভদ্রমহিলা সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল—অতিথিকে কি বলে অভিবাদন করবে, তা যেন সে মুখস্থ করে এসেছে। আমি পনের বছর আগে যে ফুরফুরে কেশবতী, জোলো মেয়েটিকে গীর্জায় দেখেছিলাম, এ যেন সে মেয়ে নয়; বেশ মোটাসোটা, গায়ে ভাঁজ পড়ে গেছে। এ যেন সেই জাতের মেয়ে, যাদের বয়স অনুমান করা যায় না—যাদের বুদ্ধি নেই—মেয়ে বলতে যা থাকা দরকার, তার যেন কিছুই নেই।

অল্প কথায়, সে একজন মা—মোটাসোটা সাধারণ মা, মানুষ বেশ-ধারিণী মাত্র—ডিমপাড়া মুরগী বা এক মাদী ঘোড়া। এর কাজ কেবল—বাচ্ছা প্রসব করা—এ যেন রক্তমাংসের যন্ত্র—যার কাজ কেবল বংশবৃদ্ধি করা—ছেলেমেয়ে আর ঘরকন্না ছাড়া আর যেন তার কোন ভাবনাচিন্তা নেই!

সে আমাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাল। আমি হলঘরে গেলাম। এই ঘরে তিনটি ছেলে-মেয়ে উচ্চতা অনুসারে সারি সারি দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক যেন মেয়রের সামনে দমকলের লোকরা দাঁড়িয়ে আছে। আমি বল্‌লাম: অ! এই, আর তোমার বাকী তিনটি! আনন্দে সাইমন একেবারে উচ্ছল হয়ে, তাদের নাম বলে দিলে: জঁা, সোফি আর গঁত্রান্‌।

বৈঠকখানার দরজা খোলা ছিল—আমি ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। দেখলাম, একটা আরাম-কেদারার মধ্যে কি যেন একটা নড়ছে—একজন লোক বসে! বুড়ো, পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোক। মাদাম রাদেভিন্‌ এগিয়ে এসে বললেন: মঁশিয়ে, ইনি আমার বাবা—সাতাশী বছর এঁর বয়স। ভদ্রলোকের সমস্ত শরীর কাঁপছে—তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মাদাম বললেন: বাবা, ইনি সাইমনের বন্ধু। বৃদ্ধ আমাকে শুভ প্রভাত জানাতে চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে

শুধু বার হল : উয়া—উয়া—উয়া। তিনি হাত নাড়লেন। আমি একটা চেয়ারে বসে বললাম : ধন্যবাদ ম'শিয়ে।

এই সময়ে সাইমন এসে হাজির হল। সে হেসে বললে : বেশ ত! তুমি এঁর সঙ্গে আলাপ করে ফেলেছ! এঁর জুড়ি নেই—আমার ছেলেমেয়েরা ওঁকে নিয়ে খুব মজা করে—এখন এঁর খুব লোভ হয়েছে—প্রায়ই খাবার সময় প্রচুর খেয়ে প্রায় মর মর হয়ে পড়েন; ওঁকে যদি ওঁর ইচ্ছেমত খেতে দেওয়া হয়, তবে কি যে খাবেন, কত যে খাবেন, তা তুমি ধারণাই করতে পারবে না। সবই দেখতে পাবে—ক্রমশঃ দেখতে পাবে। মিষ্টি পেলে তিনি আর কিছু চান না—খাবার কোনও বাছবিচার থাকে না ওঁর—তা সে যে রকম খাবারই হোক্! এ রকম মজার লোক তুমি আর দেখতে পাবে না। এখনই সব দেখতে পাবে।

এরপর আমাকে আমার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। আমি এখানে মধ্যাহ্ন-ভোজের জন্য আমার পোশাক বদল করে নিলাম। সিঁড়িতে ভীষণ একটা চট্পট্ শব্দ শুনে আমি পিছন ফিরে দেখলাম, আমার পিছন পিছন সাইমনের ছেলে-মেয়েরা আমাকে সম্মান দেখাবার জন্যে তাদের বাপের সঙ্গে সঙ্গে আসছে।

ঘরের জানালা দিয়ে একটা সমতলভূমি দেখা যায়—কেবল এক অনন্ত প্রসারী মাঠ—তাতে প্রচুর পরিমাণের ঘাস, গম আর বজরা হয়ে রয়েছে—কোন উঁচু জায়গা বা কোন গাছপালা নেই। কেমন যেন একঘেয়ে আর বিষাদমলিন। মনে পড়ে, এই যে বাড়ীতে এরা জীবনযাপন করছে, এ দৃশ্য যেন তারই প্রতিচ্ছবি!

মধ্যাহ্ন-ভোজনের ঘণ্টা বাজলে আমি নীচে নেমে গেলাম। মাদাম রাদেভিন আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে খাবার ঘরে ঢুকলেন। বুড়ো লোকটির আরাম কেদারাটার চাকা ঠেলে ঘড় ঘড় করে একজন চাকর টেবিলের ধারে এনে দিল। বুড়ো লোভী শ্যেনদৃষ্টিতে সমস্ত খাবার লক্ষ্য করতে লাগলেন—তিনি তাঁর নড়নড়ে মাথা বহু কষ্টে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে টেবিলের উপরে সাজানো খাবার দেখতে লাগলেন।

সাইমন দু হাত ঘষে বললে : খুব মজা পাবে ; ছেলেরা বুঝতে পারলো যে, তাদের লোভী ঠাকুরদার ব্যাপার দেখে আজ আমিও মজা পাবো। কাজেই তারাও সবাই হাসতে লাগল—তাদের মা শুধু একটু মুচকে হাসলেন এবং একবার কাঁধ ঝাঁকানি দিলেন। সাইমন মুখের সামনে দু হাতের চেটো দিয়ে রামশিঙা তৈরী করে চীৎকার করে বুড়োকে বলল : আজ পায়েস হয়েছে—মিষ্টি পায়েস। বুড়োর কোঁচকানো মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল—তিনি যেন আরো ঘনঘন কাঁপতে লাগলেন—এর থেকে বোঝা গেল যে, তিনি খাবারের কথা শুনতে পেয়ে সব বুঝেছেন—খুব খুশীও হয়েছেন। ভোজ আরম্ভ হল।

সাইমন কিন্ কিন্ করে বললে : ঐ দেখ।

ঠাকুরদা ঝোল পছন্দ করেন না—ঝোল খেতে তিনি রাজী নন। কিন্তু ওঁর স্বাস্থ্যের জন্য ঝোল ওঁকে খাওয়াতে হবে। চাকর ওর মুখে জোর করে চামচে ঢুকিয়ে দিলে—কিন্তু ঝোল যাতে না খেতে হয়, সেজন্য বুড়ো ঝোলটা ফোয়ারার মত মুখ দিয়ে বার করে দিলেন। ঝোল ফোয়ারার মত টেবিলে, মেঝেতে এবং আশপাশে যারা খেতে বসেছিল, তাদের গায়ে ছিটিয়ে পড়ল। এ দৃশ্য দেখে ছেলেমেয়ের আনন্দে হৈ হৈ জুড়ে দিলে। তাদের বাপেরও এতে ভারী আনন্দ। তিনি বললেন, বৃদ্ধ ভদ্রলোক বেশ মজার। কি বলো, বন্ধু ?

যতক্ষণ ভোজ চলল, সকলেই তাঁকে নিয়েই মেতে রইল। টেবিলের সামনে যে সব খাবার রাখা হয়েছিল, তা যেন তিনি চোখ দিয়ে গিলতে লাগলেন—তাঁর কাঁপা হাত দিয়ে তিনি সেগুলো নিজের কাছে টেনে আনবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর নাগালের কাছের ডিসগুলি দিয়ে, তারা তাঁর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাতের ব্যর্থ চেষ্টা লক্ষ্য করতে লাগল—থর থর করে কাঁপা হাতের খাবার আঁকড়ে ধরবার তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল এবং তিনি যেন এক করুণ আবেদন জানাতে লাগলেন ; তাঁর চোখ, তাঁর মুখ, তাঁর নাক—সবই যেন করুণভাবে অসহায়ভাবে ব্যর্থ চেষ্টায় উদগ্র আকুল। নাকে

খাবারের সুমিষ্ট গন্ধ আঘ্রাণ করছেন, আর তাঁর টেবিলের তোয়ালে মুখ ঘষছেন—আগ্রহে অস্ফুট ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করছেন। এই ভয়ানক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে সমস্ত পরিবারের লোকরা প্রচুর আনন্দ উপভোগ করছে।

তারপর তারা ছোট্ট এক গ্রাস খাবার তাঁর ডিসে তুলে দিল।

বিকারগ্রস্ত রোগীর রাক্ষুসে ক্ষিদে নিয়ে তিনি তখনই পেটুকের মত তিনি সেটা খেয়ে নিলেন। তাঁর ভাবখানা এই যে, এটা খাওয়া শেষ হলেই, তাঁকে আবার কিছু দেওয়া হবে। যখন পায়েস পরিবেশন করা হচ্ছিল, তখন আগ্রহে তিনি পাগল হয়ে যাবার মত হয়ে পড়লেন। লোভে তিনি গোঁ গোঁ করতে লাগলেন। গঁট্রান চিৎকার করে বললে: তুমি অনেক খেয়েছ; তোমাকে আর দেওয়া হবে না। তারা এমন ভান করতে লাগল যে, সত্যিই তারা তাঁকে আর দেবে না। তখন বুড়ো কান্না জুড়ে দিল; কাঁদতে কাঁদতে তিনি ভীষণ কাঁপতে লাগলেন; তাঁর এই ভঙ্গি দেখে ছেলেমেয়েরা সবাই হাসতে লাগল। অবশেষে তারা তাঁকে আরও একটু দিলে—কিন্তু প্রথম গ্রাস খাওয়ার পর তিনি গলা দিয়ে লোভীর মত বিশ্রী এক হাস্যকর শব্দ করতে লাগলেন; আর বড় বড় গ্রাস গেলবার সময় হাঁস যেমন করে গলা নাড়ে, তেমনি করে তিনি গলা নাড়তে লাগলেন। খাওয়া হয়ে গেলে পা ঠুকে ঠুকে তিনি আরো খাবার দাবী করতে লাগলেন।

ট্যাণ্টালাসের মত চির-অতৃপ্ত, চির-তৃষাতুর, তাঁর করুণ হাস্যকর অবস্থা দেখে আমার সমস্ত মন করুণায় ভরে উঠল। আমি তাঁর পক্ষ নিয়ে ওদের অনুরোধ করলাম: আহা, দাও না ওঁকে আর একটু পায়েস!

সাইমন বললেন: উঁহুঁ, না; ওঁকে বেশী খেতে দিলে এই বয়সে ওঁর ক্ষতি হবে—শরীর খারাপ হবে।

আমি চুপ করে গেলাম। কথাগুলো মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। হায় রে নীতিশাস্ত্র! হায় রে যুক্তিশাস্ত্র! হায় রে

নীতিজ্ঞান ! এই বয়সে তাঁর জীবনে আর কি বা সুখের আশা আছে ? একমাত্র আশা থেকে তাঁকে, তাঁর স্বাস্থ্যের অজুহাতে বঞ্চিত করে লাভ ? তাঁর স্বাস্থ্য ! এ স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি কি করবেন ? অকর্মণ্য, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, ভগ্নস্বাস্থ্য—ওঁর স্বাস্থ্যের দিকে ওরা নজর দিচ্ছে—ওঁর আয়ু ? সে আর কদিন ? দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ বা একশ ? কিন্তু কেন ? তাঁর নিজের জন্য এর কি দরকার আছে ? না, না, এই পরিবারে নিস্ফল অপরিতৃপ্ত লোভের দৃশ্যটা আরো কিছুকাল সংরক্ষণ করার জন্যই বুঝি এর দরকার আছে !

এ-জীবনে তাঁর দ্বারা আর কিছু হবে না—একেবারে কিছু না। এখন তাঁর একটিমাত্র আশা, একটিমাত্র আনন্দ পুরণ হবার অপেক্ষায় রয়েছে—সেই শেষ সান্ত্বনাটা তাঁকে দিলে ক্ষতি কি ? যতদিন না ওঁর মৃত্যু হয়, ততদিন পর্যন্ত ওর আশা মঞ্জুর করলে ত কোন ক্ষতি নেই !

অনেকক্ষণ তাসখেলার পর, আমি আমার ঘরে উঠে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আমার মনটা দমে গেল—একটা বিষণ্ণ ঔদাসীন্য যেন আমার মনের উপর ক্রমশঃ চেপে ধরতে লাগল। জানলার ধারে এসে বসলাম, কিন্তু দূরে কোথা থেকে একটা পাখীর মধুর স্বর ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে, পাখীটা তার ডিমে রাত্রে তা-দেওয়ার সঙ্গিনীকে ঘুম পাড়াবার জন্য এমনি নীচু এবং মিষ্টি ও মধুর সুরে গান জুড়েছে।

আমার বন্ধুর পাঁচ ছেলেমেয়ের কথা আমার মনে হল। আমি কল্পনার চোখে দেখতে লাগলাম, আমার হতভাগ্য বন্ধুটি তার কুৎসিত স্ত্রীর পাশে শুয়ে এখন নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।

---

তের

## ॥ আমার বাড়ীওয়ালী ॥

জর্জ কার্ভেলেন বলল : সে সময়ে আমি রুয়ে দ্য স্যান্তপেরে এক সাজানো-গোছানো ঘরে থাকি।

বাবা যখন ঠিক করলেন যে, আমাকে প্যারীতে গিয়ে ওকালতি পড়তে হবে, তখন সব ব্যাপারে পাকা বন্দোবস্ত করার জন্যে অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছিল। প্রথমে আমার পড়া ও অন্যান্য খরচ বাবদ আড়াই হাজার ফ্রাঁ বরাদ্দ হয়েছিল, কিন্তু আমার জন্যে আমার মা-বেচারীর সে কি ভাবনা! তিনি বাবাকে বললেন, যদি জর্জ একটু বেশী বাজে খরচা করে ফেলে, তা হলে হয়তো সে খেতেই পাবে না, তা হলে তার শরীরও খারাপ হয়ে যাবে। কাজেই ঠিক হল, আরাম করে থাকা যাবে, এমনি একটা বোডিং হাউস জর্জের জন্যে ঠিক করে দেওয়া দরকার—তা হলে টাকাটা বোর্ডিং হাউসের মালিক বা তার স্ত্রীর নামে সরাসরি দিয়ে দেওয়া চলবে।

আমাদের পড়শীদের কেউ কেউ জনৈক মাদাম্ কারগারানের কথা তুলল। ইনি ব্রিটানীর অধিবাসিনী—বাড়ীতে বোর্ডার নেন। কাজেই বাবা এই সম্ভ্রান্ত মহিলার সঙ্গে পত্রালাপ করে সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। একদিন সন্ধ্যায় মালপত্র নিয়ে আমি তাঁর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলাম।

মাদাম কারগারানের বয়স প্রায় চল্লিশ। তাঁর শরীর বেশ মোটাসোটা—তাঁর গলার স্বরটা অনেকটা ড্রিল সার্জেন্টের মত তীক্ষ্ণ—ঝট্‌পট্ সিদ্ধান্ত করে ফেল্‌তে তিনি অভ্যস্ত। তাঁর বাড়ীটা সরু—প্রত্যেক তলায় রাস্তার দিকে এক একটি করে জানালা। বাড়ীটাকে দেখলে মনে হয়, যেন একটা জানালার সিঁড়ি বা মই থাকে থাকে

ওপর দিকে উঠে গেছে। অথবা, দুটো বাড়ীর মধ্যে একফালি বাড়ী পুর দেওয়া হয়েছে।

বাড়ীওয়ালী দোতলায় তাঁর চাকর নিয়ে থাকতেন; রান্নাঘর ও খাবারঘর ছিল তেতলায়। ব্রিটানীর চারজন বাসিন্দা থাকত চার-তলায় আর পাঁচতলায় থাকত আর একজন, আমি দুটো ঘর নিয়ে থাকতাম ছতলায়।

পাঁচতলার চিলেকোঠার ঘরে উঠবার জন্যে একটা অন্ধকার ঘোরানো সিঁড়ি ছিল। জাহাজের ক্যাপ্টেনের মত মাদাম কারগারান এই সিঁড়ি দিয়ে সারাদিন ওঠানামা করতেন। প্রত্যেক ঘরে অন্ততঃ দিনে দশবার উপস্থিত হয়ে, তিনি হাঁকডাক করে সব দেখাশুনা করতেন—বিছানা ঠিকমতো করা হয়েছে কিনা—জামা ব্রাশ দিয়ে ভালভাবে ঝাড়া হয়েছে কিনা—চাকরগুলো ঠিকমতো কাজ করছে কিনা—সর্বদাই তিনি লক্ষ্য রাখতেন। এক কথায় মায়ের মতই, তাই বা কেন, মায়ের অধিক স্নেহে তিনি বোর্ডারদের তদারক করতেন। আমার দেশের আরও চারজন লোকের সঙ্গে শীগগির আমার আলাপ হয়ে গেল। এদের দুজন ডাক্তারী পড়ছে, আর দুজন ওকালতী পড়ছে। সকলেই নির্লিপ্তভাবে বাড়ীওয়ালীর জবরদস্ত শাসনের কাছে ঘাড় নীচু করে থাকত। ফলের বাগানে ফল চুরি করবার সময়ে চৌকিদার দেখলে, চোর-ছেলেরা যেমন ভয় পায়, ওরা মাদাম কারগারানকে ঠিক তেমনি ভয় করত।

আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম যে, আমাকে স্বাধীন হতে হবে। বিদ্রোহ করা আমার এক স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। রাত্রে বাড়ী ফেরার সময় মাদাম কারগারান বেঁধে দিয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জানিয়ে দিলাম যে, রাত বারোটার মধ্যে বাড়ী ফেরা আমার পোষাবে না। আমার যখন খুশি হবে, আমি তখন বাড়ী ফিরবো। একথা শুনে তিনি একটুখানি আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন : এ অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব। তাতে রাত্রে যখন-তখন অনেকের

ঘুম ভাঙবে—এ আমি চাই না। এত রাত পর্যন্ত বাড়ীর বাইরে তোমার এমন কি কাজ হবে ?

আমি বললাম ঃ আইন অনুযায়ী যে-কোন সময়ে দরজা খুলে দিতে আপনি বাধ্য। যদি আপনি দরজা খুলে না দেন, তবে আমি একজন পাহারাওয়ালাকে সাক্ষী রাখব, আর কোর্ট হোটেলে গিয়ে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে শোব—খরচটা কিন্তু আপনাকেই দিতে হবে—এতে আমার কোন অন্যায় হবে না।

আমার এই সব শর্ত বলতে বলতে আমি তাঁর মুখের উপরই হাসতে লাগলাম। বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ তিনি কথা কইতে পারলেন না। তারপর আমাকে বোঝাতে লাগলেন, কিন্তু আমি অনড়। কাজেই, তাঁকে হার স্বীকার করতে হল। আর ঠিক হল যে, আমার কাছে আর একটা চাবি থাকবে এবং এ-কথা আর কেউই টের পাবে না।

আমার উৎসাহ দেখে তাঁর এরকম পরিবর্তন হল যে, মাঝে মাঝে তিনি যেন আমাকে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখাতে লাগলেন। আমার বিষয়ে তিনি খুব হুঁশিয়ারী থাকতেন এবং আমাকে মাঝে মাঝে গায়ে পড়ে আদর-যত্ন করতেন। সেটা, অবশ্য আমার মন্দ লাগত না। কখনও কখনও বেশী স্ফুর্তির মাথায় আমি হঠাৎ তাঁকে চমকে দিয়ে চুমু খেয়ে ফেলতাম, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আমার কান মুলে আমাকে শাস্তি দিতেন। আগে থেকে সতর্ক হয়ে আমি মাথা নীচু করে নিলে তিনি আমার চারদিকে বলের মত দ্রুত ঘুরে নিতেন, আর আমি হাসতে হাসতে দৌড় দিলে, তিনিও আমার পিছন পিছন ডাকতে ডাকতে যেতেন ঃ অ ! শয়তান ! আচ্ছা, এর প্রতিফল পাবে।

যাই হোক, অনতিবিলম্বে আমাদের মধ্যে বেশ আলাপ হয়ে গেল।

অল্প কিছুদিন পরে; একটা দোকানের কর্মচারিণী একটি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হল। এর সঙ্গে আমার প্রায় রোজই দেখা

হত। প্যারীতে এই জাতীয় ভালবাসা যে কি, তা তোমরা জানো। কোন নির্মেঘ দিনে তুমি লেকচার শুনতে যাচ্ছো। একজন বন্ধুর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে, একজন মজুরানী চলেছে—তোমার সঙ্গে তার দেখা হল, তুমি তার দিকে তাকালে, তোমার মনে একটা উত্তেজনা হল—স্ত্রীলোক দেখলে যেমন হয়ে থাকে। পরদিন ঠিক সেই সময়ে, সেই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে তুমি আবার তাকে দেখলে—তার পরদিনও। এমনি করে পর পর কয়েকদিন। অবশেষে তুমি তার সঙ্গে কথা কইলে, ব্যস্! রোগের মতই ভালবাসা ছেঁকে ধরলে তোমাকে।

যাক্, তিন সপ্তাহ পরে এমার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মালো—পদস্খলনের ঠিক পূর্বাবস্থা যাকে বলে। পদস্খলন অবশ্য আগেই হয়ে যেত, যদি কোথায় পদস্খলন ঘটাবো সেটা আগে ঠিক করে ফেলতে পারতাম। মেয়েটা বাড়ীতে থাকে, সে হোটেলে যেতে একেবারে নারাজ। কি করে যে আমি ব্যবস্থা করব, ঠিক করতে পারি না। অবশেষে আমি মরীয়া হয়ে একদিন রাত্রি এগারোটার সময়ে তাকে এক কাপ চা খাওয়াবো বলে, আমার ঘরে আনার সঙ্কল্প করে ফেললাম। মাদাম কারগারান দশটায় শুয়ে পড়তেন। কাজেই, আমার চাবি দিয়ে দরজা খুলে, আমরা কারুর নজরে না পড়ে, ঘরে ঢুকে দু-এক-ঘণ্টা পরে আবার বার হয়ে যেতে পারতাম।

অনেক সাধ্য-সাধনা, তোষামোদ-খোশামোদের পর এমা আমার ঘরে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে রাজী হল।

দিনটা আমার কাছে মোটেই ভাল ছিল না—মনে আমার একটুও স্বস্তি ছিল না। আমার কেবল ভয়—কোথায় কি জটিলতার সৃষ্টি হয়—কি ঝঞ্ঝাট বেধে যায়—না জানি শেষে না একটা কেলেঙ্কারী ঘটে। সে রাত্রে একটা কাফেতে গিয়ে আমি দু কাপ কফি খেয়ে ফেললাম। আমি মনে সাহস আনবার জন্যে তিনচার গ্লাস কগ্‌নাগ্‌ খেলাম। ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজতে শুনে, আমি আমাদের

সাক্ষাতের জায়গার দিকে অগ্রসর হলাম। সেখানে সে ইতিমধ্যেই এসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। সে আমার হাতটা যেন বেশ তাগিদ দেওয়ার ভঙ্গীতে ধরলে—আমরা আমাদের বাড়ীর দিকে যাত্রা করলাম। বাড়ীর যত কাছে যাই, ততই যেন আমার ভয় করে—মনে মনে ভাবি—যদি ইতিমধ্যেই মাদাম কারগারান শুয়ে না পড়ে থাকেন!

এমাকে তুতিনবার বললাম: সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময়ে কোন শব্দ করো না।

সে হেসে বললে: পাছে কেউ শব্দ শুনে ফেলে, সেজন্য বুঝি তোমার ভয় করছে?

আমি বললাম: না, তবে আমার পাশের ঘরে যে থাকে, তার যদি ঘুম ভেঙে যায়, সেই ভয় হচ্ছে। লোকটি অসুস্থ কিনা!

যখন একেবারে বাড়ীর কাছে এসে গেছি, তখন আমার খুব ভয় করছে—ঠিক যেন দাঁতের ডাক্তারের কাছে দাঁত তোলাতে গেছি। সব জানালাই অন্ধকার। কাজেই সবাই যে ঘুমিয়ে পড়েছে, তাতে আর সন্দেহমাত্র নেই। আমার নিঃশ্বাস সহজ হয়ে এল। চোরের মত সাবধানে দরজা খুললাম, আবার আমার পিছনে দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিলাম। পা টিপে টিপে উপরে উঠতে লাগলাম—নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেশলাই-এর কাঠি জ্বালি, যেন, মেয়েটা আবার পা পিছলে না পড়ে।

বাড়ীওয়ালীর দরজার সামনে দিয়ে যাবার সময়ে মনে হল, আমার বুকে যেন কে মুগুর মারছে। এইভাবে তিনতলা, চারতলা সবশেষে পাঁচতলায় উঠলাম। আমরা ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। জয় আমাদের হয়েছে!

সে যাই হোক, ফিস্ ফিস্ করে কথা বলার মত সাহস যেন এতক্ষণে ফিরে এসেছে। আমি জুতো খুলে ফেললাম, যাতে না শব্দ হয়। একটা স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে চা করলাম—শীঘ্রই চা খাওয়া

হয়ে গেল। তারপর আমি জোর করতে লাগলাম—একটু একটু করে যেন খেলার ছলেই আমি অবশেষে আমার সঙ্গিনীর পোশাক এক এক করে খুলতে লাগলাম। সে বাধা দিতে লাগল, লজ্জায় লাল হতে লাগল, সে কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে পড়ল।

তার গায়ে আর কিছু নেই—শুধু একটা খাটো সাদা শায়া। ঠিক এমনি সময়ে আমার দরজা হঠাৎ খুলে গেল। মোমবাতি একটা হাতে নিয়ে মাদাম কারগারান এসে হাজির। তাঁর শরীরেও ঠিক এমার মত একটা খাটো শায়া।

আমি লাফিয়ে দূরে সরে গেলাম এবং থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম—আমার সামনে দুটি রমণী—তারা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। এবার কি হবে?

আমার বাড়ীওয়ালী বেশ উঁচু গলায় বললেন, এমন গলার স্বর এর আগে আমি কোনদিন শুনিনি :

মঁশিয়ে কার্ভেলেন্, আমার বাড়ীতে বাজারের মেয়ে আনতে আমি দেব না।

আমি তোতলাতে লাগলাম: কিন্তু মাদাম কারগ্যারান, এই মেয়েটি আমার বন্ধু। ও এইমাত্র আমার এখানে এক কাপ চা খাবার জন্যে এসেছে।

: সেমিজ পরে কেউ চা খায় না। দয়া করে একে পত্রপাঠ বিদেয় করে দিন।

এমা উলঙ্গ অবস্থায় ভয়ে কান্না জুড়ে দিলে; শায়ায় মুখ ঢাকলে, এখন কি যে বলব, কি যে করব, তা ঠিক পাই না।

আমার বাড়ীওয়ালী বেশ হুকুমের সুরে বললেন: ওকে জামা-পোশাক পরিয়ে দিন। এখনি বাইরে বার করে দিয়ে আসুন।

এ ছাড়া তখন আর অন্য কি করা যাবে বলো? মেঝে থেকে তার পোশাক খুঁটে তুলে, আমি তার মাথা গলিয়ে পরিয়ে দিয়ে যতটা সম্ভব বেঁধে দিতে লাগলাম। কাঁদতে কাঁদতে সে আমাকে

সাহায্য করতে লাগল—তাড়াতাড়ি বোতামের গর্ত ঠিক করতে পারে না—বাঁধবার দড়ি খুঁজে পায় না—ওদিকে মাদাম কারগারান বাতি হাতে ঠায় দাঁড়িয়ে, বিচারকের মত কঠিন দৃষ্টিতে আমাদের লক্ষ্য করতে লাগলেন।

যেই এমার পোশাক পরা হয়ে গেল, সে জুতোর বোতাম আঁটবার জন্যেও অপেক্ষা করল না, সে বাড়ীওয়ালীর পাশ দিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এল। আমি চটি পায়ে আধা-ন্যাংটা অবস্থায় তার পিছনে পিছনে "মাদমোজেল, মাদমোজেল," বলতে বলতে চললাম।

মনে হল, তাকে কিছু বলা উচিত। কিন্তু কি যে বলব, তা ভেবে পেলুম না! রাস্তায় বেরোবার দরজার কাছে আমি তার নাগাল পেলাম, ত.কে বুকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে সজোরে আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে চাপা ভীত স্বরে বললে: আমাকে ছাড়ো, ছাড়ো বলছি! সে দরজা বন্ধ করে রাস্তায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

উপরে উঠে দেখি মাদাম কারগাবান দোতলায় আমার জন্যে অপেক্ষা কবছেন। আমি ধীরে ধীরে উপবে উঠে গেলাম, সব কিছুর জন্য তখন আমি প্রস্তুত।

তাঁব ঘরেব দরজা খোলা ছিল। তিনি আমাকে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে কঠিন স্বরে বললেন: মঁশিয়ে কার্ভেলেন, আমি আপনার সঙ্গে দু একটা কথা বলতে চাই।

মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকলাম। কুলুঙ্গীতে বাতিটা রেখে মিহি সাদা জ্যাকেটে অর্ধ-অনাবৃত বিশাল স্তনদুটি বাহু দিয়ে চেপে তিনি বললেন:

: তাহলে মঁশিয়ে কার্ভেলেন, আপনি কি ভাবেন যে, আমার বাড়ী একটা নোংরা জায়গা?

তখন লজ্জায় আমার মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে—সব গর্ব আমার চূর্ণ হয়ে গেছে। আমি অস্ফুটস্বরে বললাম: না, না, তা

কেন হবে? কিন্তু মাদাম কারগারান, আপনি রাগ করবেন না; যুবকদের স্বভাব আপনি ত জানেন!

: জানি। এরকম লোক আমার বাড়ীতে আর ঢুকতে দেব না, একথাও আপনি মনে রাখবেন। আমি চাই আমার বাড়ীর সম্মান বজায় থাকুক। বাড়ীর বদ্‌নাম হয়, তা আমি চাই না, আমার কথাটা বুঝেছেন? আমি জানি.........

তিনি এই রকম প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে বকে চললেন; তাঁর বাড়ীর সুনামের কথা শুনতে শুনতে আমি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম। কেন যে তিনি রাগ করেছেন, তা বলে আমাকে পুনঃ পুনঃ ভর্ৎসনা করতে লাগলেন! সেরাত্রে একেবারে পরাজিত, লজ্জিত হয়ে আমি শুতে গেলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম, এরকম পরীক্ষা আর করব না—অন্ততঃ যতদিন আমি মাদাম কারগারানের বাড়ীতে আছি ততদিন ত নয়।

———

## চৌদ্দ

## ॥ স্ত্রীর স্বীকারোক্তি ॥

বন্ধু আমার, আমার জীবনের সবচেয়ে জীবন্ত, সবচেয়ে স্পষ্ট ও স্মরণীয় ঘটনার কথা বলতে আমাকে তুমি অনুরোধ করেছ। এখন অনেক বয়স হয়েছে—এখন আমার কোন আত্মীয় নেই, ছেলেমেয়েও নেই—কাজে কাজেই তোমার কাছে স্বীকারোক্তি করতে আমার কোন বাধা নেই। তবে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে কিন্তু—আমার নাম কখনো প্রকাশ করতে পারবে না।

তুমি জানো যে, আমাকে অনেকে ভালবেসেছিল—আমিও অনেকবার নিজেকে ভালবেসেছি। আজ যখন আমার নিজের সব কিছুই নষ্ট হয়ে গেছে, তখন বলতে বাধা নেই যে, আমি খুব সুন্দরী ছিলাম। আমার আত্মার প্রাণবায়ু ছিল প্রেম। ভালবাসা ছাড়া বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই আমার কাছে কাম্য ছিল। সব সময়ে আমাকে ভালবাসার মত কেউ না থাকলে, আমার আর চলতো না।

মেয়েরা প্রায়ই ভাণ করে, তারা একবারই মাত্র মনপ্রাণ দিয়ে একজনকে ভালবাসে; কিন্তু আমার একবারের ভালবাসা এমন তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, মনে হয়েছিল আমার এই হৃদয়াবেগ বোধহয় কোনদিন মন্দীভূত হবে না। যাই হোক্, সে ভালবাসা স্বাভাবিক-ভাবেই মন্দীভূত হয়েছিল—আগুনে জ্বালানি না দিলে আগুন ত নিভে আসবেই!

আমার জীবনের প্রথম ভালবাসার দুঃসাহসের গল্প আজ বলব। সে ব্যাপারে আমি খুব নির্দোষ ছিলাম। কিন্তু তারপর আরো অনেক প্রেমের আবির্ভাব ঘটে। পেকের ভয়ঙ্কর রাসায়নিকের একটি ভয়াবহ প্রতিহিংসার কাহিনী আমার জীবনে বিভীষিকাময়

নাটকের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে এই নাটক দেখতে হয়েছিল।

এক প্রাচীন ব্রেটন বংশের কোঁৎ হারভে দ্য কার নামক এক ধনী যুবকের সঙ্গে তখন সবে এক বছর আমার বিয়ে হয়েছে। বুঝতেই ত পারছ, তাকে আমি মোটে ভালবাসতাম না। অন্ততঃ আমার বিশ্বাস যে, সত্যিকারের প্রেম যেমন স্বাধীনতা চায়, তেমনি আবার বাধাও চায়। যে বিবাহ আইন অনুমোদন করে, পুরোহিত যাকে আশীর্বাদ করে, আমাদের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেয়, তাকে কি সত্যিকারের প্রেম বলবো? আইনসম্মত চুম্বন কি চুরি করে পাওয়া চুম্বনের মত মিষ্টি? আমার স্বামী ছিলেন ঢ্যাঙা, অমায়িক আর আদবকায়দায় সত্যিকারের ভদ্রলোক। কিন্তু, তাঁর বুদ্ধি ছিল একটু কম। তাঁর কথাবার্তা ছিল কাটাছাঁটা—তাঁর মতগুলো যেন ছুরির ফলার মত গায়ে বিঁধত। তাঁর কথাবার্তা শুনে ধারণা হত যে, তিনি যে সব মতামত প্রকাশ করতেন, তার সবই তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। তাঁকে কখনও ইতস্ততঃ করতে হত না, সব ব্যাপারেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্কীর্ণ মনের প্রস্তাব করে বসতেন—এ মত প্রকাশ করতে তাঁকে বিন্দুমাত্র বিব্রত হতে হত না। তিনি একেবারেই ধারণা করতে পারতেন না যে, এ-সব ব্যাপারে অন্য দৃষ্টিভঙ্গী থাকা সম্ভব। মনে হত, তাঁর মাথাটা একেবারে বদ্ধ ছিল—তার মধ্যে কোন চিন্তাধারা ছিল না। যে সব চিন্তা মানুষের মনকে সঞ্জীবিত এবং সুস্থ করে—সেরকম কোন চিন্তা তাঁর মাথায় কখনও ঢুকত না।

নির্জন একটা শ্যাটোতে আমরা বাস করতাম। বাড়ীটা বড়, কিন্তু কেমন যেন নিরানন্দ। এর চতুর্দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ। সে সব গাছে চাবড়া চাবড়া শ্যাওলা ঝুলতো। বাগানটা আসলে একটা জঙ্গল—এর চারদিকই হা-হা নামে একটা বড় খাল দিয়ে ঘেরা ছিল। এই খালের সুদূর প্রান্তে জলাভূমির কাছে আমাদের

বড় বড় পুকুর ছিল—সে সব পুকুর ছিল নলখাগড়া আর ভাসা ঘাসে ভর্তি। জঙ্গল আর পুকুরের মাঝে একটা নদীর ধারে আমার স্বামীর একটা কুঁড়ে ঘর ছিল। সেখান থেকে বুনো হাঁস শিকার করা যেত।

আমাদের বাড়ীর সাধারণ দাসদাসী ছাড়া একজন জঙ্গলরক্ষক ছিল; এই লোকটা ছিল পশুর মত বর্বর কিন্তু আমার স্বামীর প্রতি অনুরক্ত; আব ছিল, আমাব বন্ধুর মতই একজন চাকরাণী—এই চাকরাণী আমাকে খুব ভালবাসত। পাঁচ বছর আগে আমি তাকে স্পেন থেকে আনিয়েছিলাম। সে তাব বাপ-মা কর্তৃক পরিত্যক্ত। তাব বং আব মাথার চুল কালো, কিন্তু তাব কপালের চারধাবের চুল ছিল কোঁকড়া কোঁকড়া। তখন তার বয়স ষোল, কিন্তু দেখাতো যেন কুড়ি বছবের।

শরৎকাল সবে সুরু হয়েছে। আমবা খুব শিকার করছি—আশ-পাশেব লোকেব জায়গায—কখনও বা আমাদের নিজেদের জায়গায়। এই সময় বাবণ ছ সি নামক এক যুবক খুব ঘন ঘন আমাদেব স্যাটোতে আসতে লাগলেন।

কিছুদিন পবে তাব আসা বন্ধ হল। আমি এ-বিষয়ে আব কোনদিন কোন চিন্তা কাবনি। কিন্তু লক্ষ্য কবতে লাগলাম, আমাব প্রতি আমাব স্বামীব ব্যবহাব যেন ক্রমশঃ বদলাতে লাগল।

মনে হত যে, তিনি কেমন গম্ভীর গম্ভীব—ভাল করে কথা বলেন না—কি যেন ভাবেন, আমি একটু নিরালা থাকবো বলে আলাদা ঘবে থাকতুম—তিনি আমাব ঘবে না আসা সত্ত্বেও, প্রায়ই রাত্রে শুনতাম, কে যেন আমাব দরজাব দিকে আসত এবং পরে আবাব চলে যেত।

আমাব জানালা একতলায় থাকায় প্রায়ই আমার মনে হত, কে যেন স্যাটোর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একথা আমার স্বামীকে জানালাম। তিনি কিছুক্ষণ আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, ও কিছু না; ও বাগানের রক্ষক।

একদিন সান্ধ্যভোজের পর, মনে হল হারভে যেন একটু বেশী মাত্রায় আনন্দিত হয়েছেন। তিনি আমাকে বললেন—বন্দুক নিয়ে ঘণ্টা তিনেক আজ বাইরে কাটালে কেমন হয়? রোজ রাত্রে একটা শেয়াল আমাদের মুরগী খেতে আসে, আজ তাকে মারতে হবে।

খুব অবাক হয়ে গেলাম! আমি একটু ইতস্ততঃ করলাম; কিন্তু তিনি আমার দিকে একদৃষ্টিতে নাছোড়বান্দার মত তাকিয়ে আছেন দেখে, আমি শেষকালে বললাম: বেশ ত, ভালই।

তোমাকে বলে রাখি, আমি পুরুষ মানুষের মতই শিকারে অভ্যস্ত ছিলাম। কাজেই তিনি যে শিকারের কথা আমাকে জানাবেন, তাতে কিছু আশ্চর্য ছিল না।

কিন্তু হঠাৎ আমার স্বামীর কেমন যেন এক অদ্ভুত ভাব লক্ষ্য করলাম। সারা সন্ধ্যা তাঁকে বেশ উত্তেজিত দেখলাম। তিনি একবার উঠছেন, একবার বসছেন—যেন এক বিকারের রোগী।

রাত দশটার সময় তিনি হঠাৎ আমাকে বললেন: তুমি তৈরী?

আমি উঠে দাঁড়ালাম। তিনি নিজে আমার বন্দুকটা আনছেন দেখে, আমি জিজ্ঞাসা করলাম: বন্দুকে কি টোটা ভরা হবে, না ছর্‌রা?

তিনি যেন কিছু আশ্চর্য হলেন, তারপর বললেন: ওঃ, ছর্‌রা; মনটা হাল্‌কা করো—ঐ ছর্‌রাই যথেষ্ট! আরো কিছুক্ষণ পরে তিনি এক অদ্ভুত স্বরে বললেন:

: তোমার অদ্ভুত স্থৈর্য, সত্যিই গর্ব করার মত।

আমি হেসে উঠলাম। পরে বললাম: আমি? হ্যাঁগো? কেন, খেঁক্‌শেয়াল মারতে যাচ্ছি বলে আবার স্থৈর্য? কিন্তু তুমি কি ভাবছ বলতো!

পার্কের মধ্য দিয়ে আমরা নিঃশব্দে চলতে লাগলাম। সমস্ত বাড়ী যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। পুরোনো অন্ধকার বাড়ীটাকে চাঁদের আলো যেন হলদে আভা দিয়ে রাঙিয়ে দিয়েছে। বাড়ীটার শ্লেটের ছাদ

যেন ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলছে। দুটো চূড়োর উপর যেন দুটো আলোর চাদর পাতা; রাত্রি পরিষ্কার, মধুর কিন্তু ম্লান ও নিস্তব্ধ—যেন মৃত্যুর ফাঁদ পাতা হয়েছে। এক ছিটে বাতাস নেই—একটা ব্যাং ডাকছে না, একটা প্যাঁচার শব্দ শোনা যায় না—সব কিছুর উপর যেন একটা বিষাদ-মলিন অবসন্নতা। পার্কে এসে যখন উপস্থিত হলাম, তখন যেন আমাদের মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠল—ঝরাপাতার গন্ধ পার্কে এল। আমার স্বামী কোন কথা বলেন নি, তবে তিনি যেন কি শুনছিলেন, কি যেন লক্ষ্য করছিলেন। শিকারের নেশায় নেশাতুর হয়ে তিনি ছায়ার মধ্যেও কিসের যেন গন্ধ পাচ্ছিলেন।

শীঘ্র আমরা পুকুরের ধারে এসে পৌঁছলাম। তার মধ্যে যে সব ঘাসের জঙ্গল ছিল, তা নিশ্চল—এক ঝলক হাওয়াও বয়ে গেল। জলের মধ্য দিয়ে মৃদু গতিতে হাওয়া বইছিল। জলের উপরটা যেন মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল—ঢেউ-এর বৃত্ত ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছিল। যেন কতকগুলো দাগ ক্রমশঃ বড় হচ্ছিল।

আমরা ওৎ পেতে বসে থাকবার জন্য কুঁড়ে ঘরের কাছে এসে পৌঁছলাম। আমার স্বামী আমাকে প্রথমে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর তিনি তাঁর বন্দুকে গুলি ভরে নিলেন। শুকনো বারুদের চট্‌পট্ শব্দ আমার মনে এক অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করল। আমি ভয়ে কেঁপে উঠছি দেখে, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: এই পরীক্ষা কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট মনে হচ্ছে। যদি হয়, তবে তুমি ফিরে যাও।

আমি ভারী আশ্চর্য হয়ে গেলাম; বললাম: একেবারেই না। আজ তোমার সবই কিন্তু আমার কাছে কেমন যেন অদ্ভুত অদ্ভুত মনে হচ্ছে! এসেছি যখন, তখন কিছু না করে আমি ফিরতে চাই না।

সে অস্ফুটস্বরে বললে: তোমার যা ইচ্ছে।

আমরা সেখানে স্থিরভাবে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আধ ঘণ্টা কেটে যাবার পর, চন্দ্রালোকিত শারদীয় রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতা যখন কোন শব্দেই সে বিচলিত হল না, তখন আমি

মৃদুস্বরে তাঁকে বললাম: তুমি কি ঠিক জানো যে, সে এই পথ দিয়ে যায়?

হারভে কুঁকড়ে গেল—আমার কথা যেন তার গায়ে বিঁধল, তার মুখ আমার কানের কাছে এনে সে বল্লে: সে বিষয়ে কোন ভুল নেই, আমি নিশ্চিত করে বলছি।

আবার সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

আমার বিশ্বাস, আমার ঢুল এসেছিল, এমন সময়ে আমার স্বামী আমার হাতে চাপ দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললে:

.ঐ যে গাছের তলায় তাকে দেখতে পাচ্ছ কি?

আমি তাকালাম, কিন্তু কৈ কিছু দেখা যায় না। আমি কোন কিছু ঠাহর করতে পারলাম না। এবার হারভে ধীরে ধীরে বন্দুকের নল দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল—সমস্ত সময় সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি নিজেও গুলি করবার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম, এমন সময়ে হঠাৎ ত্রিশ কদমের মধ্যে স্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখা গেল, একটা লোক সামনের দিকে ঝুঁকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে। সে যেন পালাবার চেষ্টা করছে, বলেই আমার মনে হল।

আমি ভীষণ ভড়কে গেলাম। ভীষণ চীৎকার করে উঠলাম কিন্তু আমি ঘুরে দেখবার আগেই আমার চোখের সামনে একটা আলো ঝলসে উঠল; বন্দুকের শব্দে আমার কানে যেন তালা লেগে গেল। আমি দেখলাম, ঠিক যেন একটা নেকড়ে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ে, লোকটাও ঠিক সে রকম মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

আমি ভয়ে চেঁচাতে লাগলাম। তখন ক্রুদ্ধ হারভে আমার গলা টিপে ধরল। সে আমাকে এক ঝট্‌কায় মাটিতে ফেলে দিলে, তারপরই আমাকে তুলে নিয়ে চললো। ঘাসের উপর যেখানে মৃতদেহটা পড়েছিল, সেখানে এনে সে আমাকে তার উপর সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। এতে আমার মাথা ফেটে যাক, এই ছিল তার উদ্দেশ্য।

আমার মনে হল, আমার দফা রফা করে, সে এবার আমাকেও মেরে ফেলবে। সে পা তুলে আমার মাথায় লাথি মারতে যাবে, ঠিক সেই সময় কে যেন তাকে ধাক্কা দিলে। কি যেন ঘটে গেল, আমি তখনো ঠিক বুঝতে পারিনি।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম, আমার চাকরাণী আমার স্বামীর উপরে হাঁটু গেড়ে বসে বুনো বেড়ালের মত তাকে আঁকড়ে ধরেছে—সে মুঠো করে তার দাড়ি, গোঁফ ধরে টানছে এবং সজোরে মুখ খিম্‌চে দিচ্ছে।

তারপর কি যেন ভেবে চাকরাণী সহসা উঠে দাঁড়াল এবং সেই মৃতদেহটার উপর আছড়ে পড়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে তার চোখে, তার মুখে চুমু খেতে লাগল, ঠোঁট দিয়ে তার অসাড় ঠোঁট খুলে সে নিঃশ্বাস বইছে কিনা অনুভব করতে লাগল। যেন তার দীর্ঘস্থায়ী প্রেমচুম্বন আর থামতে চায় না!

এতক্ষণে আমার স্বামী সমস্ত ব্যাপার বুঝে উঠে দাঁড়াল এবং একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। সে সবই বুঝতে পারলো; তখন সে আমার পায়ে পড়ে বললে: আমাকে ক্ষমা করো, প্রিয়তমে! আমি তোমাকে সন্দেহ করেছিলাম, তাই এই মেয়েটির প্রেমিককে হত্যা করেছি। আমার বাগান-রক্ষকটাই আমাকে ঠকিয়েছে।

কিন্তু আমি তখন সেই মৃত পুরুষ ও জীবিতা মেয়েটির প্রেমচুম্বন লক্ষ্য করছিলুম—আহা! মেয়েটির কি কান্না! কি কাৎরানি—প্রেমের কি নিষ্ঠুর বিলাপ!

সেই মুহূর্তে আমার মনে হল যে, আমিও আমার স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি।

———

## পনের

## বয়তেল্‌

পেরে বয়তেল্‌ সাফ করার কাজে যে একজন বিশেষজ্ঞ, দেশের সকলেই তা জানত। কোন নর্দমা, গোবরের গাদা বা মাটির তলায় জল-নিষ্কাশনের পথ পরিষ্কার করার দরকার পড়লেই, লোকে তাকে ডেকে কাজ দিত।

রাত্রে পাহারাওলার টুপী পরে, যন্ত্রপাতি নিয়ে, পাঁকভর্তি কাঠের জুতো পায়ে দিয়ে সে কাজে লেগে যেত। কাজ করতে করতে কেবল গজ্‌গজ্‌ করত—কেবল এই ঘৃণ্য কাজের নিন্দে করত। লোকে যখন জিজ্ঞাসা করত, তবে এই কাজ করো কেন, তখন সে বেশ শান্তভাবে বলত: হায় ভগবান, এ আমার ছেলেমেয়েদের জন্যে করছি, তাদের মুখে দুটো দানা দিতে হবে ত! এ কাজে আমার বেশ রোজগার হয়।

বাস্তবিকই তার ছেলেপুলে সবশুদ্ধ চৌদ্দজন। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত তাদের কি হ'ল? সে নির্লিপ্তভাবে জবাব দিত: বাড়িতে মোটে আট জন আছে। একজন চাকরি করতে বেরিয়েছে, আর পাঁচজনের বিয়ে হয়ে গেছে।

যখন কেউ জিজ্ঞাসা করত, তাদের ভাল ঘরে বিয়ে হয়েছিল কিনা, সে উৎসাহের সঙ্গে বলতো: আমি তাদের বাধা দিইনি। কোন কাজে আমি তাদের বাধা দিইনি। তাদের পছন্দমত তারা বিয়ে করেছে। লোকের পছন্দের বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়; তাতে ফল খারাপ হয়। আমি রাত্রে গরুর গাড়ী চালাই কেন জানো—আমার বাপ-মা আমার ইচ্ছায় বাধা দিয়েছিলেন। তা না হলে, অন্য সকলের মত আমি মজুরী খেটে খেতাম।

এইভাবে তার বাপ-মা তাকে তার ইচ্ছায় বাধা দিয়ে অন্য বিষয়ে ঘুরিয়ে এনেছিল। সে সময়ে সে হেভার-এ এক সৈনিকের কাজ করছিল—সে ছিল সাদাসিধে লোক। ছুটির সময় সে জাহাজ-ঘাটায়

ঘুরে বেড়াতে ভালবাসত—এটা তার নেশার মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখানে যত রাজ্যের পাখী এসে জুটত। কখনও একলা কখনও বা তার দেশের অন্য কোন সৈনিককে নিয়ে সে পাখীর খাঁচাগুলোর ধার দিয়ে ধীরে ধীরে পাইচারী করে বেড়াতো। হলদে-মাথা, সবুজ-ঠোঁট টিয়া পাখী আসত আমাজনের তীর থেকে; সেনেগাল থেকে আমদানি হত লাল-মাথা আর ধূসর-পিঠওলা টিয়া পাখী; বড় বড় ম্যাক। আহা! তাদের পালখগুলো যেন ফুলের মত নরম—তাদের মাথার ঝুঁটি, পাখা সব যেন ভগবান নিজে হাতে অশেষ যত্নে ধীরে ধীরে রং করেছেন—এ ছাড়া পাখীর ছানাগুলো কতক নীল, কতক হল্‌দে, কতক নানা রং-এর। খাঁচার মধ্যে লাফাতে লাফাতে নানারকম সুর করে তারা ডাকতো। চতুর্দিকে জাহাজ থেকে মাল নামানো ও ওঠানোর মিলিত চিৎকারের সঙ্গে মিশে যেন কানা তালা লাগিয়ে দিত।

বয়তেল নিষ্প্রভ চোখে, মুখ হাঁ করে দেখত, কখনো কাকাতুয়া দেখে খুশীতে মসগুল হয়ে মুখ ভেংচাতো আর সব বন্দী কাকাতুয়া তার লাল জামা আর পেতলের বেল্টের দিকে তাকিয়ে তাদের শাদা-হলদে ঝুঁটি ওঠাতো আর নামাতো। যে সব পাখী পড়তে পারে, সে রকম পাখী পেলে সে তাদের প্রশ্ন করত। পাখীটা যদি উত্তর দিত, তবে সে পরম তৃপ্ত হয়ে, আনন্দ করে রাত্রি পর্যন্ত তার সঙ্গে কথাবার্তা চালাতো। এ ছাড়া বাঁদরগুলো দেখলে ত তার আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা থাকত না—তার মনে হত, বড় লোকদের পক্ষে কুকুর-বেড়াল পোষার মতই বাঁদর পোষা না জানি কত বিলাসের লক্ষণ। তার রক্তে বিদেশী অজানার প্রতি একটা সহজ আকর্ষণ সে অনুভব করত। কারো কারো যেমন শিকারের সখ, ডাক্তারির সখ, পুরোহিত-বৃত্তির সখ—বয়তেলের ছিল তেমনি এই সখ। সৈন্য-ব্যারাকের দরজা খুললেই কে যেন তাকে এই জাহাজ-ঘাটার দিকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেত।

একবার এক বড় ময়ূরের সামনে দাঁড়িয়ে আনন্দে সে অধীর হয়ে, তার পেখম ধরা এবং বন্ধ করা দেখছিল। এমন সময়, সে দেখলে পাখীওয়ালার দোকানের পাশে একটা সরাইখানার দরজা খুলে গেল। আর একটি নিগ্রো কুমারী মেয়ে মাথায় সিল্কের রুমাল বেঁধে বাড়ীর ধূলো-ময়লা রাস্তায় ফেলছে।

এই সময় থেকে তার নজর পাখী ও নারী উভয়ের মধ্যে হারিয়ে গেল—তারপর থেকে সে পাখী বা সেই নারী কাকে দেখে বেশী আশ্চর্য হত, আর আনন্দ পেত, তা ঠিক সে বলতে পারতো না।

সরাইখানার ময়লা ঝাঁট দিয়ে ফেলে নিগ্রো মেয়েটি চোখ তুলে তাকালো আর সেও সৈনিকের পোষাক দেখে অবাক হয়ে গেল। ঝাঁটা হাতে করে সৈনিকের সামনে সে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল—যেন সে সৈনিকের সঙ্গে আলাপ করছে। ওদিকে, পাখীর কসরৎ চলতে লাগল। খানিক পরে সৈনিকটির কেমন বাধো-বাধো লাগতে—সে চলে গেল কিন্তু ধীরে ধীরে অনিচ্ছায়, আবার সে ফিরে এল। সেই ঔপনিবেশিক সরাইখানার সামনে দিয়ে সে রোজ যাতায়াত সুরু করে দিলে। সে প্রায়ই দেখত, বন্দরের খালাসি ও নাবিকদের সেই মেয়েটি গেলাস ভর্তি করে মদ ঢেলে দিচ্ছে। তাকে দেখে নিগ্রো মেয়েটি প্রায়ই বাইরে বেরিয়ে আসত। তাদের মধ্যে একবারও মৌখিক আলাপ হয়নি—তবুও যেন চেনালোকের মতই তারা হাসি বিনিময় করত। মেয়েটির কালো ঠোঁট দুটির ফাঁক দিয়ে সহসা শাদা ঝক্‌ঝকে দাঁতের সারি দেখে বয়তেলের হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠতো! একদিন মরীয়া হয়ে বয়তেল্‌ সরাইখানায় ঢুকে পড়লো। মেয়েটি ফরাসী ভাষায় কথা বলতে পারে দেখে, সে খুব অবাক হয়ে গেল। মেয়েটি এক গ্লাস লেমনেড চেয়েছিল—সেই লেমনেডের মধুর স্মৃতি সৈনিকটির মনে বহুদিন স্থায়ী হয়েছিল। সেই থেকে বয়তেল্‌ এই সরাইখানায় নিত্য এসে এখানকার সুস্বাদু পানীয় আস্বাদ করতে লাগল।

এই সুখ সমস্ত দিন সৈনিকের এক আনন্দময় চিন্তা হয়ে থাকত। নিগ্রো মেয়েটি কালো হাত দিয়ে বোতল থেকে পানীয় ঢালছে আর তার চোখ দুটিব চেয়েও উজ্জ্বল ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলো হাসি-ভরা মুখ থেকে দেখা যাচ্ছে। এইভাবে দুমাস পরস্পবের সঙ্গে দেখা হবার পর, তারা বন্ধুত্বসূত্রে নিবিড়ভাবে বাঁধা পড়ে গেল। বয়তেল্‌ কিছুদিন পরে বেশ বুঝতে পারল যে, এই নিগ্রো মেয়েটি গুণে সে-দেশের ভালো ভালো মেয়েদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। মেয়েটি খাটিয়ে, হিসেবী, ধর্মভীরু এবং সৎস্বভাবা—এজন্য তাকে সে বেশী করে ভালবাসতে লাগল—মেয়েটি তাকে এতদূব অভিভূত করে ফেলল যে, সে একদিন তাকে বিয়ের প্রস্তাব করে বসল।

তার মনের কথা মেয়েটির কাছে খুলে বলতে, মেয়েটিও আনন্দে নেচে উঠলো। সে জানলো যে, তাব কিছু টাকা আছে। এক ঝিনুক-ব্যবসায়ী তাকে মানুষ করে এবং সে-ই এই টাকা তাকে দিয়ে গেছে। হেভারের জাহাজ-ঘাটায় একজন আমেবিকান ক্যাপ্টেন শিশু অবস্থায় তাকে ফেলে দিয়ে যায়—সেই থেকে ঝিনুক-ব্যবসায়ীটি তাকে মানুষ করে। নিউয়র্ক থেকে জাহাজ ছাড়াব কয়েক ঘণ্টা পরে ক্যাপ্টেন তার জাহাজের খোলেব মধ্যে তূলোব গাঁটের উপর দেখে কে যেন মেয়েটিকে শুইয়ে দিয়ে গেছে। তখন তার বয়স ছ বছর। হেভারে পৌঁছে ক্যাপ্টেন এই কালো মেয়েটিকে ঝিনুক-ব্যবসায়ীর কাছে নিয়ে যায়। কে তাকে জাহাজের মধ্যে রেখে গিয়েছিল, ক্যাপ্টেন তা সন্ধান পায়নি।

ঝিনুক-ব্যবসায়ী মারা গেলে, ঔপনিবেশিক সরাইখানায় মেয়েটি চাকরাণীর কাজ নেয়।

এন্তইন বয়তেল্‌ বল্লে: এ বিয়েতে যদি আমার বাপ-মা আপত্তি না করে, তবে খুব ভালোই হবে। কেননা, তাদের কথার বিরুদ্ধে আমি কিছুতেই যেতে পারব না, বুঝলে! এবার দেশে গিয়েই, আগে তাদের কাছে আমি কথাটা পাড়ব।

পরের সপ্তাহে একদিনের ছুটি পেয়ে সে বাড়ী চলে গেল। ইভেতোতের কাছে তুর্‌তেভিলে তার বাপ-মা খানিকটা জমি নিয়ে একটা খামার করেছিল।

খাওয়া-দাওয়া যতক্ষণ না শেষ হল, ততক্ষণ সে একথা উত্থাপন করল না। খাওয়ার পর কফি ও মদ পরিবেশন হবার পর, যখন তার মন একটু দিল্‌খোলা হল, তখন সে তার বাপ-মাকে জানালো যে, একটি মেয়েকে তার খুব পছন্দ হয়েছে—তার সঙ্গে তার মনের খব মিল। তেমন মেয়ে দুনিয়ায় আর পাওয়া যাবে না বলে তার মনে হয়।

বুড়োবুড়ী এ কথা শুনেই কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। তাকে নানা প্রশ্ন করতে লাগ্‌ল! বয়তেল্‌ মেয়েটির রং ছাড়া আর কোন কথা গোপন করল না।

তার তেমন সঙ্গতি নেই, চাকরাণীর কাজ করে, কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল। হিসেবী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বেশ ভদ্র এবং খুব বিবেচক। মেয়েদের হাতে টাকা থাকার চেয়ে এসব গুণ থাকা ভাল বলে তার ধারণা। তবে হ্যাঁ, যে মহিলা তাকে মানুষ করেছে, সে তাকে কিছু দিয়ে গেছে—তা প্রায় পনের শ ফ্রাঁ—সে টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে। বুড়োবুড়ী তার কথাবার্তা শুনে প্রায় তাদের অনুমোদন জানাবেন, এমন সময়ে সে আসল কথাটা পাড়ল—একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে সে বললে: একটা জিনিষ আছে, যা হয়ত তোমাদের পছন্দ হবে না—মেয়েটি কিন্তু ফর্সা নয়।

তারা এ কথার অর্থ বুঝতে পারলে না; তাকেই বুঝিয়ে দিতে হল; কিন্তু একেবারে দুম্‌ করে ত কথাটা বলা যায় না—তাতে হয়ত তাদের মনে দারুণ ধাক্কা লাগ্‌তে পারে! সে বললে, ময়লা রং-এর যে সব মানুষ পৃথিবীতে আছে, তাদের মডেল্‌ এপিনালের কোন একজিবিসনে দেখানো হয়েছিল—সে সেই জাতের মেয়ে।

একথা শুনে তারা আরো উৎকণ্ঠিত হল—ভড়কে গেল—তাদের রীতিমত ভয় ধরে গেল—সে কি শয়তানের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করছে নাকি!

মা বললে: কালো? কতখানি কালো? সবটাই কি?

সে বললে: নিশ্চয়ই। যেমন তুমি সবটাই সাদা, সেও তেমনি সবটাই কালো।

বাপ বললে: কালো? ঐ হাঁড়ীর মতো কালো নাকি?

ছেলে বললে: না, ঠিক এরকম নয়, ওর চেয়ে একটু কমই হবে। কালো, তবে একেবারে খারাপ নয়।

বাপ বল্লে: তার দেশে সে ছাড়া আরো কালো লোক আছে কি?

ছেলে বললে: নিশ্চয়ই।

বুড়ো মাথা নেড়ে বললে: এ সুবিধে হবে কি?

ছেলে বললে: অসুবিধের কিছুই নেই, শীগ্রি অভ্যাস হয়ে যাবে।

মা জিজ্ঞাসা করলে: কালো রং লেগে জামা-কাপড় কালো হয়ে যাবে না ত!

: তা কেন হবে? সে ত খাঁটী স্বাভাবিক রং।

তারপর অনেক কাথাবার্তা হল। ঠিক হল যে পাকা কথা দেবার আগে তার বাপ-মা আগে তাকে দেখবে। এক মাসের মধ্যে সৈনিকের চাকরি শেষ হলে, সে তাকে বাড়ীতে আনবে: তখন পরীক্ষা করে দেখা হবে যে, বয়তেল্-পরিবারে ঢোকবার পক্ষে তার রং খুব কালো বলে কোন বাধা হবে কিনা।

এন্তইন বলে গেল যে, ২২শে মে রবিবার থেকে তার ছুটি হয়ে যাচ্ছে—ঐ দিন সে তার মনোনীতা স্ত্রীকে নিয়ে তুরতেভিলের দিকে রওনা হবে।

প্রিয়তমের বাড়ীতে যাবার জন্যে মেয়েটি তার সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে জম্কালো পোষাক পরল। হল্‌দে, নীল আর লাল রংয়ের

প্রাধান্য তাতে বেশী। তাকে দেখে মনে হতে লাগল যে, কোন জাতীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য সে তৈরী হয়েছে।

হেভার ছেড়ে যখন তারা তুরতেভিলের দিকে যাবে, তখন লোকে তাদের বড্ড বেশী লক্ষ্য করতে লাগল—যার দিকে এত লোক তাকাচ্ছে, তার হাত ধরে চলতে বয়তেলের ভারী গর্ব হচ্ছিল। তারপর যখন, তারা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে চাপ্‌ল, তখন সে বয়তেলের পাশে বস্‌ল! আশ-পাশের কামরা থেকে লোক দাঁড়িয়ে উঠে মেয়েটিকে দেখ্‌তে লাগল—কাঠের পার্টিশনের উপর দিয়ে শত শত চক্ষু নিগ্রো মেয়েটিকে পরমাশ্চর্য বস্তুর মত দেখতে লাগল। একটি ছোট ছেলে তাকে দেখে ভয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠল—আরেকটি মেয়ে মায়ের পোষাকের তলায় মুখ লুকোলো। গন্তব্য স্থানে পৌঁছানো পর্যন্ত সব এক রকম ভালয়-ভালয় গেল। কিন্তু ইভেততের কাছে এসে ট্রেণের গতি যখন মন্দীভূত হয়ে এল—তখন এন্তইনের মনে বড় অস্থিরতা দেখা দিল। গাড়ীর কামরা থেকে মুখ বাড়িয়ে সে দেখলে যে, তার বাবা একটা ঘোড়ার গাড়ীর লাগাম ধরে বসে আছে, আর তার মা রেলিং-ঘেরা প্লাট্‌ফরমের ধারে অনেক লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে।

সে প্রথমে নাম্‌ল—তারপর হাত ধরে তার ভাবী বৌকে নামাল—তারপর সিধে গট্‌গট্‌ করে তাদের দিকে এগিয়ে চললো।

তার মা এই কালো মেয়েটির এবং তার রং-চংএ পোষাক দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল—তার মুখের কথা যেন হারিয়ে গেছে। এদিকে ইঞ্জিন বা সেই নিগ্রো মেয়েটিকে দেখে গাড়ীর ঘোড়া এমন লাফালাফি জুড়ে দিলে যে, এন্তইনের বাপ তাকে সামলাতে একেবারে নাজেহালের একশেষ। এন্তইন বাপ-মাকে দেখার আনন্দে দু হাত প্রসারিত করে তাদের আলিঙ্গন করতে এগিয়ে গেল এবং প্লাট্‌ফরমের লোকজন হাঁ করে লক্ষ্য করছে দেখে, সে তার সঙ্গিনীর দিকে ফিরে বললে :

এই যে সে! তোমাদের ত বলেইছিলাম প্রথমে তাকে দেখলে অদ্ভুত বলে মনে হবে। কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ হলে বুঝবে, পৃথিবীতে তার জুড়ি নেই। আর খুঁতখুঁত না করে তাকে ডাকো—তাকে অভ্যর্থনা করো।

এতে মেরী বয়তেল্, ভয়ে থতিয়ে গিয়ে তাকে কোনরকমে অভ্যর্থনা করলে আর বয়তেলের বাবা টুপী উঠিয়ে বললে: তোমার কল্যাণ হোক্!

তারপর আর দেরী না করে তারা গাড়ীতে উঠে পড়ল! পিছনের সিটে বস্‌ল মেয়েরা আর সামনের সিটে বস্‌ল বয়তেল্ আর তার বাবা। ঝাঁকানি খেতে খেতে গাড়ী চলতে লাগ্‌ল।

কারো মুখে কোন কথা নেই; এন্তইন খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগ্‌ল—সে শিস্ দিয়ে ব্যারাকের একটা গানের গৎ বাজাতে লাগ্‌ল; তার বাবা একমনে ঘোড়াকে চাবুক মারতে লাগ্‌ল। বয়তেলের মা কোণ থেকে আড়ে-আড়ে নিগ্রো মেয়েটিকে দেখতে লাগ্‌ল—মেয়েটির চিবুক ও কপাল পালিশকরা জুতোর মত যেন চক্‌চক্ করছে!

এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করবার জন্যে এন্তইন পিছন ফিরে বললে: বেশত! কেউ যে কথা বলতে চাইছে না!

তার মা বললে: সময়ে সব হবে—একেবারে নতুন কিনা!

এন্তইন বল্লে: বেশ, তা হলে আমাকে তোমার সেই মুরগীর গল্পটা বলো— সেই যেটা আটটা ডিম পেড়েছিল।

এ বাড়ীতে এটি একটি অনেক কালের পুরোনো গল্প। কিন্তু তার মা তখনো গুম্ হয়ে রইল, কাজেই এন্তইনই কথা কইতে লাগল। সে হাসতে হাসতে তার গল্প সুরু করলে। এ কথা ত তার বাপের শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে—তবুও গল্প সুরু হতেই তার বাপ মুখখানি হাসি-হাসি করে তুলল—তার মাও মনের ভাব কতকটা ঝেড়ে ফেললে আর নিগ্রো মেয়েটি গল্পের সবচেয়ে মজার অংশে এসে এমন জোরে হেসে উঠল যে, ঘোড়া চার পা তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো।

এইভাবে তাদের প্রথম আলাপের ভূমিকা কাটল! তারপর সকলে নানা গল্প করতে লাগল।

বাড়ী পৌঁছে সকলে গাড়ী থেকে নামলে, এস্তইন তার ভাবী বৌকে তার ঘরে নিয়ে গেল—এখন সে পোষাক ছেড়ে ফেলবে, নইলে পোষাক ময়লা হয়ে যাবে। এরপর সে ভাল ভাল খাবার রেঁধে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে খাইয়ে তাদের মন নরম করবে।

এস্তইন তার বাপ-মাকে একধারে ডেকে দুরুদুরু বক্ষে জিজ্ঞাসা করলে: কেমন, এবার তোমাদের মত কি?

বাপ কিছু বললে না। মার অত ভয় নেই, বললে: বড্ড কালো! না বাপু, এত কালো মেয়ে আমার পছন্দ নয়—আমার রক্ত যেন জমে আসছে!

: হতে পারে; কিন্তু ও সাময়িক ব্যাপার।

তারপর তারা বাড়ীর মধ্যে গেল। এখানে এসে নিগ্রো মেয়েটিকে রান্না করতে দেখে মায়ের প্রাণ যেন নরম হল।

তাকে সাহায্য করবার জন্য মা এগিয়ে এল। মা কোমরে দড়ি করে শক্ত বাঁধল—এখনও সে বেশ শক্ত আছে।

অনেক রকম রান্না হল—আর সব খাবার খুব সুস্বাদু। আরেকবার সুযোগ পেয়ে এস্তইন তার বাপকে বললে: বাবা, এবার কি বলো?

কিন্তু ধূর্ত কৃষক যেন কিছুতেই সামঞ্জস্য করবে না, এইভাবে সাবধানে উত্তর দিলে: এতে আমার নিজের কোন মতামত নেই। তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করো।

এস্তইন মায়ের কাছে গেল। তাকে ঘরের এক কোণে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে: আচ্ছা মা, ওর সম্বন্ধে তাহলে তুমি কি ঠিক করলে?

: দেখ বাছা! সত্যি-সত্যি মেয়েটা কালো—আর একটু যদি কম কালো হত, তাহলে আমি অমত করতাম না—কিন্তু এ যেন একেবারে অচল—একে দেখে আমার যমের কথা মনে হয়, বাপু!

সে আর পীড়াপীড়ি করল না। সে জানত তার মা ভীষণ একগুঁয়ে। তার মন হতাশায় মুষড়ে পড়ল। তার মনের মধ্যে এক বিক্ষুব্ধ তুফান উঠল। তখন যে কি করবে—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই চিন্তা, তার মনের মধ্যে পাক খেয়ে বেড়াতে লাগল—কি উপায়ে সে তাদের রাজী করবে। তার ভারী আশ্চর্য মনে হতে লাগল যে, যে-মেয়ে তাকে অত সহজে ভুলিয়ে দিলে, সে কেন তার বাপ-মাকে ভোলাতে পারল না! তারা এবার ক্ষেতের দিকে বেড়াতে গেল—চারজনের কারো মুখেই কোন কথা নেই। একটা বেড়ার কাছে পার হবার উঁচু সিঁড়ি দেওয়া পথ, সেখানে একজন গ্রাম্য লোক বসেছিল—একদল ছেলে সেই উঁচু পথের উপর উঠে তাদের দিকে তাকাতে লাগল। বয়তেল্ যে কালো মেয়েকে এনেছে, তাকে দেখবার জন্যে দলে দলে লোক রাস্তায় বের হয়ে আসতে লাগল। ঢেঁড়া দিলে যেমন লোক পিল্‌পিল্ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে, তেমনি বহু দূর দূর থেকে লোক এসে জমতে লাগল!

পেরী ও মেরী বয়তেল্ লোকের এই কৌতূহল দেখে হন্ হন্ করে এগিয়ে চলতে লাগল। বয়তেল্ ও নিগ্রো মেয়েটি পেছিয়ে পড়লো। নিগ্রো মেয়েটি এই অবকাশে বয়তেলকে জিজ্ঞাসা করলে: তোমার বাপ-মার মত কি বুঝছ?

ইতস্তত: করে বয়তেল্ বলে: তারা এখনও কোন মত ঠিক করতে পারেনি।

মাঠে কিন্তু উত্তেজিত জনতা ভীড় করে দাঁড়াল। তারা এক এক জায়গায় জটলা করছে দেখে, বয়তেল-কর্তা বাড়ীর দিকে সট্‌কান দিল। এস্তইন ক্রুদ্ধ হয়ে তার প্রিয়তমার হাত ধরে তাদের বিস্ফারিত চোখের সামনে দিয়ে গট্‌গট্ করে এগুতে লাগল।

সে বেশ বুঝলে যে, এ পর্বের এই শেষ—তার কোন আশা নেই। এই নিগ্রো রমণীকে বিয়ে করা তার ভাগ্যে নেই—মেয়েটিও সে কথা বুঝতে পারলো। বাড়ীর কাছে এসে তারা দুজনেই কেঁদে ফেল্‌লে।

বাড়ী এসে মেয়েটি পোষাক ছেড়ে মাকে তার ঘরের কাজে সাহায্য করতে গেল—আস্তাবল, গোয়াল, মুরগীর ঘর—সব কাজই সে মায়ের হাত থেকে কেড়ে করতে লাগল !

ঃ আমি করছি মা, আমাকে ছেড়ে দিন।

মায়ের প্রাণ গল্‌ল, কিন্তু তবুও তার মত বদলালো না। রাত্রে ছেলেকে বললে ঃ মেয়েটি ভাল, কিন্তু হলে কি হবে, একেবারে নির্ভাজ কালো, একেবারে মিশ্‌কালো। এত কালো আমি তাকে বরদাস্ত করতে পারবো না, বাপু। ও ফিরে যাক্‌—বড্ড কালো—বিশ্রী কালো।

বয়তেল্‌ তার প্রেয়সীকে বললে ঃ মা মত দেবে না। আমি তোমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসবো। এ নিয়ে ভেবোনা—মনে কষ্ট কোরো না। তোমাকে রওনা করে দিয়ে এসে আমি ওদের সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ কববো।

তাকে আশা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, তাকে চুমু খেয়ে সে গাড়ীতে তুলে দিলে। গাড়ী যতক্ষণ দেখা গেল, সে জলভরা চোখে গাড়ীর দিকে তাকিয়ে রইল।

বুড়ো-বুড়ীকে সে কত সাধ্য-সাধনা করল, কিন্তু বৃথা। তারা মত দিল না।

এই গল্প এ দেশেব সবাই জানে। এ গল্প বলে এস্তইন মন্তব্য করতো ঃ সেই দিন থেকে আর কোন কিছুতেই আমার মন নেই—না, কোন কিছুতেই না। কোন ব্যবসা আমি করতে পারলুম না—কাজেই এখন যা করছি এই কাজ ধরলাম—রাত্রে ময়লা সাফ করা।

লোকে তাকে বলত, কিন্তু তুমি বিয়ে করেছ !

ঃ হ্যাঁ, তা করেছি। বৌ আমাকে যে খুশী করতে পারে নি, একথা বলতে পারি না ! আমার চৌদ্দটা ছেলেমেয়ে। কিন্তু এ বউ তার মত নয়—নিশ্চয়ই না! সেই মেয়েটি, বুঝলে ? সেই নিগ্রো মেয়েটি একবার আমার দিকে তাকালে মনে হত, যেন আমি স্বর্গে এসেছি—আহা !

———

## ষোল

## ॥ তারপর ॥

ঃ বাছারা, এবার শুতে যাও। কোঁতেস্ বললেন।

তিনটি শিশু—ছুটি মেয়ে আর একটি ছেলে—তারা উঠে তাদের ঠাকুরমাকে চুমু খেতে গেল।

তারপর তারা ম'শিয়ে লে কুরেকে শুভরাত্রি জানালো। এই স্যাটোতে ইনি প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে বেড়াতে আসেন।

মঠবাসী ম'তুইৎ তাঁব কোলের উপর শিশুদের বসিয়ে তাদের গলা জড়িয়ে মাথা তাঁর কাছে টেনে এনে স্নেহে তাদের কপালে চুমো খেলেন। তাবপব তাদের কোল থেকে মেঝেতে নামিয়ে দিলেন। ছেলেটি আগে, মেয়ে ছুটি পিছনে চলে গেল।

কোঁতেস্ বললেনঃ ম'শিয়ে লে কুরে, আপনি ত ছেলেদের খুব ভালবাসেন, না?

ঃ খুব ভালবাসি।

বৃদ্ধা বড় বড় চোখ তুলে পুরোহিতের দিকে তাকালেন।

ঃ আপনার খুব একা-একা লাগে না মাঝে মাঝে?

ঃ তা, কখনও-কখনও লাগে বৈকি!

তিনি খানিক নীরব হয়ে রইলেন। একটু ইতস্ততঃ করলেন; তারপর বললেনঃ কিন্তু সাধারণলোকের মত জীবনযাপন করতে আমি অভ্যস্ত নই।

ঃ সাধারণলোকের জীবনসম্বন্ধে আপনার কি অভিজ্ঞতা আছে?

ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ! সে সব আমার খুব ভালভাবেই জানা আছে। আমি পুরোহিত হবার জন্যে চেষ্টা করেছিলাম—সেই পথেই আমি চলেছি।

কোঁতেস্ একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন : মঁশিয়ে লে কুরে, সত্যি করে বলুন দেখি—জীবনে আমরা যা ভালবাসি, তা কেমন করে আপনি ছাড়লেন, কি জন্যে ছাড়লেন? আমরা যার জন্যে সংসার আঁকড়ে থাকি, যা থেকে সান্ত্বনা পাই—সেই সংসারের পথ, বিয়ে-থার পথ থেকে সরে আসতে, দূরে আসতে আপনাকে কি বা কে বাধ্য করল? আপনি ত ও-বিষয়ে গোঁড়া নন, গোমড়া-মুখো দার্শনিক নয়। আপনার জীবনে, কোন কিছু অদ্ভুত অঘটন ঘটেছে কি না? কোন দুঃখে আপনি এই ব্রত গ্রহণ করেছেন?

ম'তুইতের পুরোহিত উঠে দাঁড়ালেন—আগুনশালার দিকে একটু এগিয়ে গেলেন—পায়ের ভারী জুতোজোড়া আগুনের দিকে এগিয়ে দিলেন। তিনি কি উত্তর দেবেন এ সম্বন্ধে? তখনো যেন তাঁর মনে যথেষ্ট দ্বিধা রয়েছে।

লোকটি ঢ্যাঙা—তাঁর মাথার সব চুল পাকা। গত কুড়ি বছর ধরে তিনি সন্ত-এস্তইন-দ্য-রসের ধর্মাধ্যক্ষগিরি করছেন। কৃষকেরা তাঁকে দেখলে বল্‌ত : লোকটি সত্যি সত্যিই বড় ভালো! কথাটা ঠিক। তিনি দানশীল, অমায়িক, ভদ্র আর উদার। সন্ত মার্টিনের মত তিনি নিজের পোষাক দু' টুকরো করে ফেলেছেন। অল্পতেই তিনি হাসেন এবং কাঁদেন—গ্রামের লোকেরা তাই এ ব্যাপারে তাঁর এত অনুরক্ত।

বুড়ী কোঁতেস্ দ্য সেভিল্, রসেরের স্যাটোতে থেকে তাঁর নাতি-নাতনীদের মানুষ করছিলেন। তাঁর ছেলে এবং বৌ পর পর মারা যাওয়ায়, তিনি এই পুরোহিতের খুব ভক্ত হয়ে উঠেছেন এবং তাঁর সম্বন্ধে প্রায়ই বলতেন : ওঁর মনটা বড় নরম!

প্রত্যেক্ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিনি স্যাটোতে আসতেন। তাঁদের বেশ বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল। বুড়ো বয়সের ভাব, যেমন খোলাখুলি ও পরিষ্কার হয়, এ ভাবও ঠিক তেমনি।

বুড়ী একঘেয়েভাবে জিজ্ঞাসা করতেন।

ঃ ম'শিয়ে লে কুরে, এবার কিন্তু আপনাকে সব খুলে বলতে হবে।

তিনি সেই কথা পুনরুক্তি করতেন ঃ অন্য সকলের মত সংসার করবার জন্যে আমি জন্মাইনি। কিন্তু আমার ভাগ্য ভাল বলেই ঠিক সময়ে এই জ্ঞান আমার জন্মেছিল। তারপর থেকে অনেক প্রমাণ পেয়েছি যে, আমি ভুল করিনি।

ঃ আমার বাপ-মা খুব ধনী ছিলেন। তাঁরা আমার সম্বন্ধে খুব উচ্চ আশা পোষণ করতেন। অল্প বয়সে তাঁরা আমাকে বোর্ডিং-স্কুলে ভাত করে দেন। বাড়ী থেকে বোর্ডিং-এ গিয়ে ছেলেরা কি রকম একা-একা, নিঃসঙ্গ বোধ করে, তা আপনি ধারণা করতে পারবেন না। স্নেহহীন এই একঘেয়ে জীবন কারো কাছে ভালো লাগে, আবার কারো একেবারে দুর্বহ বোধ হয়। ছোট ছেলে-মেয়েদের হৃদয় আছে—হৃদয়বত্তা আছে—তাদের অনুভূতি খুব তীক্ষ্ণ এবং তারা প্রায়ই স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। কাজেই খুব তাড়াতাড়ি তাদের পরিবারের মধ্যে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলে—তাদের স্নেহ, মায়া, মমতা দেখাবার পাত্রদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিলে—তারা প্রায়ই একটু বেশী মাত্রায় স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে—এই অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতা অনেক সময়ে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়।

ঃ আমি একেবারেই খেলাধূলা করতাম না; বন্ধু-বান্ধব আমার একটিও ছিল না। আমি সব সময়েই বাড়ীর কথা ভেবে ম্রিয়মান হয়ে থাকতাম। সারারাত্রি বিছানায় পড়ে শুধু কাঁদতাম। আমি মনে মনে বাড়ীর তুচ্ছতম স্মৃতিকে জাইয়ে রাখবার চেষ্টা করতাম—মনে মনে ছোট ছোট ঘটনার স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে রাখতাম: বাড়ীতে যা কিছু ফেলে এসেছি, তার কথাই অনবরত ভাবতাম। এইভাবে আমি আমার যৌবনে অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ও স্পর্শকাতর হয়ে এমন হয়ে উঠলাম যে, তুচ্ছতম ব্যাঘাত ও বিরক্তির কারণ ঘটলে আমি মনে মনে ভীষণ দুঃখ অনুভব করতাম।

ঃ এ ছাড়াও আমি ছিলাম বেশ চাপা-স্বভাবের। নিজের মনের মধ্যেই সব চেপে রাখতাম—মনের সব কথা খুলে বলবার লোকের অভাবে মনের কথা মনেই রাখতাম। এইভাবে মন নিয়ে মেতে থাকার অভ্যাস ধীরে ধীরে আমার মধ্যে বেশ কায়েম হয়ে দাঁড়ালো। ছেলেমেয়েদের স্নায়ু অতি অল্পেই উত্তেজিত হয়, বয়স হবার আগে পর্যন্ত, তারা গভীর মানসিক শান্তি উপভোগ করে। কিন্তু কেউ কি কখনও ভেবে দেখেছে যে, তাদের মনের উপর কোন জুলুম চালালে, তা যেন বন্ধুর মৃত্যুর মতই হৃদয়-বিদারক হয়ে দাঁড়ায়! কেউ কোনদিন হিসেব করে দেখেনি যে, কোন কোন ছেলে খুব সামান্য কারণে ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয় এবং তাদের এই অতিমাত্রায় উত্তেজনা দুরারোগ্য ব্যাধির মতই তাদের মনে স্থায়ী আসন পেতে বসে।

ঃ আমার ব্যাপারটা অনেকটা এই ধরণের হয়েছিল। আমার অনুশোচনা—মর্মদাহ মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে ক্রমশঃ এত বেশী হয়ে দাঁড়াল যে, বেঁচে থাকাই যেন আমার কাছে শহীদের মতই আত্মদান বলে মনে হত।

ঃ একথা কাউকে বলতাম না—এ সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ করতাম না—ক্রমশঃ আমি অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ে উঠলাম। আমার অনুভূতিগুলো এত তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল যে, আমার হৃদয় যেন এক বেদনাদায়ক দগ্‌দগে ক্ষত। মনে কোন আঘাত লাগলেই আমার ভীষণ কষ্ট হত—কে যেন ক্ষতটা মোচড়াতো—অনেকক্ষণ ধরে তার প্রতিক্রিয়া চলতো এবং আমি কাতর হয়ে পড়তাম। যাদের প্রকৃতি, উদাসীনতা আর কাঠিন্য দিয়ে ঢাকা, আহা, সেই সব লোক কত খুশী। হয় এরা কিছু গ্রাহ্য করে না—না হয়, এত কঠিন-হৃদয় যে, এদের কিছু স্পর্শ করতে পারে না।

ঃ এইভাবে আমি ষোল বছরে পড়লাম। সব কিছু থেকে কষ্ট পাবার প্রবণতা থেকে আমি ক্রমশঃ ভীরু হয়ে পড়লাম। ভাগ্যের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার কোন উপায় না থাকায়, আমি সব

ব্যাপারেই ভয় পেতাম—কোন ঘটনার সম্মুখীন হতে পারতাম না। সব সময়ে অপ্রত্যাশিত দুর্ভাগ্যের আশঙ্কায় ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতাম। কোনও লোকের সামনে কাজ করতে, কথা বলতে আমার যেন সাহস হত না। সব সময়েই আমার মনে হত, বেঁচে থাকা মানেই যুদ্ধ করা। আর সেই যুদ্ধে, ভীষণ আঘাত মারাত্মক জ্বালা-যন্ত্রণা পাওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। লোকে যেমন ভবিষ্যতে সৌভাগ্যের আশা করে, আমিও তেমনি ভবিষ্যতে কষ্ট পাবার সম্ভাবনায় ম্রিয়মান আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে থাকতাম। তাই আমি দূরে সরে থাকতাম—মনে হত, এ যুদ্ধে আমার পরাজয় এবং মৃত্যু অনিবার্য।

: আমার পড়াশুনা শেষ হওয়ামাত্র আমাকে আমার বৃত্তি নির্বাচন করবার জন্য ছ'মাস সময় দেওয়া হল। সামান্য একটা ঘটনার ফলে আমি আমার মনের কথা পরিষ্কারভাবে জানতে পারলাম—আমি আমার দুর্বল মনের স্পষ্ট চিত্র দেখলাম—সাধারণ জীবনযাত্রার বিপদ বুঝে আমি মনস্থির করে ফেললাম। আমাকে সংসারের পথ—বহুজন অনুসৃত জীবনযাত্রার পথ—ত্যাগ করতে হবে।

: ভার্দিয়ারস্ একটি ছোট শহর। এর চতুর্দিকে সমতলভূমি আর জঙ্গল। বড় রাস্তার উপর আমার পৈত্রিক বাড়ী। যে বাড়ীর জন্য এত কেঁদেছি—যে বাড়ীতে থাকবার জন্য আমার মনের এত টান ছিল—সেই বাড়ী থেকে দূরে দূরে আমি দিন কাটাতে লাগলাম—আমার মনে কেবল স্বপ্ন জাগতো। আমি সেই স্বপ্নের ঘোরে মন মরা হয়ে একা-একা মাঠে-মাঠে ঘুরে বেড়াতাম; এ এক রকম পলায়ন করার মনোবৃত্তি। আমার বাবা-মা ব্যবসা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতেন যে, মাঝে মাঝে শুধু লাভের কথা আর ভবিষ্যৎ কর্মধারার কথা বলতেন—আমার ভবিষ্যৎ আর আমার কর্মধারার কথাও মাঝে মাঝে উঠত। তাঁরা আমাকে ভালবাসতেন কিন্তু কর্মী

যেমন সর্বদা বাস্তব কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তেমনি তাঁরা আমার কাজের কথাই ভাবতেন, মনের সম্বন্ধে একটুও মাথা ঘামাতেন না। তাঁদের ভালবাসা ছিল যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাতে হৃদয়াবেগ বা অনুভূতি ছিল না। আমি আমার চিন্তার কারাগারে বন্দী হয়ে অনন্ত অস্বস্তির মধ্যে কাল কাটাতে লাগলাম।

: একদিন বিকালবেলা বেড়াবার পর যখন লম্বা-লম্বা পা ফেলে, আমি তাড়াতাড়ি আমাদের বাড়ীর দিকে ফিরছিলাম, তখন আমি দেখলাম একটা কুকুর আমার দিকে দৌড়ে আস্‌ছে। কুকুরটা লাল স্প্যানিয়েল জাতীয়—তার কান দুটো কোঁকড়ানো কিন্তু বড্ড রোগা!

: আমার কাছ থেকে দশ হাত দূরে এসে সে থাম্‌ল। আমিও থামলাম। সে লেজ নাড়তে লাগল এবং আস্তে আস্তে আমার কাছে এলো—সমস্ত শরীরে তখনো তার একটু একটু ভয় ও দ্বিধা—কখনো সে মাটিতে বসে পড়ছে, একটু একটু মাথা নাড়ছে, যেন আমার কাছে আবেদন জানাচ্ছে। তারপর কোনও একটা বিনাত, করুণ অথচ কাতর, নির্ভরতার ভাব নিয়ে সে আমার কাছে গুঁড়ি মেরে আসতে লাগ্‌ল। আমার দুই চোখ জলে ভরে উঠল। আমি তার কাছে এসে দাঁড়ালাম। সে ছুটে চলে গেল, কিন্তু তখনি আবার ফিরে এল; আমি নীচু হয়ে তাকে মিষ্টি কথায় কাছে আসবার জন্য ডাকতে লাগলাম। অবশেষে সে আমার নাগালের মধ্যে এসে গেল। আমি বেশ আদর করে তার গায়ে হাত বুলোতে লাগলাম।

: তার একটু সাহস হল, একটু একটু করে সে উঠে দাঁড়াল, আমার কাঁধে থাবা রেখে আমার হাত চাটতে লাগল। এইভাবে সে আমার পিছু পিছু আমার বাড়ীর ভিতরে এল।

: এই প্রাণীটাকেই আমি জীবনে সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গভীর ভাবে ভালবেসেছিলাম। তার ভালবাসার প্রতিদানও পেয়েছিলাম।

অবশ্য এই প্রাণীর প্রতি ভালবাসা একটু বাড়াবাড়ির দিকেই গিয়েছিল এবং বেশ হাস্যকর পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

ঃ কেমন এক দুর্বোধ্য ভাবাতিশয্যে আমার মনে হত যে, আমরা দুটি ভাই—দুজনে পৃথিবীর পথে পথভ্রান্ত, দুজনে পরিত্যক্ত, আমাদের আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় নেই। এরপর সে কোনদিন আমাকে ছেড়ে কোথাও যেত না। আমার বিছানায় আমার পায়ের দিকে শুয়ে সে ঘুমোতো। আমার বাপ-মার আপত্তি সত্ত্বেও সে টেবিলে আমার পাশে খেত, আমি একা-একা বেড়াতে বেরুলে সে আমার সঙ্গে সঙ্গে যেত।

আমি প্রায়ই একটা নালার ধারে ঘাসের উপর বসে থাকতাম। স্যাম্ অমনি আমার দিকে দৌড়ে এসে আমার কোলের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। নাকের ডগা দিয়ে সে আমার হাতটা তুলে যেন আমাকে তার গায়ে হাত বুলোতে বলত।

ঃ জুন মাসের শেষাশেষি একদিন যখন আমরা সন্ত পীয়ের দ্য শাভ্রোল-এর রাস্তায় এসেছি, তখন দেখলাম প্যাভের থেকে একটা গাড়ী আসছে। চার ঘোড়ায় টানা গাড়ীটা খুব জোরে ছুটে আসছে—গাড়োয়ান শপাং শপাং করে চাবুক চালাচ্ছে—ভারী গাড়ীটার চাকা থেকে মেঘের মত এত ধোঁয়া উঠ্ছে যে নীচু দিকটা অন্ধকার করে ফেলেছে।

ঃ সহসা গাড়ীটা আমার খুব কাছে এসে পড়ায় স্যাম্ বোধহয় তার শব্দে ভয় পেয়ে আমার কাছে আসবার জন্যে আমার সামনে থেকে একটা লাফ দিলে। একটা ঘোড়ার পায়ের আঘাতে সে রাস্তায় উপুড় হয়ে পড়ে গেল। আমি তাকে গড়িয়ে পড়তে দেখলাম; তারপর সমস্ত গাড়ীটা দুবার ঝাঁকানি খেল এবং তার পরেই দেখলাম কি যেন রাস্তার উপর ছট্ফট্ করছে। গাড়ির চাকায় সে প্রায় দু টুকরো হয়ে কেটে গিয়েছিল। তার নাড়িভুঁড়ি, তার কাটা পাকস্থলী থেকে বেরিয়ে পড়েছে এবং রাস্তায় থোকা থোকা রক্ত জমে গেছে—সে

একবার ওঠবার চেষ্টা করল, একবার দাঁড়াবারও চেষ্টা করল কিন্তু তার সামনের পা দুটো শুধু নড়ে উঠল। সে সামনের পায়ের নখ দিয়ে মাটি খোঁড়বার চেষ্টা করল। পিছনের পা দুটো তখন অসাড় হয়ে গেছে। যন্ত্রণায় পাগলের মত সে ভীষণ ভাবে আর্তনাদ করতে লাগল।

ঃ কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সে মরে গেল। তখন আমার মনে যে কী হচ্ছিল, আমি যে কত কষ্ট পাচ্ছিলাম, তা আমি বর্ণনা করতে অপারগ। একমাস আমি ঘরে বন্দী হয়ে রইলাম—ঘর থেকে বাইরে বেরুতে পারতাম না।

ঃ একদিন আমার বাবা, এই সামান্য কারণে, আমাকে এত অভিভূত হতে দেখে রেগে বললেন ঃ যখন সত্যিকারের শোক পাবে, তখন তুমি কি করে সহ্য করবে—ধর, যদি তোমার স্ত্রী, ছেলে-পুলে কোনও দিন মারা যায়, তখন?

ঃ তখন আমি আমার মনের প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট পরিষ্কার দেখতে পেলাম। আমি বুঝলাম, প্রাত্যহিক জীবনের ছোট-খাট কষ্ট কেন আমার কাছে বড় রকম দুর্ঘটনার আকার ধারণ করে। সেদিন বুঝলাম, আমি এমন উপাদানে তৈরী হয়েছি যে, সামান্য ব্যাপারের জন্য আমি ভীষণ ভাবে কষ্ট পাই—আমার দুর্বল বোধশক্তি আমার দুঃখকে শতগুণে বর্ধিত করে দেয়। জীবনের সব কিছুতে নিদারুণ ভয় যেন আমার মনের মধ্যে স্থায়ী বাসা বেঁধে বসেছে। আমার কোন বাসনা ছিল না—কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না; সুখের সম্ভাবনার আশা ত্যাগ করে, নিশ্চিত দুঃখ এড়াবার সংকল্প করে ফেললাম। জীবন ক্ষণস্থায়ী; এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে পরের সেবা করা, অপরের কষ্টের ভার লাঘব করা এবং অপরের সুখে সুখী হওয়াকেই আমার জীবনের ব্রত বলে স্বীকার করে নিলাম। কোন কিছুর অভিজ্ঞতা না থাকায় আমি আকাঙ্ক্ষাশূন্য হয়ে জীবনযাপন করব বলে স্থির করলাম।

: কিন্তু তবুও, যদি জানতেন, এভাবে থাকা সত্ত্বেও, সত্যিকারের দুঃখ দেখলে আমি কত অভিভূত হই—কত কষ্ট পাই। আগে যা আমার পক্ষে অসহ্য কষ্ট বোধ হত, এখন তা করুণায় গলে পড়ে। এসব কষ্ট রোজ আমাকে দেখতে হয়। ভাগ্যে এসব কষ্ট আমার জীবনের অঙ্গীভূত নয়, এ কষ্ট আমাকে সহ্য করতে হয়নি, তাই রক্ষা! নিজে না মরে আমি আমার সন্তানের মৃত্যু দেখতে পারতাম না! মাঝে মাঝে সব ব্যাপার জড়িয়ে আমার মনে এত অদ্ভুত ও ভীষণ ভয় ধরে যেত যে, পিওন আসতে দেখলে আমার মন অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠত—একদিন নয় প্রত্যহই আমার মনে হত, না জানি কি খারাপ খবরই না এসে থাকবে। কিন্তু এখন অবশ্য আর কিছু থেকে ভয় পাবার কোন কারণ আর আমার নেই।

মঠবাসী ম'ভুইৎ থামলেন। প্রকাণ্ড আগুনশালায় আগুন জ্বলছিল; তিনি একদৃষ্টিতে সে দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হল, যদি তিনি নির্ভয় হতেন, তাহলে জীবনে যে সব অনাস্বাদিত অজ্ঞাত সুখের স্বাদ পেতেন, সে সব তিনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন।

সামান্য একটু চাপা গলায় তিনি বললেন: আমি ঠিকই করেছিলাম। পৃথিবীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য আমি জন্মাইনি।

প্রথমে কোঁতেস্ কিছু বললেন না; অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর বললেন: আমার কথা কি জানেন, এই নাতিনাতনীরা যদি না থাকত, তবে আমার বাঁচবার ইচ্ছাও থাকত না।

আর কোন কথা না বলে পুরোহিত উঠে পড়লেন।

রান্নাঘরে চাকর-বাকররা ঘুমিয়ে পড়েছিল—কোঁতেস্ নিজেই তাঁকে দরজা পর্যন্ত আগিয়ে দিলেন। দরজার পরেই বাগান। বাগানে তাঁর দীর্ঘ ছায়া আলোর আভায় উজ্জ্বল হয়ে অন্ধকারে জ্বলছিল। তিনি এসে আগুনশালার পাশে বসে পড়লেন। তিনি সেই সব কথা ভাবতে লাগলেন, যেসব কথা আমরা অল্পবয়সে এবং যৌবনে কোনদিন ভাবি নি।

## সতের

## ॥ সবশেষ ॥

কোঁৎ দু লর্মারিন্ সবে পোষাক পরেছেন। যাবার সময়ে তিনি একবার প্রকাণ্ড আয়নাটায় নিজেকে দেখে নিলেন এবং একটু মৃদু হাসলেন। তাঁর পোষাকের ঘরের একটা প্যানেল-ভর্তি এই প্রকাণ্ড আয়না।

তখনো তিনি সুদর্শন, যদিও মাথার চুল প্রায় শাদা হয়ে গেছে। ঢ্যাঙা, পাতলা, চোস্ত, মুখের কোথাও হাড় ঠেলে বেরোয় নি—তাঁর পাতলা মুখের দু দিকে গোঁফের পাতলা রেখা শাদা হলেও সুন্দর—তাঁর মুখে কি এক অবর্ণনীয় সৌন্দর্য আছে, যা সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না।

মৃদুস্বরে তিনি বললেন : লর্মারিন্ এখনও বেঁচে আছে!

এই বলে তিনি বৈঠকখানায় এলেন। এখানে তাঁর চিঠিপত্র এসে জমা হয়ে আছে।

তাঁর টেবিলে, ঠিক জায়গায় সব সাজানো আছে—নিষ্কর্মা লোকের কাজ করবার টেবিল—তিনটে খবরের কাগজের পাশে প্রায় ডজন খানেক চিঠি জমা রয়েছে। আঙুল দিয়ে সরিয়ে তিনি চিঠিগুলো মেলে দিলেন—জুয়াড়ী যেমন করে তাস বেছে নেবার জন্য তাসগুলো মেলে ধরে। তেমনি করে অভ্যস্ত হাতে তিনি চিঠিগুলো মেলে দিলেন। খাম ছিঁড়ে পড়বার আগে তিনি হাতের লেখাগুলো লক্ষ্য করতে লাগলেন।

এই ছিল তাঁর আশা ও অনুসন্ধিৎসার সময়—এক আবছা উদ্বেগের ছায়া তাঁর মুখের ওপর দেখা যাচ্ছে। এই বন্ধ করা রহস্যময়-কাগজগুলো কি বার্তা বয়ে এনেছে! এরা কি খবর এনেছে—সুখের,

আনন্দের, না দুঃখের খবর? দ্রুত তিনি সবগুলো দেখে নিলেন। কে লিখেছে হাতের লেখা দেখে অনুমান করে নিলেন। তাদের মধ্য থেকে বেছে বেছে তিনি দু তিনটে ভাগ করলেন। এগুলো বন্ধুদের, এগুলো—যাদের চিঠি তাদের সম্বন্ধে তিনি উদাসীন, আর এগুলো—অপরিচিত নানা লোকদের। শেষের চিঠিগুলো তাঁর মনে এক অস্বস্তি জাগালো! এরা তাঁর কাছ থেকে কি চায়? ওসব চিঠি কারা লিখেছে?

আজ একটি চিঠি বিশেষ করে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। চিঠিটা সাদাসিদে—কিছুই যেন উপর থেকে বোঝা যায় না—কিন্তু চিঠিটা তাঁর মনের শান্তি নষ্ট কবে দিলে—তাঁর মনের মধ্যে ভয়ের এক শিহরণ এনে দিলে।

তিনি ভাবতে লাগলেন: এ চিঠি তাঁকে কে লিখল? এ লেখা ত আমার চেনা বলে মনে হচ্ছে—কিন্তু কার, তা ঠিক করতে পারছি না।

তিনি চিঠিটা মুখের কাছে তুলে ধরলেন—সাবধানে দু আঙুলে ধরলেন—খামের মধ্য দিয়ে আলোয় পড়বার চেষ্টা করলেন—খুলে পড়বেন কিনা তখনো ঠিক করতে পারলেন না!

তারপর চিঠিটার গন্ধ শুঁকলেন। টেবিলের উপর থেকে একটা ছোট আতসী-কাচ তুলে হাতের লেখার কারিকুরি পরীক্ষা করতে লাগলেন। হঠাৎ যেন তাঁর ভয়ানক ভয় ধরে গেল—তিনি ভীষণ ভড়কে গেলেন: এটা কার কাছ থেকে এল? এ হাতের লেখা আমার পরিচিত—অত্যন্ত চেনা। এর লেখা আমি পড়েছি, হ্যাঁ-হ্যাঁ প্রায়ই। কিন্তু সে ত অনেক আগে—বহু আগে। কার চিঠি এটা হতে পারে? দ্যুৎ! এ চিঠি নিশ্চয়ই কেউ টাকা চেয়ে লিখেছে।

তিনি খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা পড়তে সুরু করলেন:

প্রিয় বন্ধু!

তুমি নিঃসন্দেহে আমায় ভুলে গেছ। আমাদের দেখা হবার পর প্রায় দীর্ঘ পঁচিশ বছর কেটে গেছে। তখন ছিলাম যুবতী, এখন

আমি বুড়ী। তোমাকে বিদায় দিয়ে আমি প্যারী ছেড়ে আমার স্বামীর সঙ্গে দেশে ফিরে গেলাম। মনে আছে, তুমি আমার স্বামীকে ঠাট্টা করে "হাসপাতাল" বলতে। তাঁকে মনে পড়ছে কি? তিনি পাঁচ বছর মারা গেছেন। আমি এবার আমার মেয়ের বিয়ে দিতে প্যারী ফিরেছি। আমার মেয়ে সুন্দরী, আঠারো বছর বয়স। এ মেয়েকে তুমি দেখনি। তার জন্মের সময় তোমাকে জানিয়েছিলাম কিন্তু এ তুচ্ছ ব্যাপার তোমার নজর এড়িয়ে গিয়ে থাকবে।

তুমি চিরকাল সুন্দর লর্মেরীনে ছিলে—আমি লোকের কাছে তা শুনেছি। যাহোক, যদি এখনো তোমার ছোট্ট লিজেকে মনে থাকে, যাকে মাঝে মাঝে তুমি লিজন্ বলতে, তাহলে আজ সন্ধ্যায় তার বাড়ীতে সান্ধ্য-ভোজে আসবে কিন্তু! তোমার চিরবিশ্বস্ত বন্ধু ব্যারন দ্য ভাঁস-এর বাড়ী আসতে কোন দ্বিধা করবে না। ভাগ্যের কথা না তুলে, সে পরম বিশ্বাসে তোমার দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে—এ হাত তুমি ধরবে কিন্তু এতে আর চুমু খাবে না—বুঝলে জ্যাকেলেট্?

—লিজে দ্য ভাঁস্।

লর্মেরিনের বুক হঠাৎ দুলে উঠল। হাঁটুর উপর চিঠিটা নিয়ে তিনি আরাম-কেদারার মধ্যে ডুবে রইলেন—একদৃষ্টে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর দুচোখ জলে ভরে এল।

জীবনে যদি সত্যি তিনি কাউকে ভালবেসে থাকেন, তবে সে এই মেয়েটি, এই ছোট্ট লিজে—লিজে দ্য ভাঁস্। তাকে তিনি "ছাইগাদার ফুল" বলে ডাকতেন—তার চুলের অদ্ভুত রং এবং চোখের হালকা ধূসর রং থেকে তিনি তাকে এই নাম দিয়েছিলেন। আহা! কী সুন্দর মনোহর এবং আদরের মেয়ে ছিল এই ফুরফুরে ব্যারনেস্, সেই বেতো, ব্রণ-ছাওয়া-মুখো ব্যারনের স্ত্রী—লোকটা ঝট্ করে তাকে দেশে নিয়ে গেল—হিংসে করে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল, আটকে রেখে দিলে—সুপুরুষ লর্মারিনের কাছ থেকে সরিয়ে নিলে।

হ্যাঁ, তিনি তাকে ভালবেসেছিলেন এবং তাঁর বিশ্বাস, তিনি তার ভালবাসা পেয়েছিলেনও। সে তাঁকে আদর করে জ্যাকেলেট্ বলে ডাকত—আহা! তার সে জ্যাকেলেট্ উচ্চারণের কী অদ্ভুত মাধুর্য!

মন থেকে মুছে-যাওয়া হাজার হাজার স্মৃতি যেন আবার মনে জেগে উঠল। সে স্মৃতি যেন এখন স্বপ্নের দেশের মত সুদূর আর বেদনাদায়ক! একদিন সন্ধ্যাবেলা এক নাচের মজলিশ থেকে বেরোবার পথে লিজে তার সঙ্গে দেখা করলে। বোয় ছ বোলোনে তারা বেড়াতে গেল। উভয়ের পরণে ছিল খুব হালকা পোষাক। তখন বসন্তকাল, প্রকৃতি সুন্দর সাজে সেজেছে। তার পরণের বডির গন্ধে যেন বাতাস সুরভিত হয়ে উঠল—তার বডির মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে একটু যেন তার গায়ের গন্ধ মিশে গিয়েছিল। সে কী স্বর্গীয় আনন্দময়ী রাত্রি! যখন তারা হ্রদের কাছে গেল, তখন গাছের ডালের ফাঁকে চাঁদের আলো এসে জলের উপর পড়ল। সহসা দেখা গেল লিজে কাঁদছে। একটু আশ্চর্য হয়ে তিনি তাকে তার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

সে বললে : আমি জানিনা। এই চাঁদের আলো আর এই জল আমাকে অভিভূত করে ফেলেছে। কাব্যের কোন জিনিষ দেখলেই আমারও হৃদয়াবেগ উত্তাল হয়ে ওঠে—আমাকে কাঁদতে হয়।

তিনি একটু হাসলেন। তার এই মনের আবেগ তাঁর বেশ ভাল লাগল, তিনি মোহিত হয়ে পড়লেন। এই ছোট্ট মেয়েটি সামান্য হৃদয়াবেগেই অভিভূত হয় দেখে, তাঁর বড় ভাল লাগল। তিনি তাকে বুকের মধ্যে টেনে এনে ভাঙা ভাঙা স্বরে বললেন : ছোট্ট লিজে, প্রিয় আমার, তুমি শুধু সুন্দরী নয়, মনোহারিকা, অতুলনীয়া।

সে কি মনোহর প্রেমের কাহিনী—ক্ষণস্থায়ী কিন্তু কী কোমল, কী সুন্দর! খুব তাড়াতাড়িই এ প্রেমের গতি স্তব্ধ হয়ে গেল—উৎসাহ ও উত্তেজনার মাঝেই বুড়ো পশু সেই ব্যারণ তার স্ত্রীকে সরিয়ে নিয়ে গেল। সেই থেকে সে তার স্ত্রীকে আর কারো সামনে বার করেনি।

লর্মারিন, সত্যি সত্যিই সব ভুলে গিয়েছিল ; তিন চার মাস পরে সব ভুলে গিয়েছিল। অবিবাহিত অবস্থায় প্যারীতে একটা মেয়ের স্মৃতি ভুলিয়ে দেয়, অপর একটা মেয়ে—খুব তাড়াতাড়ি মুছে যায় পূর্বের স্মৃতি। তবুও সে তার মনের মধ্যে একটা জায়গা খালি রেখে দিয়েছিল—এই মেয়েটিকেই কেবল সে ভালবেসেছিল, তাই। এখন লর্মারিনের মনে হল কথাটা সত্যি।

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন: নিশ্চয়ই, আমি আজ সন্ধ্যায় তার বাড়ী নিমন্ত্রণে যাবো।

অভ্যাসবশে তিনি আয়নার দিকে ফিরে নিজের অপাদমস্তক একবার দেখে নিলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন: এতদিনে নিশ্চয়ই সে বুড়ী হয়ে পড়েছে—আর সে মাধুর্য কি তার আছে? আমার চেয়েও বুড়ো হয়ে পড়েছে। তার মনে বেশ স্ফূর্তি দেখা দিল। সে ভাবলে, এখন সে তাকে বেশ সুপুরুষ বলে মনে করবে—বেশ কচি-কাঁচা ভাব তার মধ্যে দেখে নিজের মন ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে উঠবে—পুরোনো দিনের কথা ভেবে কত আফশোষ করবে!

তিনি এবার অন্য চিঠিগুলোর দিকে নজর দিলেন। সেগুলো তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

সারাদিন ধরে তিনি একটা ছায়ামূর্তির চিন্তায় বুঁদ হয়ে রইলেন। এখন তাকে কেমন দেখতে হয়েছে? পঁচিশ বছর পরে এইভাবে দেখা হওয়া ভারী মজার ব্যাপার কিন্তু! সে কি তাঁকে এখন চিনতে পারবে?

মেয়েরা যেমন করে পুরুষের মন ভোলাতে সাজগোজ করে, তিনি তেমনি করে সারাদিন ধরে সাজলেন। একটা শাদা ওয়েস্ট কোট পরলেন—এটা কোটের সঙ্গে পরলে তাকে বেশ মানায়। চুল কুঁকড়ে দেবার জন্যে তিনি নাপিতকে ডাকলেন—চুলের কেয়ারী এতদিনেও তিনি ছাড়েননি! তাকে দেখবার কৌতূহল যে খুব, এটা প্রমাণ করবার জন্য তিনি সকাল-সকাল বাড়ী থেকে বার হলেন।

একটি সুন্দর বৈঠকখানা—সন্ত সাজানো হয়েছে। তাতে ঢুকেই প্রথমে তাঁর নজরে পড়লো—তারই একটা পুরোনো ফটো—রং ওঠা, ম্যাট্‌মেটে। যেদিন থেকে তার ভাগ্য ফিরেছে সেইদিন থেকে একটা পুরোনো সিল্কের ফ্রেমে সেখানে সেটা ঝোলানো রয়েছে।

তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। পিছনে একটা দরজা খুলে গেল। তিনি দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন, ফিরে তাকালেন—একমাথা সাদাচুল এক বৃদ্ধা তাঁর দিকে ছুই বাহু প্রসারিত করে আছে।

তিনি হাত ছুটো জোরে আঁকড়ে ধরলেন; অনেক—অনেকক্ষণ ধরে একে একে ছুই হাতে চুমো খেলেন। তারপর মাথা তুলে তিনি তাঁর সেই প্রিয়তমার দিকে তাকালেন।

হ্যাঁ, একেবারে বুড়ী—কিন্তু তিনি চিনতে পারলেন না—বুড়ী একটু মন্ত হাসল। মনে হ'ল, সে এখুনি কেঁদে ফেলবে।

তার মুখ থেকে অস্ফুটস্বরে বেরিয়ে এল: লিজে, তুমি?

তিনি বললেন: হ্যাঁ, আমি। আমি বৈকি! কিন্তু তুমি আমাকে চিনতে পারছো না। সত্যি কিনা বলো? ও! জীবনে কত কষ্ট কত ছুঃখ যে আমি ভোগ করেছি! ছুঃখে আমি পুড়ে ছাই হয়ে গেছি! এইবার আমার দিকে তাকাও—না, না, বরং আর আমার দিকে তাকিও না! কিন্তু তুমি কেমন সুন্দর আছ! কেমন করুণ! দৈবাৎ তোমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গেলে, আমি ঠিক চেঁচিয়ে উঠতাম! জ্যাকেলেট্! যাক, এখন বোসো, বসে একটু গল্প করা যাক। তারপর তোমাকে আমার মেয়েটি দেখাবো—মেয়েটি মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। দেখবে আমার সঙ্গে তার কত সাদৃশ্য বা তার সঙ্গে আমার কত মিল!

তাকে ঠিক আগেকার দিনের আমার মত দেখতে হয়েছে। দেখো, কিন্তু তোমার সঙ্গে একটু নিরিবিলি হয়ে কথা কইতে ইচ্ছে করছিল। ভয় হয়েছিল, প্রথম দর্শনে আমার মন বোধহয় চঞ্চল হয়ে উঠবে। এখন সে সব চুকে গেছে। বন্ধু, একটু বোসো!

তিনি তার পাশে বসলেন—তার হাত ধরলেন। কিন্তু কি যে বলবেন ভেবে পেলেন না ; এই রমণীকে সে চেনেনা। তাঁর মনে হতে লাগল, কস্মিনকালেও তিনি তাকে দেখেন নি ! এবাড়ীতে সে কিজন্যে এসেছে ? কি কথা সে বলবে ? সেই পুরোনো দিনের কথা কি সে বলবে ? তাদের দু জনের মধ্যে কি এতো মিল আছে ? এই দিদিমার মত ভারিক্কীমুখ এই রমণীর উপস্থিতিতে তার কোন পূর্ব-স্মৃতিই যে মনে আসছে না ! কিছুক্ষণ আগে তার সুন্দর ছোট্ট লিজে, তার মনোহর "ছাইগাদার ফুল"-এর কথা ভাবলে তার মনে যে সব মধুর কোমল, মিষ্টি তিক্ত সব স্মৃতির তরঙ্গ জাগছিল, তাঁর হৃদয়কে অভিভূত করে, বিপর্যস্ত করে দিচ্ছিল, তা যেন এখন সে কিছুতেই মনে আনতে পারছিল না। তবে তার এখন কি হল ? সেই আগেকার তার প্রেয়সীর ? সেই সুদূর স্বপ্নের মেয়েটির—সেই লালচে-চুল, ধূসর-চোখ, ছোট্ট মেয়েটি যে মিষ্টি করে "জ্যাকেলেট্" বলে তাকে ডাকত ?

পাশাপাশি তারা বসে রইল—স্থির, নিশ্চল—উভয়েই আড়ষ্ট, বিব্রত, অস্বস্তিতে উভয়েই কাতর।

তারা অনেকক্ষণ ধরে সাধারণ ভাষায় জোড়াতাড়া দিয়ে কথাবার্তা চালাবার পর, লিজে উঠে দাঁড়িয়ে কলিং বেলের বোতাম টিপ্‌ল।

সে বললে : আমি রীণাকে ডাকতে যাচ্ছি।

দরজায় একটা মৃদু করাঘাত, আর পোষাকের একটা খস্‌খসানি শব্দ শোনা গেল ! তারপরেই একটা স্বর ভেসে এল—

: মা, এই যে আমি !

লর্মারীনের কেমন যেন ভয় ধরে গেল—তিনি ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন। রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, শুভদিন, মাদ্‌মোজেল্ !

তারপর তার মায়ের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন : ও ! এযে হুবহু তুমি !

সত্যি কথা বলতে কি, লর্মারীনের মনে হ'ল, এই মেয়েটিকেই সে যেন বহুদিন আগে জানতো, চিনতো। যে লিজে হারিয়ে গেছে, যাকে সে খুঁজে পাচ্ছিল না, সেই যেন আবার ফিরে এসেছে। মেয়েটির মধ্যে সে তার পঁচিশ বছর আগেকার ভালবাসার পাত্রীকে খুঁজে পেল—একেই সে প্রেম দিয়ে জয় করেছিল। এ যেন আরো অল্প বয়সের, আরো সরল, আরো ছেলেমানুষিতে ভরা!

তার মধ্যে একটা আবেগ তাকে যেন অদম্য তাগিদে অস্থির করতে লাগল—দুহাত প্রসারিত করে তাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরবার এবং তার কানে কানে, "শুভদিন লিজন্" বলবার জন্য সে অস্থির হয়ে উঠল।

একটি চাকর এসে বললে : মাদাম্, খাবার তৈরী।

তারা খাবার ঘরের দিকে অগ্রসর হল।

খাবার সময়ে কি হল, তারা লর্মারীনকে কি বল্‌ল এবং সে তার উত্তরে কি বল্‌ল, কিছুই যেন লর্মারীনের মন স্পর্শ করল না! লর্মারীন যেন দিবাস্বপ্নে ডুবে রইলেন—যেন উন্মাদের মত তাঁর অবস্থা! তিনি এক দৃষ্টিতে এই দুই নারীর দিকে তাকিয়ে রইলেন—তার মনে সেই এক ভাব—কেমন এক অসুস্থতা, কেমন যেন পরস্পর-বিরোধী ধারণা!

: এদের মধ্যে সত্যিকারের লিজে কে?

মা ঈষৎ হেসে বারবার বলতে লাগল : মনে পড়ছে কি? কিন্তু প্রত্যেকবারই সে যেন অল্পবয়সী মেয়েটির উজ্জ্বল আয়ত চোখে সেই অতীতের হারিয়ে-যাওয়া স্মৃতিকে ফিরে পেতে লাগল। বার বার তার মুখে এসে যেতে লাগল, "মনে পড়ে, লিজন্?" কিন্তু সে কাকে বল্‌বে? ঐ শাদা চুল বৃদ্ধাকে, না তার অল্পবয়সী মেয়েকে।

মাঝে মাঝে তাঁর যেন সব গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। তিনি দেখছিলেন যে, আজকের এই রমনীর সঙ্গে আগেকার সেই রমনীর কোনও মিল নেই। আগেকার সেই মেয়েটির কণ্ঠস্বরে—চোখের

চাউনিতে, তার সমস্ত সত্তায় কি যেন ছিল—যা এখন আর পাওয়া যাবে না; কিন্তু সে স্মৃতি তিনি কিছুতেই আর স্মরণে রাখতে পারলেন না—যা হারিয়ে গেছে, শত চেষ্টাতেও তা আর ফিরে পাওয়া গেল না।

ব্যারনেস্ বল্‌লে ঃ বন্ধু, তোমার আগেকার সে স্ফূর্তি আর নেই!

তিনি অস্ফুটস্বরে বললেন ঃ এ ছাড়াও আরো অনেক জিনিস আমি হারিয়েছি।

তিনি অনুভব করলেন, তাঁর পুরাণো প্রেম আবার ঘুম ভেঙে জেগে উঠছে—কোন্ এক বন্য জন্তুর মত—সে জেগে উঠে তাকে ক্ষত-বিক্ষত করতে চাইচে।

মেয়েটি কিন্তু বক্‌বক্ করে বলে চলেছে—তার মায়ের মুখের কত কথা, মায়ের কথা বলার ভঙ্গী, তারই চিন্তাধারা। তার মায়ের সঙ্গে তার হাবভাবের এত বেশী মিল যে, মাঝে মাঝে লর্মারীন চমকে উঠছিলেন। এসব যেন ছুঁচের মত তাঁর মনে বিঁধছিল—তাঁর ক্ষতে যেন নূতন খোঁচা দিয়ে তা থেকে রক্ত ঝরিয়ে দিচ্ছিল।

সকাল সকাল তিনি বিদায় নিলেন। বুলভার্ডের দিকে তিনি একটু বেড়াতে গেলেন। কিন্তু এই তরুণীর মূর্তি যেন তাঁর পিছনে পিছনে তাড়া করে চলল, তাঁর হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠতে লাগল, রক্তে যেন আগুন ধরে গেল। এখন আর তাঁর সামনে দুটি নারী নেই—আছে একটি। যাকে তিনি অনেক অনেক দিন আগে ভালবেসেছিলেন—সেই ফিরে এসেছে, তাকে তিনি সেই পুরোণো দিনের মতো ভালবাসতে লাগলেন। পঁচিশ বছর পরে যেন আরো বেশী তিনি তাকে ভালবাসলেন।

এই সব অদ্ভুত ব্যাপার সম্বন্ধে ভেবেচিন্তে তিনি তাঁর নিজের কর্তব্য নির্ধারণের জন্য বাড়ী ফিরে গেলেন।

কিন্তু একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে যখন তিনি আয়নার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই আয়নায় নিজেরই প্রতিচ্ছবি দেখে, তিনি স্মরণে যাবার আগে নিজ দেহ-সৌন্দর্যের কত তারিফ করেছেন—

সেই আয়নায় তিনি মোমবাতির আলোয় এক পক্ককেশ বৃদ্ধের প্রতিবিম্ব দেখলেন। আর ঠিক সেই সময়, যখন তিনি লিজিকে ভালবেসেছিলেন, তখন তাঁকে যেরকম দেখতে ছিল, সে স্মৃতি তাঁর মনে উদয় হল! আলোটা কাছে এনে তিনি আরো ভাল করে নিজের প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করতে লাগলেন—আতসী কাচ দিয়ে লোকে যেরকম কোন অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করে, তেমনি করে তিনি নিজেকে পরীক্ষা করতে লাগলেন—তাঁর কপাল ও গালে কোঁচকানো দাগ, বয়সে ভয়াবহ অবনতির এমন চিহ্ন তিনি এর আগে আব কোনদিন ত লক্ষ্য করেননি।

তিনি বসে পড়লেন। নিজেকে দেখে আজ যেন তিনি একেবারে মুষড়ে গেলেন—নিজের শোচনীয় অবস্থা দেখে, তিনি অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন: সর্বনাশ, তোমার সব শেষ।

---

## আঠার

### ॥ ছোট্ট দুজন সৈনিক ॥

প্রতি রবিবারে ছুটি হলেই, এই ছোট্ট সৈনিক দুজন বাইরে চলে আসত। ব্যারাকের বাইরে এসেই ডান দিকে কুরবিভয়ের মধ্য দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে মার্চ করতে করতে তারা হাঁটতে সুরু করত।

শেষ বাড়ীটা পার হতেই নির্জন ধুলো-ধূসর পথে পড়েই তাদের চলার বেগ মন্থর হয়ে আসত। তারা বেজোন্‌সের দিকে চল্‌ত।

এরা দুজনেই খুব বেঁটে আর রোগা এবং তাদের লম্বা কোটের মধ্যে তাদের শরীর যেন খুঁজে পাওয়া যেত না। তাদের হাতের নীচে তাদের কোটের হাতা ঝুলত। তাদের লম্বা ঝুলের লাল প্যাণ্ট রাস্তায় লুটিয়ে তারা পথ চলত। উঁচু শক্ত হেলমেটের তলায় তাদের ছোট্ট মুখদুটো খুব সাধারণ দেখাত—একটা শিশুসুলভ সরলতা আর ব্রেটনের অধিবাসীর স্পষ্ট ছাপ তাদের মুখে, চোখ-দুটো শান্ত আর নীল।

বেড়াতে বেড়াতে তারা একেবারেই কথা কইত না—দুজনেই মাথার মধ্যে কি যেন একটা চিন্তা নিয়ে সিধে পথে চলত। কথাবার্তা না বলায় তাদের মন চিন্তায় ভরে থাকত। লে শ্যাম্‌পিওর কাছে যে ছোট জঙ্গল, সেখানে এসে তাদের নিজের নিজের দেশের কথা মনে পড়ত, এখানে এসে তারা যেন বেশ আরাম পেত।

বনের মাঝে যেখানে কলম্বে ও সাটো থেকে দুটো রাস্তা এসে কাটাকাটি করেছে, সেখানে গাছতলায় এসে তারা তাদের ভারী হেলমেট্ খুলে কপালের ঘাম মুছে ফেলত। বেজন্‌স্ ব্রীজের উপর উঠে তারা সীন নদীকে একবার দেখত—সেখানে দু-তিন মিনিট নীচের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকত।

কখনো কখনো তারা আর্জেন্টাইলের দিকে তাকিয়ে থাকত—সেখানে সাদা পাল খাঁটিয়ে হেলতে ছুলতে ছোট ছোট নৌকো-গুলোকে আসতে দেখত, এ দেখে হয়ত তাদের ব্রেটনের কথা মনে হত—ভ্যান্ বন্দরের কথা তাদের মনে হত। এর কাছেই ছিল তাদের বাড়ী।

সীনের ওপারের একটা দোকান থেকে তারা তাদের দরকারী জিনিস কিনে আন্‌ত, রুটির দোকান থেকে রুটি, মদের দোকান থেকে মদ। হয়ত তারা একটা পুডিং, চার পেনি দামের রুটি, এক বোতল মদ—এসব কিনে রুমালে বেঁধে ঝুলিয়ে আনত। বেজন্‌স্ ছেড়ে তারা ধীরে ধীরে গল্প করতে করতে আরও এগিয়ে যেত।

তাদের সামনে পড়ত একটা উষর সমতলভূমি—এর মাঝে মাঝে কয়েকটা গাছ—তারপরেই ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটি বন। এই বন দেখলে তাদের কার মারিভানের কথা মনে পড়ে যায়! সরু পথের দুধারে ফসলের জমি আর ঘাসের জঙ্গল—তারপরেই সবুজ ধানের ক্ষেত—

জঁা কর্ডোরেন লাফলে গ্যানিডেফকে বলে ঃ

ঃ ঠিক প্লুনি ভোঁর মত দেখতে!

ঃ সত্যি, ঠিক যেন সেই রকম!

পাশাপাশি তারা চলতে থাকে ঃ মনভরা তাদের নিজের দেশের অনেক আবছা স্মৃতি—এই স্মৃতি একটু জাগলেই কেমন সব ছবি মনে জাগে! এক পেনী দামের বাজারে যে সব ছবি কিনতে পাওয়া যায়, প্রায় সেই রকম ছবি। এই রকম করে তারা কখনও মাঠের কোণ, কখনও একটা ঝোপ, কখনও একটা জলা, কখনও রাস্তার মোড়, কখনও পাথরের ক্রুশ দেখে নিজেদের দেশের কথা মনে করতে থাকে। তারপর তারা একটা সীমানার শেষে এক পাথরের ওপর বসে—এ পাথরটাও লক্‌নোভেনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রত্যেক রবিবারই প্রথম গাছের তলায় এসে লাফলে গ্যানিডেফ হেজেলগাছের একটা ছড়ি কাটে এবং বসে বসে তার ছাল চাঁচতে

চাঁচতে বাড়ীর কথা ভাবে—আর জঁ। কার্ডোরেন খাবারগুলো বয়ে আনে।

মাঝে মাঝে লাফলের হয়ত একটা নাম মনে পড়ে বা ছেলেবেলার কোন কথা মনে হলে সে অল্প কথায় তা বলে। তারপর অনেকক্ষণ ধরে তারা সেই সব কথা ভাবে। এই ভাবে একটু একটু করে তাদের নিজেদের দেশের কথা, প্রিয় স্বদেশের কথা, সুদূর সেই স্বদেশের কথা ধীরে ধীরে তাদের মনকে ছেয়ে ফেলে—তার টুকরো টুকরো ছবি ভেসে আসে—তার শব্দ, তার গন্ধ, সেই যে দেশে সমুদ্রের লোনা হাওয়া সবুজ ক্ষেতের ওপর দিয়ে বয়ে যায়—সেই দেশের স্মৃতি তাদের মনকে ছেয়ে ফেলে।

…লাফ আর জঁ। ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলে বেড়ায়। মনটা শান্ত কিন্তু বিষণ্ণ—ঠিক যেমন খাঁচার পাখী স্বাধীনতার কথা মনে করে কেমন এক বিষাদে ডুবে যায়।

লাফের ছড়িটার ছাল ছাড়ানো হয়ে গেলে, তারা বনের যে কোণটাতে বসে প্রাতরাশ খায়, সেখানে পৌঁছায়। বনের মধ্যে তারা যে ইট ছুটো লুকিয়ে রেখেছিল, সে ছুটো খুঁজে বার করে তারা ছোট ডালপালা জড়ো করে আগুন জ্বালে—বেয়োনেটের মাথায় রেখে পুডিংটা তারা গরম করে নেয়।

প্রাতরাশ খাওয়া হয়ে গেলে, তারা মদের বোতল শূন্য করে মদ খায়, ঘাসের ওপর পাশাপাশি বসে থাকে কিন্তু একটাও কথা বলে না—বহু দূরে তারা তাকিয়ে থাকে, তারা ছুহাত জড়ো করে বসে থাকে—চোখের পাতা তাদের বুজে আসে, লাল প্যাণ্টপরা পাছুটো ছড়িয়ে দেয় প্যাপি ক্ষেতের দিকে। সূর্যের আলোয় তাদের হেলমেটের চামড়া আর বোতাম ঝক্‌মক্ করে জ্বলে—মাথার ওপর চাতক পাখীরা উড়তে উড়তে গান থামিয়ে দেয়।

ছুপুর হলে তারা বেজন্‌স গ্রামের দিকে তাকাতে থাকে। ঐ দিক থেকে গরু নিয়ে মেয়েটি আসছে। ছুধ ছুইতে যাবার সময়ে

মেয়েটি প্রত্যেক রবিবার তাদের পাশ দিয়ে চলে যায়—কখনো বা গরুটাকে নেড়ে দিতে যায়। এই গরুটাই কেবলমাত্র এ অঞ্চলে গোয়ালের বাইরে চরতে আসে। একটু দূরে বনের ধারে এক ফালি ঘাসের জমিতে গরুটা বাঁধা থাকে।

শীঘ্র তারা একটি মেয়েকে দেখতে পায়—যতদূর নজর চলে, এই মেয়েটি ছাড়া আর কোন মানুষকেই দেখা যায় না। তার দুধ-রাখা টিনের পাত্রের উপর সূর্যের আলো পড়ে ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে—তাদের মন এ দেখে স্ফূর্তিতে ভরে যায়। কোনদিন তারা এ মেয়েটি সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করে না। একে দেখলে কেন যেন তাদের আনন্দ হয়, তা তারা নিজেরাই জানেও না, তবে একে দেখলে তারা খুশী হয়।

মেয়েটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও সুন্দর—চুলগুলি লাল—রোদে তার রং জ্বলে গেছে—

তাদের একই জায়গায় দেখে একদিন ঐ মেয়েটি বলে উঠল: সুপ্রভাত। আপনারা দুজন সব সময়েই এখানে থাকেন, কেমন না?

লাফ একটু সাহসী। সে তোতলাতে তোতলাতে বলে:

: হ্যাঁ, আমরা একটু জিরোতে এখানে আসি।

কিন্তু পরের রবিবার সে ওদের দেখে হেসে ওঠে—কিন্তু সে হাসিতে যেমন একটু মায়া ছিল, তেমনি আবার ছিল সংযম—আরও ছিল স্ত্রীসুলভ কোমলতা: ওরা যে লাজুক তা মেয়েটি জানত। তাই সে জিজ্ঞাসা করলে: এখানে কি হচ্ছে? ঘাস কেমন গজাচ্ছে, তাই বোধহয় দেখছ!

লাফ খুশী হয়ে উঠল, উৎসাহও পেল একটু। সে হেসে বললে: হয়ত তাই!

মেয়েটি বললে: খুব ধীরে ধীরে বাড়ে।

লাফ হাসছিল। বললে, হ্যাঁ, তা বটে!

মেয়েটি চলে গেল। কিন্তু সে পাত্রভর্তি দুধ নিয়ে পরে ফিরে এসে তাদের কাছে দাঁড়িয়ে বললে ঃ একটু চেখে দেখবে নাকি? খেতে ঠিক বাড়ীর দুধের মত লাগবে।

মেয়েটি মনে-প্রাণে বুঝেছিল যে, তারা একই কৃষক-পরিবারের লোক। সে নিজেও বাড়ী ছেড়ে দূরে কাজ করতে এসেছিল, কাজেই ঠিক জায়গায় সে ঘা দিলে।

তারা দুজনেই অভিভূত হল। তারপব বহুকষ্টে মদের খালি বোতলের সরু মুখ দিয়ে মেয়েটি একটু দুধ ঢেলে দিলে। লাফ প্রথমে খেলে, মাঝে মাঝে সে অবশ্য দেখছিল যে, সে তার অর্ধেকের বেশী খেয়ে ফেলেছে কিনা। তারপর তার খাওয়া হ'লে, সে বোতলটা জাঁকে দিয়ে দিলে।

তারপর মাটীতে দুধের পাত্র নামিয়ে রেখে মেয়েটি তাদের সামনে কোমরে হাত দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। ওদের তৃপ্তি দিচ্ছে বলে, তার মনেও যথেষ্ট খুশির ঢেউ উঠল।

তারপর যাবার সময় সে বলে গেল ঃ বিদায়! আবার আসছে রবিবার দেখা হবে কিন্তু!

যতদূর পর্যন্ত তাকে দেখা গেল—তাদের দুচোখ তার ঢ্যাঙা শরীরটা অনুসরণ করল। ক্রমশঃ ছোট্ট হতে হতে মেয়েটিকে আর দেখা গেল না—মাঠের গাছপালার মধ্যে তার দেহ মিলিয়ে গেল।

পরের সপ্তাহে ব্যারাক থেকে বার হবার সময় জাঁ লাফকে বললে ঃ ওর জন্যে ভালো দেখে কিছু নিয়ে গেলে হয় না?

গরু নিয়ে যে মেয়েটি আসে, তার জন্যে কি কিনে নিয়ে যাওয়া হবে, তাই নিয়ে তারা কিছুতেই একমত হতে পারে না—শেষে তারা কতকগুলো শাদা আর লাল লজেন্স কেনে।

তাড়াতাড়ি করে তারা তাদের প্রাতরাশ খেয়ে নেয়—উত্তেজনায় তারা ধড়ফড় করতে থাকে।

জঁা তাকে প্রথম দেখে : সে চেঁচিয়ে ওঠে ; ঐ সে আসছে।

লাফ বলে : হ্যাঁ, ঐ ত!

একটু দূরে থেকে মেয়েটি তাদের দেখে হাসে। তারপর সে চেঁচিয়ে বলে : সব ঠিক মত চলছে ত ?

দুজনে একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে : তুমি ভাল আছ ত ?

তারপর মেয়েটি ওদের সঙ্গে গল্পগুজব জুড়ে দিলে—আবহাওয়া, ফসল, তার মনিব, এইসব বিষয়ে সে গল্প করতে থাকে।

তাকে লজেন্স দিতে ওদের কিন্তু সাহস হয় না। জঁার পকেটে লজেন্সগুলো গলতে থাকে।

লাফ একটু সাহস করে বলে উঠে : তোমার জন্যে এক জিনিস এনেছি আমরা।

সে আগ্রহ করে বলে : কিগো, বলো না—

তখন জঁা লজ্জায় লাল হয়ে পকেট থেকে কাগজে-মোড়া লজেন্স বার করে ধরে।

সে ছোট ছোট লজেন্সের গুলিগুলো খেতে থাকে। এক গাল থেকে আরেক গালে ঘুরিয়ে সে লজেন্স খায়—লজেন্সগুলো তার গালের ওপর থেকে উঁচু-উঁচু গোল টেবোর মত দেখায়। ছোট সৈনিক দুটি তার সামনে বসে একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মনে আনন্দে আর আবেগে এক আলোড়ন তোলে।

তারপর সে দুধ দুইতে যায়, ফেরবার সময়ে সে আবার তাদের খানিকটা দুধ দিয়ে যায়।

সারা সপ্তাহ ধরে তারা তার কথাই ভাবে—তার কথা বার বার বলে। এর পরের রবিবার সে তাদের সঙ্গে বসে বেশ খানিকক্ষণ গল্প করে—তিনজন হাঁটুতে হাত দিয়ে কাছাকাছি বসে তাদের জীবনের ছোট ছোট ঘটনা—গ্রামের কথা, যে গ্রামে তাদের জন্ম, তার আলোচনা করে—গরুটা দূরে বাঁধা থাকে। সেখান থেকে দড়িটা টান করে মুখ উঁচু করে গরুটা ডাকতে থাকে।

একটু পরে মেয়েটি তাদের সঙ্গে এক টুকরো রুটি, এক ঢোক মদ খায়। মেয়েটি প্রায়ই তাদের জন্যে ফুল নিয়ে আসে—তখন ফুলের মরশুম। মেয়েটি এলেই সৈনিক দুজনের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, পাখীর মত তারা কাকলি জুড়ে দেয়।

কিন্তু, এক মঙ্গলবার লাফলে গ্যানিডেফ্ ছুটি নেয়—এর আগে কোনদিন সে এমনি ছুটি নেয় নি—রাত দশটার আগে সেদিন সে আর ফিরল না। কিন্তু জঁা ভেবে পায় না, তার বন্ধু এভাবে কোথায় যেতে পারে।

তারপর আবার বৃহস্পতিবার, লাফের ঘরে যে শোয়, তার কাছ থেকে দশ স্যু ধার করে কয়েক ঘণ্টার ছুটি নিয়ে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে যায়। রবিবার যখন সে জঁার সঙ্গে বেড়াতে বেরোয়, তখন তার চালচলন বড়ো অদ্ভূত মনে হয়—সে যেন অস্থির, কেমন যেন বদলে গেছে। এর কারণ কি, কার্ডোরেন ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু, তার মনে একটা সন্দেহ জাগে।

পথে তারা একটাও কথা বলে না। যেখানে তারা এসে বসত, সেখানকার ঘাস শুকনো হয়ে গেছে। সেখানে এসে তারা প্রাতরাশ খেয়ে নেয়। কারুরই যেন ক্ষিদে নেই!

একটু বাদেই মেয়েটিকে আসতে দেখা যায়। অন্য রবিবারের মত তারা তার জন্যে তাকিয়ে থাকে—তার এগিয়ে আসা লক্ষ্য করতে থাকে। সে খুব কাছে এসে পড়তেই লাফ উঠে দু-এক পা এগিয়ে যায়। মেয়েটি দুধের কেঁড়ে মাটিতে নামিয়ে রেখে লাফকে চুমু খায়! দুহাত দিয়ে লাফের গলা জড়িয়ে গভীর আবেগে তাকে চুমু খাবার সময়ে মেয়েটি যেন ভুলে যায় যে, সেখানে জঁা আছে, জঁাকে যেন সে লক্ষ্যই করেনি—ধর্তব্যের মধ্যেই মনে করছে না।

জঁা বসেই থাকে—বেচারা জঁা—সে কিছু বোঝে না কিন্তু তার মনটা যে হু-হু করতে থাকে—সে যেন মরীয়া হয়ে যায়—ভিতরে ভিতরে সে একেবারে দিশেহারা হয়ে যায়—মনে হয় তার বুকটা

ফেটে যাবে। তারপর মেয়েটি লাফের পাশে বসে আর তার সঙ্গে কল্‌কল্‌ করে কথা বলে যায়।

জঁা এদের দিকে তাকায় না। এখন সে বুঝতে পারে, এ সপ্তাহে তার বন্ধু দুদিন কোথায় কি করতে এসেছিল। তার মনের ভেতরটা দুঃখে পুড়ে খাক্‌ হয়ে যায়—যেন একটা ক্ষত—একটা ছিঁড়ে যাওয়া বেদনা—বিশ্বাসঘাতকতার বেদনা তাকে পীড়া দেয়।

গরুর খোঁটা সরিয়ে দেবার জন্যে মেয়েটির সঙ্গে লাফও যায়। জঁা শুধু বসে বসে দেখে। সে তাদের পাশাপাশি যেতে দেখে। লাফ খোঁটা তোলে এবং অন্য জায়গায় মুগুর দিয়ে খোঁটা পুড়ে দেয়।

মেয়েটি দুধ দোয়—লাফ গরুর পিঠে হাত বুলোয়। তারপর ঘাসের উপর দুধের কেঁড়ে রেখে তারা বনের মধ্যে চলে যায়।

জঁার মনের মধ্যে এত উত্তেজনা হয় যে, সে যদি তখন ওঠবার চেষ্টা করে তবে হয়ত সে পড়ে যাবে। সে চিত্রার্পিতের মত বসে থাকে। সে স্তম্ভিত হয়ে যায়—গভীর মনকষ্টে সে কাতর হয়ে পড়ে। তার কান্না আসে—মনে হয় কোথাও ছুটে পালালে বা কোথাও গিয়ে লুকোলে ভাল হয়—এমন যেন আর কোনদিন দেখতে না হয়।

একটু বাদেই ঝোপের মধ্যে থেকে তাদের বেরোতে দেখা যায়। তারা ধীরে ধীরে আসছে—দুজনে হাত ধরাধরি করে আসছে—যাদের বিয়ের কথা ঠিক হয়ে গেছে, তারা যেমন ঘোরে, তেমনি করে। লাফ দুধের কেঁড়েটা নিয়ে আসে।

চলে যাবার আগে তারা আরেক দফা চুমু খায়। যাবার আগে মেয়েটি জঁাকে বন্ধুভাবে বিদায় জানিয়ে যায় এবং কেমন একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসে। আজ আর সে তাকে দুধ দিতে আসে না।

ছোট্ট সৈনিক দুজন পাশাপাশি বসে থাকে—কেউ নড়ে না—কেউ কথা বলে না—তাদের মুখ শান্ত—হৃদয়ের চিন্তারাশির ঢেউ মুখে ফুটে উঠেনা। সূর্য ঢলে পড়ে—গরুটা তাদের দেখে ডেকে ওঠে।

ঠিক সময়ে ব্যারাকে ফেররার জন্যে তারা ওঠে। লাফ একটা ডাল কেটে নেয়। বেজন্‌সের মদের দোকানে ফেরৎ দেবার জন্য জঁা খালি বোতলটা নেয়। তারপর তারা ব্রীজের ওপর এসে হাজির হয় এবং প্রতি রবিবারের মতই ব্রীজের মাঝখানে মাঝে মাঝে থেমে নীচে সীন নদীর জলস্রোতের গতি লক্ষ্য করে।

জঁা ঝুঁকে পড়ে দেখে—খুব বেশী করে ঝোঁকে—লোহার রেলিং থেকে ঝুঁকে সে নীচে কি লক্ষ্য করছে। লাফ বলে : কিহে, জল খাবার চেষ্টা করছ নাকি ?

তাই এই কথা শেষ হতে-না-হতে জঁার মাথা যেন শরীরের টাল রাখতে না পেরে শূন্যে একটা বৃত্ত রচনা করে তালগোল পাকিয়ে ঝপ্‌ করে নীচে নদীর জলে পড়ে মিলিয়ে যায়।

লাফ চীৎকার করতে চেষ্টা করে, কিন্তু তা পারে না—গভীর আফশোষে তার যেন কথা ফোটে না। একটু দূরে সে দেখে কী যেন নড়ছে। তারপরে তার বন্ধুর মাথাটা একবার জলের উপর ভেসে উঠেই আবার ডুবে যায়। আর একটু দূরে সে একটি মাত্র হাত দেখতে পায়—ঢেউয়ের মাথায় হাতটা ভেসে উঠেই মিলিয়ে যায়। তারপর সব শেষ।

নৌকো করে খোঁজাখুঁজি চলে কিন্তু সেদিন তার মৃতদেহ পাওয়া যায় না।

লাফ একাকী দৌড়ে ব্যারাকের দিকে যেতে থাকে—মনভরা তার হতাশা—দু চোখে ভরা জল—সে দুর্ঘটনার বিবৃতি দেয়—গলা তার ধরা—নাক দিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ করে সে নিঃশ্বাস ফেলে।

: ও ঝুঁকে পড়েছিল—এত বেশী ঝুঁকে পড়েছিল যে, তার শরীরটা ডিগবাজী খেয়ে জলে পড়ে গেল !

কান্নায় তার স্বর বন্ধ হয়ে গেল—সে আর কোন কথা বলতে পারল না। কিন্তু সে যদি জানত—

---

## উনিশ

### ॥ আর্দালি ॥

সেনাবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীতে কবরডাঙা ভরে গেছে—যেন ফুল ফুটেছে। লাল পাজামা, সোনার বোতাম, জামার স্ট্রাইপ, সৈন্যদের নিয়ত আনা-গোনা, চতুর্দিকের কববের উপর শাদা-কালো ক্রুশচিহ্নের মধ্যে শোভা পাচ্ছে। লোহা, পাথর আর কাঠের ক্রুশগুলো যেন দু হাত বাড়িয়ে তাদের ডাকছিল।

কর্ণেল লিমোশিনের স্ত্রীকে এইমাত্র কবর দেওয়া হল। স্নান কববার সময় তিনি দু'দিন আগে ডুবে মারা যান। যাক্—কবর দেওয়া হয়ে গেছে। ধর্মযাজক চলে গেছেন, 'কিন্তু কর্ণেল এখনও কববের গর্তের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে দুজন অফিসার দু পাশ থেকে ধরে রেখেছেন। কবরের নীচে এখনো ওক কাঠের শবাধাব দেখা যাচ্ছে। এই শবাধারে তাঁর স্ত্রীর মৃতদেহ পচতে শুরু করেছে।

কর্ণেল প্রায় বুড়ো হয়েছেন। লোকটি ঢ্যাঙা ও রোগা—তাঁর গোঁফ পেকে শাদা হয়ে গেছে। বছর তিন আগে তিনি তাঁর এক সহকর্মী বন্ধুর এই মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। লোকটির নাম কর্ণেল সর্টিস্—বাপের মৃত্যুতে মেয়েটিকে দেখবার কেউ ছিল না।

লেফ্‌টেন্যান্ট্ আর ক্যাপ্টেন কর্ণেলকে ধরে ছিলেন। তাঁরা কর্ণেলকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কর্ণেল বাধা দিলেন, তাঁর চোখ জলে টল্ টল্ করছিল। তিনি শক্ত হয়ে ভাবাবেগ দমন করলেন। বললেন: না, না, আর একটু থাকতে দাও।

হাঁটু গেড়ে ঝুঁকে পড়ে তিনি সেই অতলস্পর্শ গহ্বরের নীচে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মনে হল যে, এই গর্তের মধ্যে তাঁর হৃৎপিণ্ড পড়ে গেছে। তাঁর জীবন আর তাঁর যা কিছু প্রিয়তম সবই পড়ে গেছে।

সহসা জেনারেল অরমণ্ট্ এসে কর্ণেলের হাত ধরে জোর করে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললেন: এসো বন্ধু, এখান থেকে তোমাকে যেতেই হবে।

কর্ণেল নিজের বাড়ীতেই ফিরে এলেন। তাঁর পড়ার ঘরের দরজা খুলতেই তিনি দেখলেন টেবিলে একটা চিঠি রয়েছে। চিঠিটা হাতে নিয়ে তিনি এত অবাক হয়ে গেলেন যে, তিনি প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন। এ যে তাঁর স্ত্রীর হস্তাক্ষর! চিঠিতে সেই দিনের তারিখ রয়েছে। খামটা ছিঁড়ে তিনি চিঠিটা বার করেই পড়তে শুরু করলেন!

: বাবা, তোমাকে আগে যেমন বাবা বলে ডাকতাম, তেমনি ভাবেই আমাকে ডাকতে দিও। এ চিঠি যখন তুমি পাবে, তখন আমি আর নেই, মাটির তলায় চলে গেছি। কাজেই, হয়ত তুমি আমাকে ক্ষমা করবে।

: তোমার করুণা জাগাতে চাই না অথবা আমার পাপকেও খাটো করতে চাই না। এক ঘণ্টার মধ্যে যে মরতে যাচ্ছে, সে তার সমস্ত অন্তর দিয়ে তোমার কাছে সব কথা আনুপূর্বিক খুলে বলতে চায়।

: তুমি আমাকে যখন বিয়ে করেছিলে, তখন মহৎ হৃদয়েরই পরিচয় দিয়েছিলে, আর আমি তোমাকে বালিকাসুলভ হৃদয়ের সব মাধুর্য দিয়েই ভালবেসেছিলাম। আমার নিজের বাবাকে যেমন ভালবাসতাম, তোমাকেও প্রায় ততখানিই ভালবেসেছি। একদিন আমি যখন তোমার কোলে বসেছিলাম—আর তুমি আমাকে চুমু খাচ্ছিলে, তখন আমি নিজেকে দমন করতে না পেরে তোমাকে বাবা বলেই সম্বোধন করেছিলাম। এ আমার হৃদয়ের ভাষা—

স্বতঃস্ফূর্ত, আদিম আবেগপূর্ণ ভাষা। সত্যিই ত। তুমি ত আমার কাছে বাবা ছাড়া আর কিছু নয়ই।

তুমি হেসেছিলে ঃ আমাকে ঐ ভাবেই তুমি ডেকো, বাছারে! এতেই আমি আনন্দ পাই।

ঃ আমরা শহরে এলাম; বাবা আমাকে মাফ কোরো, এখানে এসে আমি প্রেমে পড়লাম। হায়! আমি দুবছর ধরে এ প্রেম ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছি—কিন্তু শেষটায় আমি হার স্বীকার করলাম, আমি পাপ করলাম, আমি হয়ে গেলাম একটা নষ্ট মেয়ে।

ঃ কিন্তু সে লোকটি কে? তুমি কোন দিন ধারণা করতে পারবে না সে লোকটি কে। ও বিষয়ে আমার কোন উদ্বেগ নেই—তখন আমার চারদিকে প্রায় জন বারো কর্মচাবী সব সময়েই থাকত—যাদের তুমি আমার বারোটি উপগ্রহ বলে মন্তব্য করতে।

ঃ বাবা, তার নাম জানবার চেষ্টা কোবো না, তাকে ঘৃণা কোরো না। সে যা করেছে, সে-অবস্থায় পড়লে যে-কোন লোকই তাই করতো। তবে হ্যাঁ, আমাকে সে যে ভালবেসেছিল, সে বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র নেই—সে প্রকৃতই মনপ্রাণ দিয়ে আমাকে ভাল-বেসেছিল।

ঃ কিন্তু শোনো, একদিন বেকাসেস্ দ্বীপের মধ্যে আম দের দেখা-সাক্ষাতের স্থান ঠিক করা হল। কারখানার ধারে সেই ছোট দ্বীপটা তুমি জানো। সাঁতার কেটে আমাকে সেখানে যেতে হল। সে সেখানে একটা ঝোপের আড়ালে আমার জন্য প্রতীক্ষা করেছিল। তারপর যাতে কেউ তাকে সেখান থেকে চলে আসতে দেখতে না পায়, সেজন্যে তাকে রাত পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

সবে, তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, এমন সময়ে গাছের ডাল ফাঁক করে ফিলিপকে হাজির হতে দেখল ম। তোমার আর্দালি—ফিলিপ। ফিলিপ আমাদের বেশ ভয় লাগিয়ে দিলে। ভাবলাম, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে—ভয়ে আমি চীৎকার করে উঠলাম।

তখন আমার প্রেমিক সেই অফিসারটি বললে : যাও প্রিয়ে, তুমি শান্ত মনে আস্তে আস্তে সাঁতার কেটে ফিরে যাও—আমি আর এই আর্দালি ফিলিপ এখানে রইলুম।

: আমি এত উত্তেজিত হয়েছিলাম যে, প্রায় ডুবে যাই আর কি! কিন্তু তোমার কাছে ফিরে এলুম—মনে সব সময়েই আমার মনে ভয়, এই বুঝি ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটে!

: এক ঘণ্টা পরে বৈঠকখানার পাশের বারান্দায় ফিলিপের সঙ্গে আমার দেখা হল। আমাকে ফিস্ ফিস্ করে সে জানালে—

: আপনি যা বলবেন তাই করব—কোন চিঠিপত্র দিতে হবে কি? তখন বুঝলাম যে, লোকটাকে টাকা দিয়ে বশ করা হয়েছে—আমার প্রেমিকই তাকে টাকা দিয়েছে।

: তাকে আমি চিঠি দিতাম—সব চিঠিই সে নিয়ে যেত, আমাকে উত্তর এনে দিত।

: এই রকম প্রায় দু মাস চল্‌ল। আমরা উভয়েই তাকে বিশ্বাস করতাম—তুমিও ত ওকে বিশ্বাস কর।

: এবার বাবা, শোনো যা ঘটল। একদিন এই দ্বীপেই আমি একা সাঁতার কেটে গিয়ে দেখি—তোমার এই আর্দালিটা সেখানে রয়েছে। এ লোকটা সেখানে আমার জন্য ওৎ পেতে বসেছিল। সে আমাকে বললে, যদি না আমি তার বাসনা পূরণ করি, তবে সে আমাদের সব কথা তোমাকে বলে দেবে—তাছাড়া আমাদের কতগুলি চিঠি সে রেখেছে, সেগুলো তোমাকে দেখাবে।

: হায়! বাবা, ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল—এ ভয় ভীরুতা ছাড়া কিছু নয়, এ রকম ভয় হওয়া আনার উচিত ছিল না—কিন্তু সব থেকে আমার ভয় হল তোমাকে। তুমি আমার উপর ভাল ব্যবহার করেছ—আর আমি কিনা তোমাকেই ঠকিয়েছি! এই ভেবে ভয় হল যে, তুমি হয়ত আমার প্রেমিককে হত্যা করবে—কিম্বা হয়ত আমাকেও।

আমি পাগল হয়ে গেলাম, মরিয়া হয়ে উঠলাম! ভাবলুম, এই শয়তানটাকে কিছু ঘুষ দিই—কিন্তু কি লজ্জা! এও আমাকে ভালবেসেছিল।

ঃ আমরা, মেয়েছেলেরা, কত দুর্বল—তোমাদের চেয়ে কত সহজে আমাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়! কত সহজে আমরা অপরের শিকার হই! তারপর, স্ত্রীলোকের একবার পতন হলে কি আর রক্ষা আছে। সে ক্রমশঃ নীচে নামতে থাকে। তখন কি আর আমার জ্ঞান আছে যে, আমি কি করছি তা বুঝব! বেশ বুঝলাম যে, তোমাদের দুজন আর আমি—এদের একজনকে মরতেই হবে—কাজেই এই পশুটার কাছে আমি আত্মসমর্পণ করলাম।

"বাবা, আপনি মনে করবেন না যে, আমি আমার পাপের একটা কৈফিয়ৎ দিতে চাইছি। আগে থেকেই আমার যা বোঝা উচিত ছিল, তাই তখন ঘটতে লাগল।

যখনই তার ইচ্ছা হ'ত, আমাকে ভয় দেখিয়ে লোকটা তার বাসনা চরিতার্থ করতে বারবার আমাকে ভোগ করতে লাগল।

"কাজেই আমার সব কিছু ফুরিয়ে গেল। একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আমার আর অব্যাহতির পথ রইল না। বেঁচে থেকে এমন একটা পাপের কথা তোমাকে আমি বলতে পারতুম না! মরে গিয়ে আমি সব কিছুই করতে পারলাম। মরা ছাড়া আর অন্য পথ আমার ছিল না, কোন কিছুতেই আমি নিজেকে অকলঙ্ক রাখতে পারতাম না। হায়! আমার পাপের কি সীমা আছে! এখন আমি ভালবাসতে পারি না—ভালবাসা পাবার যোগ্যতাও আমি হারিয়েছি। এখন কেউ আমাকে স্পর্শ করলেই, আমার মনে হত আমি যেন তাকে কলঙ্কিত করছি।

"এখনই আমি স্নান করতে যাচ্ছি। আমি আর ফিরে আসব না। তোমাকে লেখা এই চিঠিটা আমার প্রেমিকের কাছে যাবে। এ চিঠি যখন তার কাছে পৌঁছবে, তখন আমি আর এ জগতে নেই।

এ সম্বন্ধে কেউ জানতে পারবে না। আমার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী, সে চিঠিটা তোমাকে পাঠিয়ে দেবে। কবরডাঙা থেকে ফিরে এসে, তুমি এ চিঠি পড়বে।

"বিদায় বাবা, আর আমার কিছু বলবার নেই। তোমার যা ইচ্ছা হয়, তাই কোরো, তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো।"

কর্ণেলের কপাল ঘামে ভিজে গিয়েছিল। তিনি কপালের ঘাম মুছে ফেললেন। তিনি একটা অপূর্ব শান্ত ভাব ধারণ করলেন, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যখন যুদ্ধ করেছেন, তখনও তাঁর এইরকম শান্ত ভাব ছিল। তিনি ঘণ্টা বাজালেন।

একজন চাকর এসে দাঁড়াল। কর্ণেল বললেন, "ফিলিপকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।" তারপর তিনি টেবিলের ড্রয়ার সামান্য খুললেন।

সঙ্গে সঙ্গে ফিলিপ এসে দাঁড়াল—ফিলিপ লাল গোঁফওয়ালা একজন তাগড়া সৈনিক, চোখ দুটোতে ধূর্ততা মাখানো—মুখে শয়তানির ছাপ।

কর্ণেল সোজা তার মুখের দিকে তাকালেন।

"আমার স্ত্রীর প্রেমিকের নামটা বলো দেখি।"

"কিন্তু কর্ণেল—"

আধখোলা ড্রয়ার থেকে পিস্তলটা হাতে নিলেন কর্ণেল।

"হ্যাঁ! তাড়াতাড়ি। আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিনা।"

"এ—এ—কর্ণেল, তিনি হচ্ছেন ক্যাপ্টেন সন্ত অ্যালবার্ট।"

এই কথা কটির উচ্চারণ শেষ হতে না হতে, তার চোখের সামনে দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল—তার কপাল ফুটো হয়ে গেল। সে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল।

———

## কুড়ি

## ॥ সাইমনের বাপ ॥

বারোটা বেজেছে। স্কুলের দরজা খুলে গেল আর ছোট ছেলেরা জলস্রোতের মত হুড়মুড় করে, ঠেলাঠেলি, হুড়োহুড়ি করে, এ-ওর গায়ের উপর পড়ে, তাড়াতাড়ি বাইরে আসবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তাড়াতাড়ি বাইরে এসে অন্য অন্য দিন যেমন তারা বাড়ীতে খেতে যায়, তারা আজ তা না করে ছোট ছোট জোট পাকিয়ে কি যেন বলাবলি করতে লাগল।

ব্যাপার আর কিছু নয়, সেই দিনই প্রথম লা ব্লাঁশোতের ছেলে সাইমন স্কুলে এসেছে।

ছেলেরা সকলেই তাদের বাড়ীতে লা ব্লাঁশোতের কথা শুনেছে। প্রকাশ্যে তাকে লোকে খাতির করলেও, মায়েরা নিজেদের মধ্যে তাকে করুণা করত, কেমন যেন ঘৃণার ভাবও সে সঙ্গে খানিক ছিল—এব কারণ কি তা অবশ্য ছেলেরা ধরতে পারতো না।

আর সাইমনকে তারা চিনতই না, সে বড় বাইরে বেরুত না, তাদের সঙ্গে খেলা করত না—না পথে, না নদীর ধারে। কাজেই তারা সাইমনকে পছন্দ করত না। তাদের মধ্যে চৌদ্দ-পনের বছরেব ছেলের কাছ থেকে একটা কথা পেয়ে, আজ তারা খানিক স্ফূর্তিতে, খানিক অবাক হয়ে, চোখ মট্‌কে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, "ঐ যে সাইমন না, বুঝলি ওর বাপ নেই।" যে ছেলেটা এ কথা মাথা খাটিয়ে বার করেছিল, সে যেন সব কিছু জানে।

লা ব্লাঁশোতের ছেলে স্কুলের দরজার চৌকাঠে এসে দাঁড়াল।

ছেলেটির বয়স সাত কি আট বছর, একটু ফ্যাকাশে, কিন্তু খুব ছিমছাম পরিষ্কার—তবে ভীরু আর কেমন অদ্ভুত জবড়জং গোছের।

সে তার বাড়ীর দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় তার সহপাঠিদের ভিন্ন ভিন্ন দল থেকে থেকে অনবরত নানা ফিস্‌ফিসানি সুরু করলো, তার দিকে শয়তানের চোখে চাইতে লাগল। আর ছেলেরা যখন কোন জঘন্য কাজ করে, তখন যেমন নিষ্ঠুরভাবে মেতে যায়, তেমনিভাবে তাকে চারদিক থেকে একেবারে ছেঁকে ধরলো।

বেচারা আশ্চর্য হয়ে বিব্রতভাবে ভাবতে লাগল, এরা কি করতে চায়। কিন্তু যে ছেলেটি এই খবর এনেছিল, সে তার ফন্দি ঠিকভাবে কাজে লেগেছে দেখে গর্বভরে এগিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে বললে ঃ

ঃ এই তোর নাম কি-রে ?

ছেলেটি বললে ঃ সাইমন।

বড় ছেলেটি বললে ঃ সাইমন কী ?

ছেলেটি ভড়কে গিয়ে বললে ঃ সাইমন।

বড় ছেলেটি চীৎকার করে বললে ঃ তোর নাম সাইমন আর কিছু নিশ্চয়ই হবে ! ওটা কি নাম নাকি—সাইমন আবার কি !

ছেলেটির চোখে তখন জল এসে গেছে। সে তৃতীয় বার বললে— আমার নাম সাইমন।

ছেলেরা হাসতে লাগল। বড় ছেলেটি জোর গলায় বললে ঃ বেশ বুঝতে পারছিসতো—ওর বাপ নেই।

চতুর্দিকের সব গোলমাল যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ছেলেরা এই অস্বাভাবিক, অসম্ভব, কদর্য ব্যাপার শুনেই নির্বাক হয়ে গেল। একটা ছেলের বাপ নেই! তাদের মায়েরা লা ব্লাঁশোতের প্রতি যে করুণা করে, সেই করুণা তাদের মধ্যেও দেখা দিল—এ যেন এক অস্বাভাবিক জীব—অদ্ভুত, আশ্চর্য। আর সাইমন। সে বেচারা একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—হয়ত বেচারি পড়েই যেত। ভীষণ একটা বিপদ যেন তার হাত পা অবশ করে দিয়েছে। সে বোঝাতে চেষ্টা করলে, কিন্তু কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না—

তার যে বাপ নেই, এই ভয়ঙ্কর অভিযোগ অস্বীকার করবার তার পথ নেই। শেষে সে মরিয়া হয়ে চীৎকার করে বললে, "হ্যাঁ, আছে।"

ছেলেটা বললে : আছে, কিন্তু কোথায় ?

সাইমন চুপ করে গেল। সে তা জানে না। উত্তেজিত হয়ে ছেলেরা ভীষণ চেঁচামেচি জুড়ে দিল। এই সব মজুরদের ছেলে-মেয়ে পশুর সমান। এরা সব যেন গোলাবাড়ির মুরগীর মতো,—একবার একটু আহত হলে নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করে ফেলে। সাইমন সহসা তার একটি প্রতিবেশীর এক ছেলেকে দেখতে পেলে—সে এক বিধবার ছেলে। এই ছেলেটিকে সে প্রায়ই রোজই দেখে। সে তাকে বললে : তোমারও ত বাপ নেই—তোমারও ত বাপ নেই।

ছেলেটি বললে : হ্যাঁ, আছে।

সাইমন জিজ্ঞাসা করলে : কোথায় তোমার বাপ ?

"আমার বাপ মরে গেছে—আমার বাবা কবরডাঙায়, কবরের তলায় আছে।" ছেলেটির কথার মধ্যে একটা গর্ব ফুটে উঠল।

নির্যাতনকারীদের মধ্যে থেকে একটা যেন সাবাস্ ধ্বনি উঠল—তাদের বন্ধুর বাবা কবরে শুয়ে আছেন কিন্তু অপর ছেলেটির যে আদপে বাপই নেই। এই ছেলেগুলির বাপ দুষ্কর্মকারী, মাতাল চোর, স্ত্রীদের ওপর নির্যাতনকারী। তবুও, তারা সাইমনকে যেন পিষে ফেলবার উপক্রম করলে—তারা হচ্ছে নিজেদের বাপের সন্তান আর সাইমন জারজ সন্তান।

সাইমনের পাশ থেকে একটা ছেলে সাইমনকে জিভ ভেঙিয়ে চীৎকার করে উঠল, "বাপ নেই, বাপ নেই।"

সাইমন দু হাতে তার চুলের মুঠি ধরলে এবং তার পায়ে অনবরত লাথি মারতে লাগল—যেন তার পা দুটো সে থেতলে দেবে। ছেলেটাও সাইমনের গাল ভীষণভাবে কামড়ে দিলে। দুই ছেলেতে ভীষণ ঝটাপটি বেধে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাইমন বেশ মার খেল, তার গা ছড়ে গেল—ধুলোয় সে গড়াগড়ি খেল আর তাকে ঘিরে

ছেলের দল আনন্দ উল্লাস করতে লাগল। জামা ছিঁড়ে দু হাতে ধুলো মেখে সে যখন কোনক্রমে উঠে দাঁড়াল, কে যেন তাকে বলে উঠল :

: যা তোর বাপকে বলগে যা—

সাইমনের হৃদয় দমে গেল। ওরা তার চেয়ে শক্তিশালী—ওরা তাকে হারিয়ে দিয়েছে—সে ওদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। সে জানে সত্যি সত্যিই ত তার বাপ নেই। সে নিজের সম্মান বজায় রাখবার জন্য কান্না চেপে ছিল—চাপা কান্নায় তার গলা বুজে এল—ককিয়ে যাবার মত হল। তারপর সে ভীষণ ভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—কান্নায় সে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। এই দেখে তার শত্রুপক্ষের ভীষণ আনন্দ হল—আর ভয়ঙ্কর বন্য মানুষরা উৎসবে যেমন পরস্পরের হাত ধরে ধেই-ধেই করে নাচে, তেমনি করে সাইমনকে ঘিরে তারা নাচতে লাগল।

: বাপ নেই, বাপ নেই।

কিন্তু সহসা সাইমনের কান্না থেমে গেল। সে যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তার পায়ের কাছে যে সব পাথর পড়ে ছিল, সেগুলি উঠিয়ে তার প্রতি অত্যাচারকারীদের দিকে হিংস্রভাবে ছুঁড়তে লাগল। দু তিনটে ছেলের গায়ে পাথর এসে লাগায়, তারা চীৎকার করতে করতে ছুটে পালালো। তাকে তখন এমন দুর্ধর্ষ দেখাচ্ছিল যে, বাকী সব ছেলেরা ভয় পেয়ে গেল। আর কৃতসংকল্প মরীয়া লোকের সামনে থেকে যেমন বিদ্রূপকারী জনতা ভেসে যায়, তেমনি করে তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালালো। সেই পিতৃহীন বালক—একাই মাঠের দিকে ছুটতে লাগল; এই কথা মনে হতেই তার যেন একটা ঝোঁক চেপে বসল। নদীতে ডুবে মরবার জন্য সে মনে মনে স্থির করে ফেললে।

তার মনে পড়ল; এ অঞ্চলে একজন ভিখারী ভিক্ষা করত, সে গরীব ছিল। সে দিন আষ্টেক আগে ক্ষুধার তাড়নায় নদীর জলে

ঝাঁপ দেয়। যখন জাল দিয়ে তার দেহ ডাঙায় তোলা হয়, তখন সাইমন সেখানে ছিল। তার সেই চেহারা তার মনে একটা গভীর ছাপ রেখে গেছে—বিবর্ণ গাল, জলে ভেজা লম্বা দাড়ি আর তার খোলা শান্ত দুটি চোখ। যারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তারা বললে : লোকটা মরে গেছে !

অপর একজন বললে : আহা, বেচারা এখন সুখী !

কাজেই সাইমন জলে ডুবে মরতে চাইল। তারও ত বাপ নেই হতভাগা লোকটা গরীব ছিল, সাইমনের দুঃখও ত তেমনি।

সে জলের ধারে এসে উপস্থিত হল। বসে বসে দেখতে লাগল, জল তরতর করে বয়ে চলেছে। কতকগুলো মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে—লাফিয়ে উঠে জলের পোকা ধরে খাচ্ছে। এই সব দেখতে দেখতে তার কান্না থামলো—মাছেদের খেলা দেখতে তার বেশ ভাল লাগছিল। কিন্তু ঝড়ের মাঝে মাঝে যেমন এক একবার বাতাসের ঝাপটাতে গাছের মাথাগুলো নুইয়ে দিয়ে চলে যায়, তেমনি এই চিন্তাটা বার বার তার মনে ব্যথার ঢেউ তুলে দিয়ে যেতে লাগল।

: আমার বাপ নেই, কাজেই আমাকে এখুনি ডুবে মরতে হবে।

আবহাওয়া ছিল বেশ সুন্দর—গরম—রোদ আরামপ্রদ—ঘাসের উপর একটা মনোরম গরম জল আয়নার মত চক্ চক্ করছে। কান্নার পর যেমন একরকম আবামপ্রদ অবসাদ সারা দেহ ছেয়ে দেয়, মাঝে মাঝে তেমনি অবসাদে সাইমনের যেন ঘুম আসছিল—মনে হচ্ছিল, এই ঘাসের উপর শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

তার পায়ের তলা থেকে একটা ব্যাং লাফ দিল। সে তাকে ধরবার চেষ্টা করলে। কিন্তু ব্যাংটা পালালো। সে তার পিছনে পিছনে তাড়া করল—কিন্তু তিন তিনবার সে তাকে কোথায় যেন হারিয়ে ফেললে। শেষটায় যখন সে তার পিছনের একটা পা ধরে ফেললে—তখন তার পালাবার চেষ্টা দেখে সে হেসে ফেললে—লম্বা

পাগুলো উপর ভর দিয়ে সে হঠাৎ লাফাবার চেষ্টা করে পাটা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলে। গোল বৃত্তের মধ্যে থেকে তার চোখ-দুটো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল—এবং সামনের পা শূন্যে ছুড়ে ছুড়ে পালাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। একবার সে একটা কাঠের সৈনিক পুতুল পেয়েছিল, তার ঠ্যাং ছোড়ার কথা তার মনে হল। তারপর তার মায়ের কথা মনে হল, বাড়ীর কথা মনে হল—আবার দুঃখে অভিভূত হয়ে সে কাঁদতে লাগল। সে হাঁটুর উপর মুখ রেখে কাঁদতে লাগল—তারপর হাঁটু গেড়ে বসে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল। কিন্তু কি প্রার্থনা করবে? কান্নাব আবেগে সে দিশেহারা হয়ে পড়ল। এতক্ষণ সে আর কোন চিন্তা করতে পারছে না—পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে তার যেন আর কোন জ্ঞান নেই—সে হু হু করে কেবল কেঁদেই চললো।

হঠাৎ তার কাঁধের উপর একটা ভারী হাত এসে পড়ল—কর্কশ স্বরে কে যেন তাকে জিজ্ঞাসা করলে: কি হে ছোকরা, তোমার এত কি দুঃখ যে এরকম করে কাঁদছ?

সাইমন ফিরে তাকাল। দেখল, একজন লম্বা জনমজুর তার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে আছে—লোকটির চুল কোঁকড়া, আর দাড়ি কালো।

সাইমনের দু'চোখ ভরা জল—কান্নায় গলা বুজে আসছে—সে বললে: ওরা আমাকে মেরেছে আমার বাপ নেই কিনা তাই—ওরা—

লোকটি হেসে বললে: কী বললে? কেন, সকলেরই ত বাপ রয়েছে।

ছেলেটি কান্নার মধ্যে কোনক্রমে বললে: "কিন্তু আমার যে বাপ নেই।"

এতক্ষণে মজুরটি গম্ভীর হয়ে পড়ল। সে তখন চিনতে পারলে যে ছেলেটি লা ব্লাঁশোতের ছেলে। এরা এ অঞ্চলে অল্প কয়েকদিন

হল এসেছে। তবুও সেই মেয়েটির ইতিহাস সে যেন একটু-আধটু শুনেছিল।

সে বললে, "বেশ, এখন তুমি কান্না থামাও, চলো আমার সঙ্গে তোমার মায়ের কাছে যাই। তোমার মা তোমাকে একটা বাবা যোগাড় করে দেবে।

কাজেই তারা পথ দিয়ে এগিয়ে চললো—বড়ো লোকটি ছোট ছেলেটির হাত ধরে নিয়ে চললো। লোকটি আবার হাসল।

ব্লাঁশোতের ছেলেটিকে চিনতে পেরে সে খুশীই হল। লোকের মুখে সে শুনেছিল যে, সে ও অঞ্চলের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে—হয়ত সে মনে মনে ধারণাও করলে যে-মেয়ে একবার ভুল করেছে, সে আবার ভুল করতে পারে।

ভারী সুন্দর শাদা ছিমছাম একটা বাড়ীর সামনে এসে তারা পৌঁছল। ছেলেটি সেই বাড়ীটি দেখিয়ে বললে, ঐ যে আমাদের বাড়ী—মা, বলে সে বাইরে থেকে ডেকে উঠল।

একটি মেয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। মজুরটি সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতে পিছু ফিরে চলে গেল। ঐ দীর্ঘ ও সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে তামাসা করা চলবে না। পুরুষ মানুষের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য—সে দরজায় খাড়া দাঁড়িয়ে রইল। একবার একজন তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে গেছে—আর যেন তেমন অবস্থা তার পুনরায় না ঘটে।

মনে মনে ভয় পেয়ে মজুরটি টুপী তুলে বললে—"আপনার ছেলেটিকে ফিরিয়ে দিয়ে গেলুম—নদীর ধারে সে পথ হারিয়ে ফেলেছিল।"

কিন্তু সাইমন ছোট্ট হাত দুটি দিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললে : না, মা, আমি জলে ডুবে মরতে চেয়েছিলুম—ওরা যে আমাকে মেরেছে—আমার বাপ নেই। তাই—ওরা আমাকে মেরেছে।"

মেয়েটির গালছুটো টক্‌টকে লাল হয়ে উঠল—তার প্রাণে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগল—বিপুল আবেগে সে ছেলেকে বুকে আঁকড়ে ধরে রইল—আর তার দুই গাল বেয়ে টপ্‌ টপ্‌ করে জলের বড় বড় ফোঁটা পড়তে লাগল। মজুরটি এই দৃশ্যে অভিভূত হয়ে পড়ল—কি করে যে সে চলে যাবে ভেবে পেলনা। হঠাৎ সাইমন তার কাছে দৌড়ে এসে বললে :

"তুমি আমার বাবা হবে ?"

সব যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। লা ব্লাঁশোতের মুখে কথা সরে না—লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে বুকে হাত চেপে দেয়ালের সঙ্গে যেন মিশে গেল। কোন উত্তর না পেয়ে ছেলেটি বললে : তুমি যদি রাজী না হও, আমি নদীতে ডুবে মরব।

মজুরটি ব্যাপারটা হালকা ঠাট্টার মত গ্রহণ করে হেসে বলল : "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই হতে চাই।"

ছেলেটি বলে চলল ! তাহলে তোমার নাম কি ? ওরা জিজ্ঞাসা করলে আমি ওদের তোমার নাম বলব।"

লোকটি বললে, "আমার নাম ফিলিপ।"

সাইমন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল—সে যেন নামটা মনে মনে মুখস্থ করে নিলে। তারপর সে তার হাত বাড়িয়ে যেন সন্তুষ্টভাবে বললে :

"বেশ, তা হলে ফিলিপ, তুমি আমার বাবা হলে !"

মজুরটি তাকে দুই হাতে উপরে উঠিয়ে তার দুই গালে চুমো খেল। তারপর হন্‌ হন্‌ করে চলে গেল।

পরদিন সাইমন স্কুলে আসতেই ছেলেরা তাকে দেখে বিদ্বেষপূর্ণ হাসি হাসতে লাগল। ছুটির পর ছেলেরা আবার যখন আগের দিনের মত তাকে নির্যাতন সুরু করতে যাবে—সাইমন ঢিল ছোড়ার মত ছুঁড়ে দিল তার কথাগুলো—"আমার বাবার নাম, ফিলিপ।"

তখন চতুর্দিক থেকে ছেলেরা স্ফূর্তির ফোয়ারা ছোটালো।

"ফিলিপ কি? ফিলিপ কে? ফিলিপ আবার কে? ফিলিপ নামটা কোথা থেকে পেলে চাঁদ?"

এবার সে তাদের অগ্রাহ্য করতে লাগল। তার বিশ্বাস দৃঢ়—এবার আর সে পালাবে না, সে দাঁড়িয়ে রইল—যত কেন তারা মারুক না! স্কুলমাস্টার তাকে বাঁচালেন, তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে তার মায়ের কাছে গেলেন।

তিন মাস ধরে লম্বা মজুর ফিলিপ মাঝে মাঝে লা ব্লাঁশোতের বাড়ীর ধার দিয়ে যেতো—ব্লাঁশোত জানলার ধারে বসে সেলাই করত। সে কখনো কখনো সাহস করে তার সঙ্গে তুচার কথাও বলত। মেয়েটি ভদ্রভাবে, সংযত হয়ে তার সঙ্গে কথা বলত—কখনো ঠাট্টা বা তামাসা করত না বা তাকে ঘরের মধ্যে আসতেও দিত ন'। পুরুষদের যেমন স্বভাব, তেমনি সে ভাবত যে, মেয়েটি তার সঙ্গে কথা বলবার সময়ে মাঝে মাঝে যেন লজ্জায় লাল হয়ে যেত।

কিন্তু সুখ্যাতি বড় ভঙ্গুর। একবার লোকের বদনাম হলে আর সুনাম করা সহজ নয়—কাজেই লা ব্লাঁশোত যতই গম্ভীর আর সংযত থাকুক না, ইতিমধ্যেই পাড়ার লোকে এই নিয়ে জোর কাণাঘুষা সুরু করে দিলে।

সাইমন কিন্তু তার নতুন বাপকে খুব ভালবাস: া—সন্ধ্যায় কাজের শেষে সে রোজ তার সঙ্গে বেড়াতো। সে রোজ স্কুলে যেত আর তার সহপাঠীদের সঙ্গে গর্বিতভাবে বেড়াতো—তাদের কথার জবাব দিত না।

একদিন অবশ্য যে ছেলেটি প্রথমে তার সম্বন্ধে ধুয়ো তুলেছিল, সে তাকে বললে: তুই আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিস। ফিলিপ ত তোর বাপ নয়।"

ভীষণ বিরক্ত হয়ে সাইমন বললে, "কেন বল ত?"

ছেলেটি বললে: "তোর যদি বাবা থাকৃত, তবে সে ত তোর মার স্বামী হত।"

সাইমন ঘাবড়ে গেল। তবুও সে বললে : সে যাই হোক্, ফিলিপ কিন্তু আমার বাবা।

ভেংচি কেটে ছেলেটি বললে : সে ভাল—কিন্তু ও তোর ঠিক বাবা হতে পারে না।

ব্ল্যাঁশো মাথা হেঁট্ করে কি যেন ভাবতে ভাবতে বুড়া লয়জনের কামারশালার দিকে চললো : এখানে ফিলিপ কাজ করে।

এই কামারশালাটি ছিল গাছপালাঘেরা জায়গার মধ্যে এবং বেশ অন্ধকার—একটা বিরাট হাপরের আগুনের লাল আভার সামনে পাঁচজন কামার বিকট শব্দে হাতুড়ি দিয়ে পোড়ান লোহা পেটাচ্ছে—চতুর্দিকে গন্‌গনে আগুন—তার মধ্যে দৈত্যের মত তারা কাজ করে যাচ্ছে—লাল গন্‌গনে যে লোহাটার ওপর তারা আঘাত করে চলেছে—সেটার ওপরই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ।

সকলের অলক্ষ্যে সাইমন ঘরে এসে ঢুকলো—সে তার বন্ধুর জামার হাতা ধরে টান দিল। ফিলিপ ফিরে দাঁড়াল। সহসা কাজ বন্ধ হয়ে গেল—সকলেই তার দিকে তাকালো।

এই অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতার মধ্যে সাইমনের স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা গেল : ফিলিপ, লামিসাঁদের ছেলে কেন বললে যে, তুমি একেবারেই আমার বাবা নও—বলো, কেন সে বললে।

ফিলিপ বললে : এ কথা কেন?

সাইমন বললে : "তুমি কি আমার মায়ের স্বামী নও?"

কেউ একথা শুনে হাসল না। সাইমন দাঁড়িয়ে রইল, ফিলিপের বড় বড় হাত দুটোর উপর কপাল রেখে সে কি ভাবতে লাগল। সেই হাত দুটোতে বিরাট হাতুড়ি তখনো ধরা রয়েছে। এই দৈত্যদের মধ্যে তাকে যেন একটা মশার মত দেখাচ্ছে—ফিলিপের চার জন সঙ্গী তাকে লক্ষ্য করতে লাগল। সাইমন উত্তরের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ একজন কামার যেন সকলের মনোভাব প্রকাশ করলে। ফিলিপকে বললে : সে যা হোক না

কেন, লা ব্রঁাশোত ভাল মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে—ভুল করে ফেললেও এখনো ঠিক রয়েছে—বেশ শক্ত আছে—যে কোন লোক অমন যোগা মেয়েকে বিয়ে করলে বেশ ভালই হবে।

আর তিন জন বলে উঠল ঃ "সে কথা সত্যি।"

ফিলিপ বললে ঃ যদি পা পিছলে থাকে, তা হলে কি মেয়েটির একার দোষ? ওকে বিয়ে করবে বলে সেই লোকটি কথা দিয়েছিল। আমি অনেক নামকরা গণ্যমান্যদের জানি, যারা ওরকম ঢের পাপ করেছে।

তিনজনে সায় দিলে, "সে কথা সত্যি।"

সে বলতে লাগল ঃ আহা বেচারী—কত পরিশ্রমই না করছে—সে একাই ত ছেলেটিকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে। আহা! সে কত কেঁদেছে; গীর্জে ছাড়া বেচারি আর বাইরে বার হয় না—কী কষ্ট, তা এক ভগবানই সব জানেন।"

সকলে সায় দিলে—তা সত্যি!

তারপব আর কিছু শোনা গেল না—কেবল হাপরের হুশ্ হুশ্ শব্দ—আগুনের আভা চাম্‌কে উঠল। ফিলিপ তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে সাইমনকে বললে ঃ যাও, তোমার মাকে বলো যে, আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

তারপব সে সাইমনকে কাঁধ ঝাড়া দিয়ে সরিয়ে দিলে। সে কাজে যোগ দিলে। তারপর পাঁচটা হাতুড়ি একযোগে নেহাই-এর ওপরে ভীষণ শব্দে পড়তে লাগল। এইভাবে সন্ধ্যাপর্যন্ত তারা লোহা পিটতে লাগল—যেমন তাদের বল, তেমনি ক্ষমতা, তেমনি স্ফূর্তি—বিশ্বকর্মা যেন নিজেই আনন্দে কাজ করছেন। যেমন গীর্জার ঘণ্টা উৎসবের দিনে অন্য ঘণ্টার শব্দ ছাপিয়ে শোনা যায়, তেমনি প্রত্যেক মুহূর্তে ভীষণ শব্দে ফিলিপের হাতুড়ির ঘা শোনা যেতে লাগল। আগুনের উপর নজর ঠিক রেখে সে আগুনের ফুল্‌কির মধ্যে থেকেও দাপটের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে লাগল।

ফিলিপ যখন লা ব্লাঁশোতের দরজায় এসে ঘা দিলে, তখন আকাশে তারা ফুটে উঠেছে। সে তখন সার্ট বদলেছে—নতুন একটা কোট পরেছে তার দাড়িটাও ছেঁটেছে। অল্পবয়সী মেয়েটি দরজার চৌকাঠে এসে দাঁড়াল, আহতস্বরে বললে ঃ ফিলিপ, এরকম রাত করে আসা কি ভালো ?

ফিলিপের কি যেন উত্তর দিতে ইচ্ছে হল। কিন্তু কথা যেন তার জিভে জড়িয়ে গেল। সে তার সামনে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মেয়েটি আবার বললে ঃ আর, একথাও তোমার জানা উচিত যে, আমার নামে আবার কোন কথা ওঠে, এটা আমি চাই না।

হঠাৎ সে বলে উঠল ঃ "তাতে ক্ষতি কি, তুমি আমার স্ত্রী হলেই ত সব চুকে যায়।"

কোন উত্তর এল না। তার মনে হল, ঘরের অন্ধকারে কে যেন মাটিতে পড়ে গেল। ফিলিপ দ্রুত ঘরের মধ্যে ঢুকলো; সাইমন ইতিমধ্যেই বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। সে চুমু খাবার শব্দ শুনলে আর শুনলে তার মা যেন ফিস্ ফিস্ করে কি বলছে।

তারপর সাইমনের মনে হল তার বন্ধু ফিলিপ তাকে তার বিরাট পেশীপুষ্ট হাত দিয়ে উঠিয়ে শূন্যে উঁচু করে তুলে বললে ঃ তোমার স্কুলের ছেলেদের বলবে, তোমার বাবার নাম ফিলিপ রেমী—কামার —কেউ তোমার সঙ্গে লাগলে সে তোমাদের কান মলে দেবে।"

পরদিন যখন স্কুল ভর্তি—পড়া সবে সুরু হবে—তখন সাইমন উঠে দাঁড়াল। তার ঠোঁট দুটো আবেগে কাঁপতে লাগল ঃ "আমার বাবার নাম ফিলিপ রেমী—কামার। কেউ আমার সঙ্গে লাগলে বাবা তার কান মুলে দেবে বলেছে।"

এবার আর কেউ হাসলে না। সকলেই কামার ফিলিপ রেমীকে চেনে। এরকম বাবা পাওয়া যে কোন ছেলের পক্ষে গর্বের বিষয়।

---

## একুশ

## ॥ ঝুটো জড়োয়া ॥

ম'শিয়ে ল'াতিন মেয়েটিকে তাঁর অফিসের ছোট সাহেবের বাড়ীর এক নাচের উৎসবে দেখে তার প্রেমে পড়ে গেলেন।

সে ছিল এক গ্রাম্য ডাক্তারের মেয়ে। কয়েক মাস আগে ঐ ডাক্তারের মৃত্যু হয়েছিল। মায়ের সঙ্গে সে প্যারীতে এসে বাস করছিল। তার মা মেয়েটির বিয়ের জন্য তার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ী প্রায়ই যাতায়াত করছিলেন। পরিবারটি গরীব হলেও, ভাল—নির্বিরোধী আর সাদাসিধে।

মেয়েটিও খুব সৎ—এই রকম মেয়েকেই বিয়ে করার স্বপ্ন প্রায় সব যুবকই দেখে থাকে। তার সৌন্দর্য দেখলে মনে হত, যেন সে দেবীর মত পবিত্র—তার মুখে একটা আলতো হাসি সব সময়ে খেলে বেড়াতো—এই হাসি ঠিক যেন সত্যিকারের পবিত্র আত্মার প্রতিবিম্ব। সকলেই তার প্রশংসা করত। লোকে বলত, যে এমন মেয়েকে বিয়ে করবে, তার মত সুখী আর কে? এর চেয়ে ভাল স্ত্রী খুঁজে মেলা শক্ত।

ম'শিয়ে ল'াতিনের বছরে আয় ছিল সাতশো ডলার। এর উপর নির্ভর করে সংসার পাতা যাবে মনে করে, তিনি সেই মেয়েটির কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলেন এবং মেয়েটিও রাজী হয়ে গেল।

মেয়েটিকে পেয়ে ল'াতিন যে কী পরিমাণ সুখী হলেন, তা বলবার নয়। মেয়েটি এমন কৌশলে অল্প খরচায় সংসার চালাত যে, তাদের বেশ রাজার হালে চলতে লাগল। আর স্বামীকে সে কী যত্নই না করত!

তার স্বামীকে আদর-যত্নে সে অভিভূত করে ফেলল। তাদের বিয়ের ছ-বছর পরেও ল'তিন মনে ভাবতেন যে, মধু-চন্দ্রিমার প্রথম কটা দিনের ভালবাসাকেও এ ভালবাসা যেন ছাপিয়ে গেছে।

কেবল দুটি দোষের কথা ল'তিন মাঝে মাঝে তাকে বলি বলি করতেন—থিয়েটারের ঝোঁক আর ঝুটো জড়োয়ার মোহ। কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। তার বান্ধবীরা প্রায়ই তার জন্য থিয়েটারে বক্স ভাড়া করত, নতুন কোন নাটকের প্রথম অভিনয়ের দিনেই এই ব্যবস্থা হত। মেয়েটি তার স্বামীকেও সঙ্গে নিয়ে যেত—ইচ্ছে থাকুক আর না থাকুক, বাধ্য হয়েই ল'তিনকে যেতে হত, তিনি কিন্তু নিরুপায়। সারাদিন অফিসে হাড়ভাঙা খাটুনি। তারপর এইসব আমোদ-প্রমোদ ল'তিনের তেমন ভাল লাগত না, প্রায়ই বিশ্রী ও বিরক্তিকর মনে হত।

শেষে কয়েকদিন যাবার পর ল'তিন তাঁর স্ত্রীকে বলে কয়ে অন্য কোন পরিচিতা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে থিয়েটারে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতেন। এ ব্যবস্থা প্রথমে তাঁর স্ত্রী কিছুতেই মেনে নিতে চায় না, কিন্তু স্বামীর বার বার অনুরোধে সে রাজী হল। ল'তিনও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

থিয়েটারে যাওয়ার ঝোঁকের সঙ্গে সঙ্গে তার সাজ-গোজ করার নেশা এসে জুটল। আগেকার মতই তার পোষাক-পরিচ্ছদ যদিও সাদাসিধেই থেকে গেল, কিন্তু সাদাসিধে হলেও তাতে একটা রুচির এবং শালীনতার ছাপ ছিল। কিন্তু শীঘ্র সে কানের গহনার দিকে ঝোঁক দিলে আর বড় বড় নকল কাঁচের দুল, টাপ ইত্যাদি কিনতে লাগল—এগুলো এমন ঝলমলে উজ্জ্বল যে, আসল হীরককেও এগুলো হার মানিয়ে দেয়। সে গলায় ঝুটো মুক্তোর নেকলেস, আর হাতে নকল সোনার ব্রেসলেট পরতে লাগল।

তার স্বামী প্রায়ই তাকে তিরস্কার করে বলতেন, "যখন আসল হীরে কেনবার ক্ষমতা তোমার নেই, তখন তোমার লজ্জাশীলতা আর

রূপ এই ছুটো ভূষণেই তুমি:সেজো—মেয়েদের এর চেয়ে দামী গহনা আর কি আছে!"

মেয়েটি মৃত্নু হেসে মধুর স্বরে বলত, "কি করব বল? গহনা আমি বড় ভালবাসি। আমার ঐ একটি মাত্র ছুর্বলতা। মেয়েদের স্বভাব কি বদলায়?"

এই বলে মুক্তোর নেকলেসটা আঙুলে ছড়িয়ে তার সামনে তুলে ধরে সোহাগ করে বলত: "দেখ দেখি! কী সুন্দর! নয় কি? কে বলবে যে এগুলো আসল মুক্তো নয়!"

মঁশিয়ে লঁাতিন হেসে বলতেন, তোমার রুচিতে একটু পাগলামির ছোঁয়া আছে—সাজ-গোজ, আমোদ-আহ্লাদ, নয় কি?

মঁশিয়ে লঁাতিন এদের নাম দিয়েছিলেন 'ছাই-ভস্ম'—এই সব জড়োয়ার গহনাগুলো। প্রায়ই সন্ধ্যের সময়ে ছুজনে যখন আগুন পোহাতে পোহাতে মনের কথা বলাবলি করতেন, তখন মেয়েটি তার চামড়ার বাক্সেভবা এইসব ছাই-ভস্ম নিয়ে বসত। কী ভীষণ মনোযোগ দিয়ে যে সে গহনাগুলো দেখত—মনে হত এগুলি দেখে সে এক অজ্ঞাত ও রহস্যজনক আনন্দ পায়! আবাব কখনো কখনো কোনো নেকলেস তার স্বামীর গলায় পরিয়ে দিয়ে আনন্দে হৈ হৈ করে উঠত আর বলত, 'আচ্ছা তোমাকে কেমন সস্তা সস্তা দেখাচ্ছে! ব এই সে স্বামীর বুকে ঢলে পড়ে তাকে চুমুতে চুমুতে একেবারে বিপর্যস্ত করে দিত।

একদিন রাতে সে অপেরা দেখতে গেল—ফেরবাব সময়ে তার ভীষণ ঠাণ্ডা লেগে গেল। পবদিন সকাল থেকেই সে কাসতে লাগল। কয়েকদিন পরে ফুসফুসের অসুখে তাব মৃত্যু হল।

আহা! মঁশিয়ে লঁাতিনের সে কি কান্না! এক মাসের মধ্যে তাঁর মাথার সব চুল পেকে সাদা হয়ে গেল। তাঁর কান্না যেন আর থামে না; শোকে যেন তাঁর বুক ভেঙে যা —স্মৃতি, স্মৃতি—স্মৃতির ভারে তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ত—সেই হাসি—সেই কণ্ঠস্বর—তাঁর মোহময়ী সুন্দরী স্ত্রীর কত মোহময় স্মৃতি!

সময়ে সব দুঃখ সয়ে যায় কিন্তু তাঁর দুঃখ কমল না। অফিসে প্রায়ই যখন তাঁর সহকর্মীরা দিনের নানা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতেন, তখন হঠাৎ তাঁর দুচোখ জলে ভরে আসত আর তিনি ভীষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতেন—যেন তাঁর বুক ভেঙে যাবে। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর ঘরের জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করেননি—যেখানে যে জিনিষটি ছিল, সেখানে তিনি সেটি তেমনি রেখে দিয়েছিলেন! এখানে তিনি তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাঁর জীবনের একমাত্র আনন্দ—তাঁর স্ত্রীর চিন্তায় মশগুল থাকতেন।

কিন্তু তাঁর জীবন-সংগ্রাম শীঘ্র কঠোর হয়ে উঠল। যে অর্থে তাঁর স্ত্রী সব চালিয়ে নিত, এখন তাতে আর চলে না। এখন মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে ভাবেন, এই অর্থে তাঁর স্ত্রী কি করে এত দামী মদ, এত ভাল খাবারের ব্যবস্থা করত—তাঁর সামান্য উপায়ে তিনি কিছুতেই কুলোতে পারছিলেন না।

এইভাবে তাঁর কিছু দেনা হয়ে গেল, আর তিনি শীঘ্র একেবারে গরীব হয়ে পড়লেন। একদিন সকালে তিনি দেখলেন যে, তাঁর পকেটে এক সেণ্টও নেই। কিছু বিক্রী করে তাঁকে কিছু অর্থ জোগাড় করতে হবে, তা এখনিই চাই। তাঁর মনে হল তাঁর স্ত্রীর ঐ নকল জড়োয়া বিক্রী করলে কেমন হয়! এই সব ঝুটো জড়োয়ার প্রতি তাঁর একটা জাতক্রোধ ছিল। এগুলো দেখলে তাঁর গা যেত জ্বলে। এগুলো যেন তাঁর স্ত্রীর স্মৃতিকে কলঙ্কিত করছে।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী এসব কিনে গেছে। প্রায় প্রতি রাত্রেই সে নতুন জড়োয়া নিয়ে বাড়ী আসত। ল'াতিন ভাবলেন যে তাঁর স্ত্রীর সবচেয়ে প্রিয় ভারী মুক্তোর নেকলেসটাই তিনি বিক্রী করবেন—হ্যাঁ! ছ সাত ফ্র'া ত নিশ্চয়ই এতে পাওয়া যাবে। নকল হলেও এর কারুকার্যের একটা দাম আছে বৈকি!

নেকলেসটা নিয়ে তিনি একটা জড়োয়ার দোকানের গেলেন।

প্রথমেই যে দোকানটা পেলেন, সেটাতেই তিনি ঢুকে পড়লেন—

মনে মনে ভারী লজ্জা—এতে তাঁর নিজের দারিদ্র্য প্রকাশ হয়ে পড়বে। তা ছাড়া এই রকম বাজে একটা জিনিস বিক্রী করতে এনেছেন!

দোকানীকে বললে, "মশাই, এই জিনিসটার দাম কত?"

লোকটি তাঁর নেকলেসটা নিলে, পরীক্ষা করলে এবং কেরানীকে ডেকে ফিসফিস করে কি যেন বললে। তারপর গহনাটা কাউন্টারের উপর রেখে দূর থেকে তার কারুকার্য লক্ষ্য করতে লাগল।

এই সব ব্যাপারে ল'াতিনের বিরক্তি ধরে গেল, তিনি প্রায় বলতে যাবেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি, এর বিশেষ কোন মূল্য নেই।"

এমন সময়ে দোকানী বললে, "মশাই, এ নেকলেসের দাম, এই ধরুন, বার থেকে পনের হাজার ফ্র্যাঁর মতো হবে; কিন্তু এটা কোথা থেকে আসছে তা না জানলে, আমি এটা কিনতে পারছি না।"

দোকানীর কথা যেন ল'াতিনের কানেই ঢুকলো না—এ কথার অর্থ কি? তিনি হাঁ করে বড় বড় চোখ মেলে দোকানীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। শেষকালে তিনি আমতা আমতা করে বললেন, "আপনি ঠিক বলছেন ত!"

শুষ্ককণ্ঠে দোকানী বললে, "আপনি অন্য দোকানে যাচাই করতে পারেন, যদি কেউ বেশী দেয়। আমার মনে হয়, এর দাম এর বেশি কেউ দেবে না। অন্য দোকানে যদি বেশী দাম না দেয়, তবে এখানে ফিরে আসবেন।"

ম'শিয়ে ল'াতিন একেবারে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তিনি হতবুদ্ধি, বাক্যহারা। নেকলেসটা উঠিয়ে নিয়ে তিনি দোকান থেকে নেমে গেলেন। তাঁকে একটু ভাবতে হবে।

দোকানের বাহিরে গিয়ে তাঁর হাসি পেল। তিনি মনে মনে বললেন: বোকা! লোকটার কথা শুনলেই হয়েছিল আর কি! ও ব্যাটা আসল ও নকলের ভেদ জানে না।

কয়েক মিনিট পরে তিনি আর একটা দোকানে এসে ঢুকলেন।

নেকলেসটা দেখে দোকানের মালিক বলে উঠল : আ! চমৎকার! এটা আমি ভাল করে চিনি—এখানেই এটা কেনা হয়েছিল।"

লঁাতিনের এসকল উচ্ছ্বাস ভাল লাগছিল না। তিনি বললেন : এর দাম কত?

"হ্যাঁ, আমি এটা চল্লিশহাজার ফ্রাঁতে বিক্রী করেছিলাম। আঠারো হাজার ফ্রাঁ দিয়ে আমি এটা কিনতে পারি। তবে আইনের কতকগুলো বিধান আছে। এটা কি করে আপনার কাছে এল, তা আমাকে জানাতে হবে।"

এবার লঁাতিন সত্যিসত্যিই থ বনে গেলেন। তিনি বললেন—কিন্তু, কিন্তু এটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখুন। একটু আগে পর্যন্ত আমার ত ধারণা ছিল যে এ ঝুটো।

দোকানী বললে : মশাই, আপনার নাম কি?

"লঁাতিন, আমি স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর আফিসে কাজ করি। আমার ঠিকানা ৩৬, রু দ্য মার্টারস্।"

দোকানী তার খাতা ওলটাতে লাগল। তারপর বললে, "হ্যাঁ, এটা মাদাম লঁাতিনের ঠিকানায় এত তারিখে পাঠানো হয়েছিল—এই যে ৩৬, রু দ্য মার্টারস্।"

দুজনে দুজনের দিকে খানিক তাকিয়ে রইল। বিপত্নীক লঁাতিন কিছু যেন বুঝতে পারছেন না। আর দোকানী ভাবছে লোকটা চোর নয়ত!

দোকানী নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললে : "নেকলেসটা চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে রেখে যাবেন কি? আমি অবশ্য আপনাকে একটা রসিদ দেব।"

লঁাতিন বললেন, নিশ্চয়ই। তারপর রসিদটা পকেটে রেখে তিনি দোকান থেকে নেমে গেলেন।

রাস্তায় রাস্তায় তিনি উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরলেন—তাঁর মনে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেছে। তিনি নানা যুক্তি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁর মন কিছুতেই বোঝ মানে না। এরকম গহনা তাঁর

টাকায় কেনা অসম্ভব। কাজেই এ নিশ্চয়ই কোন লোকের উপহার। কিন্তু কে দিলে এ উপহার? কেনই বা এ উপহার তাকে সে দিলে?

রাস্তার মাঝেই তিনি থমকে গেলেন। তাঁর মনে এক ভয়ঙ্কর সন্দেহ উপস্থিত হল—তাহলে তার স্ত্রী? তাছাড়া, আর সব গহনাও তাহলে উপহার। তাঁর পায়ের নীচে থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। তাঁর চোখের সামনে থেকে গাছগুলো যেন পড়ে যাচ্ছে। আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। একটা ডাক্তারখানায় তাঁর জ্ঞান হল। পথচারীরা তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় এই ডাক্তারখানায় নিয়ে এসেছে।

এখান থেকে তারাই তাঁকে বাড়ী পৌঁছে দিলে। বাড়ী পৌঁছেই তিনি দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে বসে রাত পর্যন্ত কাঁদতে লাগলেন। শেষে ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে তিনি বিছানায় এলিয়ে পড়লেন—সারা রাত এক নিদারুণ অস্বস্তিতে তিনি কাটালেন।

পরদিন সকালে অফিস যাবার উদ্যোগ করলেন। এরকম একটা ধাক্কা খাবার পর অফিসে গিয়ে তাঁর পক্ষে কাজ করা কঠিন। তিনি অফিসে ছুটির জন্য দরখাস্ত করলেন। তারপর তাঁর মনে হল—তাঁকে একবার জহুরীর দোকানে যেতে হবে। তাঁর মন সরছিল না, কিন্তু নেকলেসটা তো দোকানে ফেলে রাখা যায় না! কাজেই তিনি সেজেগুজে বেরিয়ে পড়লেন।

দিনটা খুব পরিষ্কার। কর্মব্যস্ত শহরের ওপরে পরিষ্কার নীল আকাশ ঝক ঝক করছে—পকেটে হাত ঢুকিয়ে নিষ্কর্মা লোকেরা এদিক ওদিক ঘুরছে।

এদের দেখে মঁশিয়ে লাঁতিন মনে মনে বললেন: "ধনীরাই কেবল সুখী। লোকের টাকা থাকলে গভীর দুঃখও ভোলা যায়। যেখানে খুশি যাওয়া যায় আর তাতে মনও খুসী হয়—শোকেও শান্তি পাওয়া যায়। হায়! আজ যদি আমার টাকা থাকত।"

খুব ক্ষিদে পেয়েছে—কিন্তু তাঁর পকেট শূন্য। তখন আবার তাঁর

নেকলেসের কথা মনে পড়ে গেল। আঠারো হাজার ফ্রাঁ—আঠার হাজার ফ্রাঁ—ওঃ, সে যে অনেক।"

দেখতে দেখতে তিনি জহুরীর দোকানের সামনে এসে গেলেন। আঠার হাজার ফ্রাঁ। বারবার তাঁর দোকানে ঢুকতে ইচ্ছে হচ্ছিল, বারেবারেই একটা লজ্জা যেন তার পা-দুটো ভারী করে তুলল। তাঁর ক্ষিদে পেয়েছে খুব—ভীষণ ক্ষিদে—পকেটে এক সেণ্টও নেই। তিনি মন স্থির করেই রাস্তা পেরিয়ে মনকে আর দ্বিধার অবসর না দিয়েই দ্রুতবেগে দোকানে ঢুকে পড়লেন।

দোকানের মালিক এগিয়ে এল—তাঁকে চেয়ারে বসতে অনুরোধ করলে। কেরানী চেনালোকের মতো তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

জহুরী বললে, ম'শিয়ে ল'াতিন, আমার খোঁজ-খবর নেওয়া হয়ে গেছে, যদি এখনও আপনার এই জড়োয়া বিক্রী করবার ইচ্ছে থাকে, তা-হলে আমি যে দাম বলেছি, তা আপনাকে দিতে প্রস্তুত।'

ম'াশিয়ে ল'াতিন আমতা আমতা করে বললেন : হঁ্যা, নিশ্চয়ই।

জহুরী তখন একটা টানা থেকে হাজার ফ্রাঁর আঠারো খানা নোট বার করে, গুণে ম'াশিয়ে ল'াতিনকে দিয়ে একটা রসিদ সই করিয়ে নিলেন। ল'াতিন কম্পিত হাতে রসিদে সই করে টাকাটা পকেটে ভরে নিলেন।

দোকানে থেকে নেমে আসবার আগে ল'াতিন দোকানীর দিকে ফিরে মুখ নী করে বললেন : "আমার—আমার আরো হীরে জহরৎ আছে। সবই এক সূত্র থেকে পাওয়া। সেগুলো কি কিনবেন?"

নত হয়ে নমস্কার জানিয়ে জহুরী বললে : নিশ্চয়ই।

ল'াতিন গম্ভীরভাবে বললেন : "সেগুলো আমি আনবো।"

এক ঘণ্টা পরে তিনি সব জড়োয়া নিয়ে দোকানে হাজির হলেন।

বড় বড় হীরের দুলগুলোর দাম হ'ল মোট কুড়ি হাজার ফ্রাঁ; ব্রেসলেট জোড়ার দাম হল পঁয়ত্রিশ হাজার ফ্রাঁ; আংটিগুলোর দাম হল একুনে ষোলো হাজার, পান্না আর চুনীর সেটটার দাম চৌদ্দ

হাজার, সোনার হার আর তার ধুকধুকির দাম হল চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ; সবশুদ্ধ সব গহনার দাম হল একশ তেতাল্লিশ হাজার ফ্রাঁ।

জহুরী ঠাট্টা ক'রে মন্তব্য করলে: এক ভদ্রলোক তাঁর যা কিছু উপার্জন সব এই জড়োয়া গহনায় ব্যয় করেছিলেন।

মঁশিয়ে লাঁতিন গম্ভীরভাবে বললেন: টাকা আটকে রাখবার এটাও একটা উপায়।

সেদিন ভয়ামিনের হোটেলে লাঁতিন লাঞ্চ খেলেন—আর যে মদ খেলেন তার প্রতি বোতলের দাম কুড়ি ফ্রাঁ। তারপর একটা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে তিনি সারা রফ্‌ ঘুরে বেড়ালেন—আর সেখানকার বড়লোক বাসিন্দাদের লক্ষ্য করে মনে মনে বলতে লাগলেন: আমিও বড়লোক হয়েছি। আমার দাম এখন দুশো হাজার ফ্রাঁ।

হঠাৎ অফিসের কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। তিনি গাড়ী হাঁকিয়ে অফিসে গেলেন। স্ফুর্তি করতে করতে অফিসে ঢুকে তিনি তাঁর মনিবকে বললেন: "আমি কাজে ইস্তফা দিতে এসেছি—আমি উত্তরাধিকার সূত্রে তিনশ হাজার ফ্রাঁ পেয়েছি।"

তাঁর পুরানো সহকর্মীদের সঙ্গে করমর্দন করে তিনি ভবিষ্যতে কি করতে চান সেই সম্বন্ধে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, তারপর তিনি কাফে য়্যাঙ্গলে ডিনার খেতে গেলেন।

অভিজাত বংশের একজন ভদ্রলোকের পাশে বসে তাঁকে প্রাণের সব কথা খুলে বললেন: জানেন, চারশো হাজার ফ্রাঁ সম্পত্তির আমি উত্তরাধিকারী হয়েছি।

তিনি থিয়েটার দেখতে গেলেন—এই প্রথম দিন তাঁর থিয়েটার ভাল লাগল—রাতের শেষ অংশটা তিনি আনন্দেই কাটিয়ে দিলেন।

ছ মাস পরে তিনি আবার বিয়ে করলেন। তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী খুব গুণের মেয়ে কিন্তু মেজাজটা বেশ গরম। মেয়েটি কিন্তু তাঁকে খুব কষ্ট দিত।

———

## বাইশ

### ॥ হীরের হার ॥

এমন সুন্দরী, মোহময়ী রূপের ডালি নিয়ে মেয়েটি যে কেরানীর বংশে জন্মাল, সে-ত বিধাতার ভুল ছাড়া আর কিছুই না। তার না ছিল সম্পত্তি, না ছিল কোন আশা; কাজেই, ধনী বা বিখ্যাত কারুর সঙ্গেই এমন মেয়ের কেনই বা বিয়ে হবে? আর জীবনে রূপের অনুপাতে খ্যাতি বা ভালবাসাই বা সে কি করে পাবে? ফলে তাকে শিক্ষা-বিভাগের এক সামান্য কেরানীকেই বিয়ে করতে হল।

মেয়েটি ছিল সাদাসিধে। গহনা-গাঁটি কাপড়-চোপড়ই বা পায় কোথায়? তাই এই জাতের অন্য মেয়েদের মতই তার মনে সুখ ছিল না। মেয়েদের সত্যি সত্যি জাতই বা কি আর বংশই বা কি, তাদের রূপ, তাদের সৌন্দর্য, তাদের মাধুর্য এ সবই তাদের জাত আর বংশের কাজ করে। তাদের আভিজাত্য, তাদের সহজাত মাধুর্য, তাদের স্বভাবজ সৌন্দর্য আর তাদের বুদ্ধির দীপ্তি—এই সবের বলেই তারা জগতে বিখ্যাত হয়েছে।

সে ভাবত, তার জন্ম হয়েছে সংসারের সেরা জিনিষ ভোগ করার জন্যে, ভোগ-বিলাসে ও সুখে থাকবার জন্যে। ঘরের দৈন্য দেখলে সে মনে ব্যথা পেত। রং-চটা দেয়াল, ভাঙা চেয়ার আর বিবর্ণ জিনিষ-পত্র দেখলে তার মনের কষ্ট বেড়ে যেত। তার এ-অবস্থা অন্য মেয়েরা হয়ত কোন লক্ষ্যই করত না। সে সহজেই চটে উঠত আর কষ্ট পেত। এই ছোট্ট বাড়ী দেখে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলত—সে ভাবত শান্ত এবং নির্জন অন্দরমহল, দামী পর্দা ঝুলানো ঘর, বড় বড় মশালের আলো, বহু দাসদাসী, বড় বড় বৈঠকখানা—সিল্কের পর্দা—সুন্দর আসবাব—দামী দামী এসেন্সের গন্ধভরা ছোট একটি নিরালা কুঠরী

—প্রাণের বন্ধুদের সঙ্গে বসে বসে গল্প করা—তাছাড়া একজন স্তাবক —যা সব মেয়েরাই অল্প বিস্তর আশা করে থাকে।

গোল টেবিলে তিন চার দিনের অপরিষ্কার টেবিল ক্লথটার উপরেই খাবার পরিবেষণ করা হয়েছে। তার স্বামী তার সামনে বসেছেন। খাবার দেখে তার স্বামী ভারী খুশী হয়ে বলছেন—"আহা! ভারী চমৎকার হয়েছে আজকের রান্না!" তার কিন্তু তা পছন্দ নয়। রূপোর বাসনে পরিবেষণ করা ভাল ভাল খাবারের কথা সে তখন ভাবছে—আর ভাবছে চতুর্দিকে তার রূপের পূজারীরা বসে তার রূপের প্রশংসা করবে—আব ভাল ও দামী খাবারের সে এক টুকরো মুখে তুলে নেবে।

তার ভাল ফ্রক-ও নেই আব ভাল গহনা-ও নেই। এই সবই সে ভালবাসে। সে মনে করে যে, দামী পোষাক আব গহনা পরবার জন্যেই তার মত মেয়ের জন্ম হয়েছে। লোককে খুশী করবার, লোকের প্রশংসা পাবার, লোকের সঙ্গে কথা বলে নিজের বুদ্ধিব পরিচয় দেবার এবং লোকের ভালবাসা পাবার আকাঙ্খায় সে ভরপূর।

তবে বন্ধুদের মধ্যে একটি ধনী যুবতী—একই কনভেণ্ট স্কুলে তারা পড়েছে—কিন্তু তার বাড়ী যেতে তার ভাল লাগে না—সেখানে গেলেই সে বাড়ী এসে বড় মনঃকষ্ট ভোগ করে। সারাদিনই সে কেঁদে, রেগে ও আক্রোশে ফুলতে থাকে—কেবল আফশোষ, কেবল খেদোক্তি, কেবল হা হুতাশ!

একদিন বিকেলে তার স্বামী বুক ফুলিয়ে বাড়ীতে এসে পকেট থেকে একটা বড় খাম বার করে তাকে দিয়ে বললে:

"এই নাও, এই নাও, একটা জিনিষ।"

তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়ে সে একটা ছাপানো কার্ড বার করলে। তাতে ছাপা রয়েছে, "জনশিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রী ও মাদাম জর্জ রাম-পোনো মঁশিয়ে ও মাদাম লয়সেলের সঙ্গ চান। ১৮ই জানুয়ারী সোমবার সন্ধ্যায়—মন্ত্রী মহাশয়ের নিজের বাসভবনে।"

তার স্বামী ভেবেছিল যে, সে এতে খুশী হবে। কিন্তু, সে খুশী না হয়ে নিমন্ত্রণ-পত্রটা রেগে টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে—"এ নিয়ে আমার কি দরকার?"

কিন্তু, প্রিয়ে, ভেবেছিলুম এতে তুমি খুশী হবে। তুমি ত কখনো কোথাও যাও না, এই একটা সুযোগ এসেছে—খুব ভাল সুযোগ। এটা জোগাড় করতে আমায় কম বেগ পেতে হয়নি। সকলেই চায়, —কিন্তু ব্যাপারটা বাছাইকরা লোকের জন্যে—কিন্তু আমার মত কর্মচারী বড় বেশী পায়নি। সেখানে হোমরা-চোমরা সব অফিসারকে দেখতে পাবে।

বিরক্ত হয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে সে তিক্তস্বরে বললে, আচ্ছা, সবার কথা ত বলছ—কিন্তু কি পরে যাব একবার ভেবে দেখেছ কি।

একথা তার স্বামীর মনে হয়নি—সে এতদূর পর্যন্ত ভাবেনি। আমতা আমতা করে সে জানালে: কেন, থিয়েটার যাবার সময়ে যে পোষাকটা পর, সেইটা পরে যাবে। পোষাকটাই আমার খুব পছন্দ হয়—

সে কান্না জুড়ে দিল। স্বামী ত হতভম্ব নির্বাক। বড় বড় দু ফোঁটা অশ্রু তার স্ত্রীর চোখের কোণ বয়ে ধীরে ধীরে গড়িয়ে তার মুখের কাছে এসে গেল। সে আমতা আমতা করে বলতে লাগল:

"কি হয়েছে? হোল কি তোমার?"

বহু কষ্টে তার স্ত্রী মনের ভাব সংযত করে শান্তস্বরে বললে, কিছু না, আমার ভাল পোষাক নেই, কাজেই এসব ব্যাপারে আমার যাওয়া হবে না। বরং তোমার এমন কোন বন্ধুকে কার্ডটা দাও, যার স্ত্রীর অবস্থা আমার চেয়ে ভাল।

তার স্বামী বড় বেদনা পেলে, কিন্তু তবুও বললে:

"আচ্ছা দেখা যাক। আচ্ছা মাতিলদা, একটা ভাল পোষাকের দাম কত পড়বে—খুব দামী নয়, এই রকম ব্যাপারে পরা চলবে অথচ সাদাসিধে?"

বেশ কয়েক মুহূর্ত মেয়েটি কি ভাবলে। হিসেব করলে, এমন একটা দাম যা বললে, তার স্বামী অস্বীকার করতে পারবে না—বা তার হিসেবী স্বামী যা শুনে ভয় পেয়ে আঁৎকে উঠবে না।

শেষে দ্বিধাভরা কণ্ঠে সে বললে—ঠিক কি করে বলি, তবে মনে হয় চারশো ফ্রাঁ হলেই হতে পারে।

দাম শুনে তার স্বামীর মুখটা একটু যেন শুকিয়ে গেল—কারণ এই টাকাটাই সবে তার জমেছে। সে ভেবেছিল যে, এই টাকায় একটা বন্দুক কিনে আগামী গ্রীষ্মে তার বন্ধুদের সঙ্গে নান্তেবয়ারে শিকার করতে যাবে।

যাই হোক, সে বললে ঃ বেশ, তোমাকে চারশো ফ্রাঁ দেব। কিন্তু বেশ ভাল একটা পোষাক কিনতে হবে।

নাচের দিন এগিয়ে এল। কিন্তু মাদাম লয়সে'লের মুখে তখনও হাসি নেই। তখনও কি যেন একটা দুশ্চিন্তা তা' মনে হানা দিতে লাগল। পোষাক প্রায় তৈরী হয়ে এসেছে। এমন সময়ে একদিন তার স্বামী তাকে বললে ঃ কি ব্যাপার তোমার? দু তিন দিন তোমার হালচাল আমার কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছে।

সে বললে ঃ কি আর বলব, আমার কোন গহনা নেই, তাই ভাবছি, একটা পাথরের কুচি পর্যন্ত নেই। এ· ং দীন-দরিদ্র আর খালি খালি দেখাবে আমাকে। তার চেয়ে গিয়ে কাজ নেই।

তার স্বামী বললে ঃ কেন, কিছু ফুলের গহনা পরে যেতে পারো। এ সময়ে ফুল পরলে খুব ভাল দেখাবে। দশ ফ্রাঁ দিলে দু' তিনটে বড় বড় সুন্দর গোলাপ কিনে নিতে পারবে।

স্বামীর কথায় মাতিলদার মন উঠল না। সে বললে ঃ না, দেখ সব বড় লোকদের মেয়েরা আসবে—সেখানে এভাবে যাওয়া আমার যেন কেমন কেমন লাগছে।

তখন তার স্বামী আর থাকতে পারলে না; বললে, আহা, তোমার কি বুদ্ধি! তোমার বন্ধু মাদাম ফরেস্টিয়ারের বাড়ী গিয়ে তার কাছ

থেকে গহনা চেয়ে নিয়ে এসো। তোমাব সঙ্গে যখন তার এত ভাব রয়েছে, তখন আব ভাবনা কি!

মাতিলদা আনন্দে অস্ফুট চিৎকার করে উঠল: সত্যিই তো! একথা ত আমার মনে হয়নি।

পরদিনই সে তার বন্ধুর বাড়ী গেল। সেখানে নিজের দুঃখের কথা বলতে মাদাম ফরেস্টিয়ার তার কাচের আলমারী খুলে একটা গহনার বাক্স বের করে তার ডালা খুলে বললে: নাও, পছন্দ করে নাও।

প্রথমে সে এক জোড়া ব্রেসলেট নিলে। তারপর একটা মুক্তোর কলার তারপর সোনা আব হীরের একটা ভেনিসিয়ান ক্রুশ! এগুলো পরে সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলে—কিন্তু কোনটা নেবে তা যেন কিছুতেই ঠিক করতে পাবে না! তারপর সে বললে: আর কিছুই নেই?

"আছে বৈকি! তুমি নিজে দেখে নাও না। তোমার কি পছন্দ, আমি কি করে বলব।"

একটা বাক্সের মধ্যে হঠাৎ একটা হীরের নেকলেস দেখে আনন্দে মাতিলদার হৃদয় নৃত্য করে উঠল। সেটা হাতে করে তুলে নেবার সময়ে উত্তেজনায় তার হাত কাঁপতে লাগল। সে পোষাকের উপরেই গলায় সেটা পরে আনন্দে অধীর হয়ে পড়লো। তারপর গভীর উৎকণ্ঠায় সে বললে: এটা আমাকে দিতে পারবে? শুধু এটা?

নিশ্চয়ই পারবো।

মাতিলদা আনন্দে বন্ধুর গলা জড়িয়ে ধরলে। তারপর মহামূল্য সেই জিনিষটি নিয়ে বাড়ী ফিরে এল।

বলনাচের দিন এসে পড়ল। মাদাম লয়সেল সকলের লক্ষ্যের বস্তু হয়ে পড়ল। সকলের মধ্যে তাকেই সবচেয়ে সুন্দরী, সুশোভিতা, সুহাসিনী, আনন্দময়ী দেখাতে লাগল। সকলের দৃষ্টি তার দিকে। সকলেই তার নাম জিজ্ঞাসা করতে লাগল—তাদের পরিচয় দিয়ে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে বলল।

মন্ত্রী সভার সকলেই তার সঙ্গে নাচতে চায়। শিক্ষা-মন্ত্রীও তার দিকে কিছুটা আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন।

বিপুল উৎসাহে, আনন্দ ও উত্তেজনায় সে নাচতে লাগল। সে সুখী—সে চিন্তা হীন। তার রূপ সর্বজয়ী হয়েছে—এ যেন এক সুখের আভাষ! সকলের প্রশংসা—সকলের পূজা—সকলের মনে কামনার জোয়ার আনা—তার বিজয় সম্পূর্ণ—এইত মেয়েদের মনের বাসনা।

ভোর চারটা নাগাদ সে বাড়ী ফিরে এল। ছোট একটা কুঠুরীতে তার স্বামী ঘুমিয়েই পড়েছিল। সেখানে আরও তিনজন ভদ্রলোক ঘুমোচ্ছিলেন। তাঁদের স্ত্রীরা এতক্ষণ আনন্দ উপভোগ করছিল।

বাড়ী ফিরে যাবার জন্যে তার স্বামী যে সব পোষাক এনেছিল সেগুলো তার গলায় জড়িয়ে দিলে। এ সব আটপৌরে সাধারণ পোষাক, দরিদ্রের পোষাক—বলনাচের পোষাকের সঙ্গে মেলে না—বড়ই বেমানান। এটা মনে মনে মনে অনুভব করে তাড়াতাড়ি অপরের অলক্ষ্যে চলে যাবার জন্যে মাতিলদা ব্যস্ত হয়ে উঠল—পাছে অন্য মহিলারা তাকে দেখে ফেলেন। তাঁরা সব দামী ফার দিয়ে ঢাকাঢুকি দিচ্ছিলেন।

লয়সেল তাকে অপেক্ষা করিয়ে বললে : দাঁড়াও, বাইরে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। একটা গাড়ী ডেকে আনি।

কিন্তু মাতিলদা সে কথা শুনল না। সে দ্রুতবেগে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এল। রাস্তায় নেমে তারা দেখে গাড়ী নেই। তারা খানিক গাড়ী খোঁজাখুঁজি করলে; তারপর দূরে একটা গাড়ী দেখে, কোচ-ম্যানকে হাঁক দিয়ে ডাকলে।

সীন নদীর ধার পর্যন্ত তাদের হেঁটে যেতে হল। মনটা তখন ভেঙে গেছে, শীতেও তাদের কাঁপুনি ধরে গেছে। শেষকালে ডকের কাছে রাত্রে একটা কুপে পেল। এই কুপে রাত্রে প্যারীর রাস্তায় দেখা যায়। এসব গাড়ী যেন দিনের আলোয় বেরুতে লজ্জা পায়!

মার্টায় স্ট্রীটে তাদের দরজা পর্যন্ত গাড়ী পৌঁছে দিলে। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে তারা ঘরে ঢুকলো। তার যেন সব আনন্দ, সব সুখ ফুরিয়ে গেল। লয়সেল ভাবলে, কাল দশটায় তাকে অফিস করতে হবে।

মাতিলদা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় ঢাকাগুলো ছাড়তে গেল। আয়নায় নিজেকে শেষবার দেখে নেবার ইচ্ছেও ছিল। হঠাৎ সে চীৎকার করে উঠল। তার নেকলেস ত গলায় নেই!

লয়সেলের পোষাক প্রায় ছাড়া হয়ে গিয়েছিল। সে জিজ্ঞাসা করলে: ব্যাপার কি?

মাতিলদা উত্তেজিতভাবে তার দিকে তাকিয়ে বললে: আমি—আমি—মাদাম ফরেস্ট্রিয়ারের সেই নেকলেসটা হারিয়ে ফেলেছি।

লয়সেল একেবারে মর্মে মর্মে আঘাত পেল, কি বলছো তুমি? সে কি করে হয়? অসম্ভব!"

তারা তখন পোষাকের ভাঁজ ঝেড়ে দেখল। পকেট, তাক, সব তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। কিন্তু কোথাও সেই নেকলেসটা আর পাওয়া গেল না।

লয়সেল বললে: "সেই বাড়ী ছেড়ে আসবার সময়ে সেটা ছিল বলে কি তোমার মনে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ, বেরুবার আগে আমি বাড়ীর চত্বরে দেখেছি সেটা ছিল।"

"কিন্তু রাস্তায় যদি হারিয়ে থাকো, সেটা পড়ে যাবার একটা শব্দ হবে ত—আমরা তো শুনতে পাবো। তা হলে গাড়ীতেই হয়ত পড়েছে।"

"সেটা সম্ভব বটে। কিন্তু গাড়ীর নম্বরটা দেখেছিলে কি?"

"না, তুমি লক্ষ্য করনি?"

"না।"

দুজনে দুজনের দিকে হতাশ হয়ে তাকালো। শেষে লয়সেল আবার পোষাক পরলো। সে বললে: আমি যাই, যে রাস্তটা আমরা হেঁটে এসেছি—সেটা একবার দেখে আসি।"

সে চলে গেল। রাত্রের পোষাক পরেই মাতিলদা বসে রইল—বিছানায় গিয়ে যে শোবে বা চেয়ারে বসে একটু হাত পা ছড়াবে সে শক্তিও যেন তার নেই।

সাতটা নাগাদ স্বামী ফিরল। সে কিছু পায়নি।

সে আবার থানায় গেল—গাড়ীর আড্ডায় গেল, কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে, পুরস্কারও ঘোষণা করলে : যেদিকে এক বিন্দুও আশা থাকার সম্ভবনা আছে, সে সব দিকেই তারা চেষ্টা করলে।

মাতিলদা সারাদিন কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে কাটালে। কী ভয়ঙ্কর বিপর্যয় হয়ে গেল। সন্ধ্যায় লয়সেল ফিরে এল। তার মুখ দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে গেছে : কোথাও কোন হদিশ মেলে নি।

লয়সেল বললে, তোমার বন্ধুকে এখন লিখে জানান দরকার যে, টিপকল ভেঙে যাওয়ায় তুমি সেটা মেরামত করতে দিয়েছ। ইতিমধ্যে যাহোক কিছু করা যাবে।

সেই রকমই মাতিলদা লিখে দিল।

এক সপ্তাহ কেটে গেল। গয়না ফিরে পাবার কোনও আশা আর নেই। লয়সেলের বয়স ইতিমধ্যে যেন পাঁচ বছর বেড়ে গেছে। সে বললে : "মাপ নিয়ে নেকলেসটা তৈরি করতে দিতে হবে।"

পরদিন বাক্সটা নিয়ে, তার পিছনে লেখা জহুরীর দোকানে গিয়ে মাতিলদা তার সঙ্গে পরামর্শ করলে।

জহুরী বললে : মাদাম, এ নেকলেস ত আমরা বেচিনি—আমি বাক্সটা মাত্র দিয়েছিলাম।

তারপর তারা অনেক জহুরীর দোকান ঘুরল—যদি ঠিক সেই রকম একটা নেকলেস পাওয়া যায়। যতদূর তাদের মনে ছিল, তেমনিভাবে মিলিয়ে দেখতে লাগল—আর ততই তাদের আফশোষ বাড়তে লাগল।

শেষে প্যালে রয়ালের একটা দোকানে তারা প্রায় সেই রকম একটা হীরের নেকলেস পেল। কিন্তু তার দাম চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ। ছত্রিশ হাজার ফ্রাঁতে শেষ পর্যন্ত রক্ষা হল।

তারা জহুরীকে অনুরোধ করলে, যেন অন্ততঃ তিনদিন তাঁরা সেটা না বেচেন। তাছাড়া আসলটা পাওয়া গেলে অন্ততঃ ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ পর্যন্ত যদি তারা এটা ফেরৎ দিতে যায়, তা যেন তারা ফেরৎ দিতে পারে।

লয়সেলের হাতে চৌদ্দ হাজার ফ্রাঁ ছিল। এ টাকা তার বাবা তাকে দিয়েছিলেন। বাকীটা সে ধার করলে।

কি ভাবে ধার করলে?

একজনের কাছে হাজার ফ্রাঁ, অন্য একজনের কাছে পাঁচশো, এর কাছে কিছু ওর কাছে কিছু, হ্যাণ্ডনোট কাটলে, হুণ্ডী কাটলে, যত রাজ্যের সুদখোরের কাছে সুদে ধার নিলে। এইভাবে নিজের জীবন বিপন্ন করে সে দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় জেরবার হয়ে পড়ল। তাছাড়া শারীরিক বহু কষ্টও ভোগ করতে হল। তবুও সে জহুরীর কাছে গিয়ে তাকে ছত্রিশ হাজার ফ্রাঁ দিয়ে নতুন নেকলেসটা নিয়ে এল।

মাদাম লয়সেল যখন মাদাম ফরেস্টিয়ারের কাছে নেকলেসটা ফেরৎ নিয়ে গেল, তখন গম্ভীরভাবে ফরেস্টিয়ার গিন্নী বললে: দেখ, আমারও এটা দরকার হতে পারত—আরও আগে এটা ফেরৎ দিয়ে যাওয়া তোমার উচিৎ ছিল।

মাতিলদা যা ভয় করাছল তাই ঘটল। সে বাক্সটা খুলে তার নেকলেসটা দেখে নিলে। যদি ধরে ফেলত, এটা তার সেই নেকলেস নয়, তবে কি হত? সে তাকে চোর, জোচ্চোর ভাবত—না জানি সে কি বলত!

অভাব যে কি বস্তু, এবার মাদাম লয়সেল তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে লাগল। কিন্তু বীরাঙ্গনার মতই সে এসব সহ্য করে যেতে লাগল। এই দারুণ দেনার হাত থেকে তাদের যে কোন প্রকারেই হোক পরিত্রাণ পেতেই হবে—তাকেই কষ্ট করতে হবে। তারা চাকরাণী ছাড়িয়ে দিল, অল্প ভাড়ার বাড়ীতে উঠে এল, টালি ছাওয়া একটা ঘরে এসে তারা বাস করতে লাগল।

বাড়ীর কাজকর্ম সব তাকেই করতে হত—রান্নাবান্না সব কিছু। নিজেই বাসন-কোসন ধোয়—তার চাঁপার কলির মত আঙুলে এখন ছাই পাঁশ লাগে। বাড়ীর সব ময়লা পোষাক তাকেই কাচতে হয়। দড়িতে খাঁটিয়ে শুকোতে হয়, বাড়ীর ময়লা সে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসে। জল সে নিজেই তোলে আর প্রত্যেকবার একটু করে জিরোয়। সে পোষাক পরে সাধারণ মেয়েদের মতো মুদির দোকান, মাংসের দোকান, ফলের দোকান যায়, হাতে ঝুড়ি ঝুলানো থাকে। আধ পয়সা বাঁচাবার জন্য জিনিষপত্রের দরাদরি করতে করতে তার জীবনীশক্তি যেন ক্ষয় হয়ে যায়!

প্রতি মাসেই কোন না কোন হ্যাণ্ডনোট নতুন করে লিখে দিতে হয়। এই ভাবে সময় নিয়ে ঋণ শোধ করা হয়।

লয়সলকে অফিসের পর রাত্রে অন্য দোকানের খাতা লিখতে হয়। তাছাড়া, বাড়ীতে রাত জেগে পাতা পিছু পাঁচ স্যু দরে তাকে নকল-নবীশের কাজও করতে হয়।

এভাবে তাদের দশ বছর কাটল। দশ বছর পরে তারা সব দেনা শোধ করে ফেলল—সুদে-আসলে সব দেনা এ-ভাবে শোধ হয়ে গেল। সুদও তো কম জমেনি!

মাদাম লয়সেলকে এখন দেখলে বুড়ী বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তার শরীরে শক্তি হয়েছে—দেহ শক্ত হয়েছে—তাকে দেখলে মনে হয় গরীব ঘরের মেয়ে। চুল ভাল করে বাঁধা হয় নি, পোষাক ময়লা, কোঁচকানো—হাতে দুটো লাল খসখসে, গলার স্বর কর্কশ—বড় বড় বালতি নিয়ে সে এখন ঘরের মেঝেও মোছে।

কোন কোন দিন তার স্বামী যখন অফিসে থাকে, তখন সে জানালার ধারে এসে বসে, আর সেই পুরোনো দিনেব সন্ধ্যায় সেই বল-পার্টির কথা ভাবে—সেই যে পার্টি, যেখানে সে সেজেগুজে গিয়ে সকলের প্রশংসা পেয়েছিল।

নেকলেসটা খোয়া না গেলে কি হত কে বলতে পারে?

কি অদ্ভুত, কি বিচিত্র—কি পরিবর্তন এ জীবনে! সামান্য একটা ঘটনা, তুচ্ছ একটা জিনিষ থেকে কারো বা সর্বনাশ হয় আর কারো বা বরাত ফিরে যায়।

* * *

এক রবিবারে মাতিলদা সাঁজেলিজেতে বেড়াচ্ছে! সারা সপ্তাহ বড় খাটুনি গেছে, তাই সেদিন সে বেড়াতে বেরিয়েছিল। সে দেখলে, একটা ছেলেকে নিয়ে একজন মহিলা আসছে। আরে মাদাম ফরেস্টিয়ার! তখনো তার কী রূপ, কী স্বাস্থ্য! তেমনি যেন ছোটটি আছে! এখনো ভারী সুন্দর রয়েছে। মাদাম লয়সেলের মনে হল, ওর সঙ্গে কথা বলা উচিত কি? নিশ্চয়ই উচিত। এখন ত সব দেনা শোধ হয়ে গেছে, তাকে সে সব বলবে। দোষ কি তাতে?

সেদিকে এগিয়ে গেল মাতিলদা: "সুপ্রভাত, জেনী।"

বন্ধু তাকে চিনতে পারলে না। কিন্তু এরকম ভাবে ঘনিষ্ট স্বরে ডাকতে শুনে সে আশ্চর্য হল। এ সামান্য মেয়েটি তাকে ডাকে কেন? সে আমতা আমতা করে বললে: কিন্তু মাদাম,—আমি ত আপনাকে জানিনা—আপনার বোধ হয় ভুল হয়েছে—

"না, ভুল হয়নি—আমি মাতিলদা লয়সেল!

বন্ধু আশ্চর্য হয়ে বললে, "আহা, মাতিলদা! তুমি একেবারে যে বদলে গেছ!"

"তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে আমার ভারী দুঃসময় গেছে ভাই! সে সব দুঃখের তুলনা হয় না, এসব দুঃখ তোমার জন্যেই।"

"আমার জন্যে? কি রকম?"

"মনে আছে সেই হীরের নেকলেসের কথা—সেই যে ভাই, যেটা আমাকে তুমি পরতে দিয়েছিলে? সেই যেটা পরে আমি বল নাচের পার্টিতে গিয়েছিলুম!"

"হ্যাঁ, খুব ভালই মনে আছে।"

"সেইটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলুম।"

"সে কি ? সেটাত তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে এসেছিলে ?"

"আমি আরেকটা ফিরিয়ে দিয়ে এসেছিলাম—ঠিক সেই রকম আরেকটা নেকলেস। সেই নেকলেসের দাম শোধ করতে আমাদের দশ বছর খুব কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল। বোঝত, আমাদের পক্ষে বড় সহজ কথা নয়—আমাদের কিছু ছিল না—যাক, সে দেনা এখন চুকে গেছে। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছি।"

মাদাম ফরেস্টিয়ার কি যেন ভাবলে। বললে: "তুমি বলছো যে, তুমি একটা হীরের নেকলেস কিনে আমার মেকলেসটার বদলে দিয়ে এসেছিলে ?"

"হ্যাঁ, তুমি তখন ধরতে পারো নি—দুটো প্রায় একরকমই দেখতে ছিল কিনা!"

মাতিলদার মুখে এক প্রাণখোলা গর্বের হাসি। মাদাম ফরেস্টিয়ার অভিভূত হয়ে পড়ল, মাতিলদার হাত দুটো হাতের মধ্যে নিয়ে বললে: "আহা! মাতিলদা, আমার নেকলেস যে নকল হীরের ছিল, তার দাম যে পাঁচশো ফ্রাঁর বেশী নয়!"

———

## তেইশ

## ॥ জ্যোৎস্না ॥

মাদাম জুলি রুবেয়ার বসে আছেন অপেক্ষা করে—সুইজারল্যাণ্ড ঘুরে সবে মাত্র ফিরেছেন। তাঁর দিদি—মাদাম অঁরিয়েতা লেতোর, তিনি ফিরবেন, তাঁর জন্যেই প্রতীক্ষা।

সপ্তাহ পাঁচ আগে লেতোর পরিবার চলে এসেছেন—মাদাম তাঁর স্বামীকে ক্যালভাদোসে তাঁর জমিদারী দেখতে পাঠিয়েছেন—সেখানে তাঁর বহু দরকারী কাজ রয়েছে। তাই মাদাম অঁরিয়েতা দিন কতক বোনের বাড়ী প্যারীতে কাটাতে এসেছেন। বেশ রাত হয়ে গেছে—বৈঠকখানা নিস্তব্ধ—গোধূলির ছায়া পুঞ্জে পুঞ্জে জমা হচ্ছে, মাদাম রুবেয়ার অন্যমনস্কভাবে বই পড়ছেন, আর কোন শব্দ কানে গেলেই সচকিত হয়ে উঠছেন।

শেষে দরজায় একটা ঘণ্টার শব্দ হল—আর সঙ্গে সঙ্গে মাদাম রুবেয়ারের দিদি একটা ঢিলে পোষাক গায়ে দিয়ে ঘরে ঢুকলেন। কেতাদুরস্ত সম্ভাষণ বা আদব-কায়দা না দেখিয়ে দুই বোন দুইজনকে জোরে আঁকড়ে ধরলেন, ছেড়ে দিয়ে আবার নতুন করে আঁকড়ে ধরলেন পরস্পরকে। তারপর কে কেমন আছে, বাড়ীর সব খবরাখবর নেওয়া ইত্যাদি চলল অনেকক্ষণ—আর হাজার হাজার বিষয়ের কত কী কথা—ছোট ছোট ভাঙা কত কী উক্তি—ইতিমধ্যে মাদাম অঁরিয়েতা তাঁর বহির্বাস খুলে ফেললেন।

এতক্ষণে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। আলো দিয়ে যাবার জন্যে মাদাম রুবেয়ার ঘণ্টা বাজালেন। আলো আসতেই রুবেয়ার দিদির মুখখানা ভালো করে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন—দিদিকে আরেকবার বুকে জড়াতে যাবেন, এমন সময়ে কি যেন দেখে চমকে তিনি বিবর্ণ হয়ে গেলেন—পিছিয়ে এলেন কয়েক পা—মাদাম লেতোরের কপালের দুদিকে দু গুচ্ছ সাদা রূপালী চুল তিনি লক্ষ্য করলেন।

তাঁর আর সব চুল কালো চিকচিকে—কিন্তু মাথার দুই ধারে যেন দুটি সরু রূপালী ধারা কালো কেশের সমুদ্রে মিশে গেছে।

বয়স আর কত হবে? এখনও চব্বিশও হয়নি। এই পরিবর্তন ত তাহলে সুইজারল্যাণ্ড যাবার পরেই ঘটেছে!

অবাক হয়ে নিশ্চল প্রতিমার মতই মাদাম রুবেয়ার তাঁর দিদির দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর দুচোখ অশ্রুতে ভরে উঠল। তাঁর যেন মনে হল যে, নিশ্চয়ই তার দিদির ভয়ঙ্কর কোন বিপদ ঘটেছে। তিনি বললেন, "অঁরিয়েতা, তোমার কি হয়েছে?" বিষণ্ণ ও ম্লান হাসি হেসে—যেন তাঁর হৃদয়ে কত ব্যথা! অঁরিয়েতা বললেন, "কৈ, কিছু না ত! ও, আমার পাকা চুল লক্ষ্য করছিলে বুঝি?"

মাদাম লেতোর গভীর আবেগে অঁরিয়েতার গলা জড়িয়ে ধরে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করতে করতে বললেন, "কি হয়েছে তোমার? বলো, তোমার কি হয়েছে? মিথ্যে বললে কিন্তু আমি ধরে ফেলবো—তা আগেই বলে রাখছি।"

মুখোমুখি বসে রইলেন দুজনে। মাদাম অঁরিয়েতার মুখে রক্ত নেই, তিনি যেন এখনি মূর্ছা যাবেন। তাঁর আনত চোখের দুই কোনে দুটি মুক্তার মত অশ্রুবিন্দু টল্ টল্ করতে লাগল।

তাঁর বোন জিজ্ঞাসা করেই চললে: "কি হয়েছে তোমার? কি হয়েছে আমাকে বল—"

চাপা স্বরে বহু কষ্টে মাদাম অঁরিয়েতা উচ্চারণ করলেন: "আমি একজনকে ভালবেসে ফেলেছি।" এই বলে ছোট বোনের কাঁধের মধ্যে মাথা লুকিয়ে তিনি হু হু করে কেঁদে ফেললেন।

অনেকক্ষণ কান্নার পর একটু শান্ত হলেন। বুকের স্পন্দন একটু কমলে তিনি বুকের বোঝা হালকা করবার জন্যেই তাঁর দরদী একজনের কাছে গোপন কথাটা সুরু করলেন।

তখন হাত ধরাধরি করে তারা দুজনে অন্ধকার ঘরের একটা

কোনের একটা শোফাতে গিয়ে বসলেন। ছোট বোন গলাটা আঁকড়ে তাঁকে ধরে বুকের কাছটিতে টেনে আনলেন। কথাগুলো যেন ভাল করে শোনা যায়।

"হায়! আমি বেশ বুঝেছি যে আমার কোন কৈফিয়ৎ নেই; আমি যে কাজ করেছি তার বোধ পর্যন্ত আমার নেই—সেদিন থেকে আমার কেবল যেন মনে হচ্ছে, আমি যেন পাগল হয়ে গেছি। বোনটি! সাবধানে থেকো—খুব সাবধান! মেয়েরা যে কি দুর্বল, তা যদি জানতে—কত সহসা আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলি, মনটা এক মুহূর্তে নরম হয়ে যায়। হঠাৎ কি এক দুঃখ এসে মন ভরিয়ে দিয়ে যায়! হঠাৎ এক গোপন আকাঙ্খায় আমাদেব হৃদয় উল্লসিত হয়ে দু বাহু দিয়ে কাউকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হয়। ভালবাসতে, আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে সে কি তীব্র আকুলতাই না মেয়েদের মনে সময়ে সময়ে জাগে!

আমার স্বামীকে ত তুমি জান; তাঁকে আমি কত ভালবাসি, তাও তোমার অজানা নেই; তাঁর মন পরিণত, তিনি হিসেবী, কিন্তু নারী-হৃদয়ের কোমল উচ্ছ্বাস উপলব্ধি করবার ক্ষমতা তাঁর নেই। তিনি চিরকালই সেই এক রকম—তিনি ভালমানুষ, হাসিখুশি, সদয় আর নিখুঁত। তোমাকে বলতে আমার লজ্জা নেই, মাঝে মাঝে মনে হত, তিনি যদি এরকম সংযত স্বভাবের না হয়ে কঠোর হতেন, গাঢ়ভাবে আমাকে বাহুর বন্ধনে বেঁধে তিনি যদি ধীরে ধীরে মধুরভাবে অনেকক্ষণ ধরে চুমু খেতেন—তবে বোধহয় আমাদের আত্মা এক হয়ে যেত—দুজনের প্রতি গভীর নির্ভরতায় দুটি প্রাণ কূলে কূলে ছল্-ছলিয়ে উঠত! তিনি যদি দুর্বল হতেন, নিজেকে অবহেলা করতেন, তবে আমাকে সকল সময়েই তাঁর দরকার হত, আমার আলিঙ্গন, আমার আদর, আমার প্রেম! পোড়া চোখে জল আবার এসে গেল!

এ সব তোমার কাছে নির্বোধের উক্তির মত শোনাবে—কিন্তু আমরা—মেয়েরা—ঐ রকমই। এ ছাড়া আমাদের উপায় নেই।

"কিন্তু তবু তাকে ঠকাবার কথা কোনদিনই আমার মনে হয়নি কিন্তু তাই ত ঘটল শেষে—ভালবাসা নয়, বিচার-বিবেচনা নয়, কিছু নয়—শুধু এক রাত্রে লুক্রিন হ্রদে জ্যোৎস্না পড়েছিল বলেই ব্যাপারটা ঘটে গেল।

".স সময়ে আমরা দুজনে অনেকক্ষণ বেড়াচ্ছি—আমার স্বামী সর্বদা উদাসীন—তিনি আমাব উৎসাহ, উচ্ছ্বাস, কাব্য-প্রেরণা উদাসীনতা দিয়ে স্তব্ধ কবে দিতেন। সকালে সুন্দব সূর্য উঠেছে—সূর্যালোকে আলোকিত পাহাড়ের পথ দিয়ে আমরা গাড়ী করে নেমে আসছি—ঘোড়া চাবটে বহু কষ্টে ছুটে চলেছে।

উপত্যকা, বন, জঙ্গল, নদ, নদী, গ্রাম সব এক আবছা কুয়াসায় ঢেকে গেছে। আমি তখন আনন্দে অধীর হয়ে তাঁর হাত চেপে ধরে বলতুম, "কি সুন্দর দৃশ্য! প্রিয়তম, একবার আমাকে একটা চুমু দাও।" তিনি শুধু আমাকে বলতেন, "এ দৃশ্য ভাল লাগছে বলে আমাকে যে চুমু দিতে হবে, তাব ত কোন কাবণ দেখিনা।" বলে তিনি হাসতেন আর তাতেই আমার আনন্দ, উচ্ছ্বাস সব স্তব্ধ হয়ে যেত।

"এ-ভাবে তাঁব কথা শুনে আমার মুখেব ভাষা বুকেই চাপা থাকত। আমার মনে হয়, দুজনেব মধ্যে ভালবাসা জন্মালে, কোন সুন্দব দৃশ্য দেখলে, তাদেব আরো বেশী কবে ভালবাসতে ইচ্ছে যায়।

"সত্যি, সত্যি, আমার মনে যে কাব্য উথলে উঠত, তা তিনি থামিয়ে দিতেন। আমি কি কবে তা তোমাকে বোঝাব? আমার উৎসাহ-উদ্দীপনা মনে চেপে বুক ফেটে মরবার মত হত।

"দিন চারেকের জন্যে আমরা হোটেল দ্যু ফ্ললেন-এ ছিলাম। একদিন সন্ধ্যেবেলা ববার্টের মাথা ধরেছে। তিনি সান্ধ্য-ভোজের পরেই ঘুমুতে গেলেন আর আমি একলাই লেকের ধারে বেড়াতে গেলাম।

"সে রাত যেন রূপকথায় গড়া রাত! মাঝ আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠেছে। উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাথায় তুষারে জ্যোৎস্না পড়েছে, যেন

রূপের তাজ মাথায় পরে তারা দাঁড়িয়ে আছে। লেকের জলে ছোট ছোট ঢেউ চিক চিক ঝিক ঝিক করছে। একটা ফুরফুরে মৃদু বাতাস বইছে। কেবল একটু অনুভূতি যেন সমস্ত আত্মাকে ঢেকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে—সমস্ত মন্ যেন দ্রবীভূত হয়ে পড়ছে—মনে হচ্ছে যেন অকারণেই গভীর দোলা এসে লাগছে। ঠিক এই সময়ে মনের অনুভূতি কী ভীষণ, কী তীক্ষ্ণ হয়। তখন মনে যে কী দারুণ তীব্র অনুভূতি জাগে, তা কি করে তোমাকে বোঝাই!

ঘাসের ওপরেই বসে পড়লুম—বিরাট হ্রদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম—হ্রদটা দেখলে মনটায় কেমন ব্যথা জাগে কিন্তু তবু সেটাকে দেখতে হয়—যেন হ্রদের জলে কি যেন এক জাদু আছে। এই সময় মনে এক অদ্ভুত ভাব এসে ঢুকল—কী জানি যেন কোথা থেকে এক অতৃপ্ত, চির তৃষাতুর, অভাববোধ আমাকে ব্যাকুল করে দিলে—মনে হল আমার যেন ভালবাসা চাই—আমার অতীত জীবন একঘেয়ে অন্ধকার নিরানন্দে ভরা বলে মনে হতে লাগল। কেবলই মনে হতে লাগল, হায়! জীবনে কি কোনদিন এমনি জ্যোৎস্নার রাত্রে, এমনি হ্রদের ধারে কেউ আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আদর করবে না? আমার ভালবাসার লোক কি কখনো এমনি রাতে আমার অতৃপ্ত ওষ্ঠাধারে মধুর, গভীর মাদকতাময় চুম্বনের স্পর্শ দেবে না? এমনি রাত যে ভগবানের নিজের হাতে তৈরি! এমনি কামনা, এমনি বাসনা আলিঙ্গনের জন্যেই আর প্রেমিক-প্রেমিকার জন্যেই যেন ভগবান এই জ্যোৎস্না রাত সৃষ্টি করেছেন।

এই রকম গ্রীষ্মের জ্যোৎস্না রাতের ছায়ান্ধকারে আমি কি কোন দিন নিবিড়, উষ্ণ আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হব না?

হঠাৎ পাগলের মত আমি কেঁদে উঠলাম—মনে হল আমার পিছনে কে যেন আসছে। কে যেন একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম—সে আমাকে চিনতে পেরে এগিয়ে এসে বললে: মাদাম, আপনি কাঁদছেন?

লোকটি এক অল্পবয়সী ব্যারিষ্টার—মাকে নিয়ে তিনিও বেড়াতে এসেছেন। আমাদের সঙ্গে প্রায়ই তাঁর দেখা হত। তিনি প্রায়ই আমার দিকে একটু-আধটু মনোযোগ দিতেন।

আমি এত হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম যে, কি যে বলব, কি যে করব, তা যেন ঠিক পাই নি। যা হোক, শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, আমাব শরীরটা খুব অসুস্থ লাগছে।

আমাকে বেশ সমীহ করেই, তিনি সহজভাবে আমার পাশে পাশে বেড়াতে লাগলেন—বেড়াতে এসে যে সব দৃশ্য দেখছেন সেই সব নিয়ে গল্প জুড়ে দিলেন। আমার মনে হতে লাগল, আমার মনে যে-সব ভাবের উদয় হয়েছিল, সে-সবই যেন তিনি বলে যাচ্ছেন—যে-সব দৃশ্য দেখে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম, সে-সব দৃশ্য তিনি আমার চেয়েও বেশী করে অনুভব করেছেন। হঠাৎ তিনি আলফ্রেড্ মুসের এক কবিতা আওড়াতে লাগলেন। তখন অবর্ণনীয় এক আবেগে যেন আমাব অন্তরাত্মা কম্পিত, স্পন্দিত হয়ে উঠল; মনে হতে লাগল যেন আমার কণ্ঠরোধ হয়ে যাচ্ছে। মনে হতে লাগল, জ্যোৎস্না, পাহাড়, হ্রদ, যেন আমাকে অনন্ত সৌন্দর্য, অফুরন্ত মাধুর্যের সুমধুর এক গান শোনাচ্ছে।

স্বপ্নের এক মোহময় আবেশের মধ্যে কি করে কন জানিনা, যা ঘটবার তাই ঘটে গেল।

লোকটিকে কিন্তু সেদিন থেকে আর দেখিনি। যেদিন তিনি চলে যান, সেদিন সকালে দেখা করে গেলেন—আর তাঁর ঠিকানা রেখে গেলেন।

এই বলে বোনের বুকের মধ্যে মাথা দিয়ে মাদাম লেতোর কান্নায ভেঙে পড়লেন—সে কী আর্তি।

মাদাম রুবেয়ার বেশ আত্মস্থ ও গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে বললেন: "দেখ দিদি, প্রায়ই আমরা, মেয়েরা, ঠিক কোন একটা বিশেষ লোককে যে ভালবাসি তা নয়—আমরা যেন তার ভালবাসাকেই ভালবাসি। সে রাতে সত্যিই তুমি জ্যোৎস্নাকেই ভালবেসেছিলে।"

## চব্বিশ

## ॥ ইশারা ॥

ছোট্টখাট্ট হালকা ফুরফুরে মার্শিয়নেস্ দ্য রেনেদঁ তখনো অন্ধকার এক সুগন্ধি ঘরে বিছানায় অকাতরে ঘুমোচ্ছিলেন।

খুব শান্তিতে তিনি একা একা ঐ ঘরে গভীর আরাম করছিলেন। খাটটা নরম, নীচু, নরম ক্যামব্রিকের চাদরের তলায় খুব সুখে তিনি ঘুমোচ্ছিলেন—আহা চুম্বনের মত মৃদু নরম সে চাদরের স্পর্শ! আর ঘুম! স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের পর মেয়েরা যেমন নিরুপদ্রব শান্তিতে ঘুমোয়, এ সেই রকম শান্তিপূর্ণ ঘুম।

ছোট্ট নীল বৈঠকখানা থেকে খুব গোলমাল আসতেই মার্শিয়েনেস্ ব্যারনেস দ্য গ্রাঁগেরীর গলা শুনতে পেলেন। ঝি তাঁকে আসতে দিচ্ছে না, বলছে মার্শিয়েনেস্ এখন ঘুমোচ্ছেন—আপনাকে যেতে দেওয়া হবে না। তাঁকে তখনই উঠতে হল দরজা খুলে, পর্দা সরিয়ে তিনি শুধু তাঁর মাথাটুকু বার করলেন—সুন্দর অজস্র চুলের গুচ্ছে ঢাকা মাথাটুকু পর্দার বাইরে বার করে জিজ্ঞাসা করলেন— "কি ব্যাপার? এত সকালে যে? এখনও ত নটা বাজে নি!"

ব্যারনেস একেবারে ভয়ে বিবর্ণ, স্নায়বিক উত্তেজনায় কাতর এবং বেশ উত্তেজিত হয়ে বললেন, "একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটেছে তা-ই বলতেই ছুটে এসেছি!"

"এসো, বন্ধু, ভিতরে এসো।"

ব্যারনেস্ ঘরের মধ্যে এলেন—দুজনে পরস্পরকে চুমু খেলেন। তারপর মার্শিয়নেস্ বিছানার মধ্যে ঢুকলেন। ঝি এসে জানালাগুলো খুলে দিলে; ঘরে আলো ঢুকল। ঝি চলে গেলে মাদাম দ্য রেনেদঁ বললেন, "হ্যাঁ, এইবার বলো—কি ব্যাপার?"

মাদাম ছ গ্রঁাগেরীর ছ চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল—এই জলই মেয়েদের এত মোহময়ী করে তোলে। হু হু করে, গ্রঁাগেরী কেঁদে বললেন—কিন্তু চোখ মুছলে পাছে চোখ লাল হয় তাই চোখ মুছলেন না—"বন্ধু, আমার যা হয়েছে তা বলবার অযোগ্য—ঘৃণ্য, অতি ঘৃণ্য এক ব্যাপার—সারারাত আমার ঘুম হয়নি—এক মুহূর্তের জন্যে চোখের ছপাতা এক , – · ›, এক মিনিটও ঘুমোইনি—একবার বুকে হাত দিয়ে দে'খা, বুক কী ভীষণ ধড়ফড় করছে।"

এই বলে বন্ধুর হাতটা নিয়ে নিজের শক্ত সুগোল বুকের আচ্ছাদন ছটির উপর তিনি রাখলেন—এই হৃদয়ের আচ্ছাদনই পুরুষের পক্ষে যথেষ্ট—এর নীচের খবর প্রায়ই কেউ খুঁজে দেখে না। কিন্তু সত্যিই তাঁর হৃদয় ভীষণ ধড়ফড় করছিল।

তিনি বলতে লাগলেন, "গতকাল দিনের বেলা এ ব্যাপারটা ঘটেছে চারটে সাড়ে চারটে সময়—ঠিক সময় বলতে পারব না। তুমি ত আমার বাড়ীটা জানো, আর আমার বৈঠকখানায় বসে, জানো ত, রু সন্ত-ল্যাজারের রাস্তা দেখা যায়। আর জানলায় বসে লোকের যাওয়া-আসা দেখা আমার কেমন যেন একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। রেল স্টেশনের পাড়াটা খুব আনন্দময়—কেমন ব্যস্ত-ব্যস্তভাব, কেমন প্রাণপূর্ণ—আমি এমনটিই ভালবা !

কাজেই কাল আমি আমার আরাম-কেদারা এনে জানলার ধারে বসে আছি—জানলা খোলা আছে—মনটা অন্যমনস্ক—কিছু ভাবছি না—শুধু তাজা বায়ুই সেবন করছি, জানো ত কাল কী চমৎকার দিন ছিল!

"হঠাৎ, দেখলাম, আমার জানলার ঠিক মুখোমুখি রাস্তার ওধারের বাড়ীর জানলায় লাল পোষাক পরে একটি মেয়ে বসে আছে। আমার পরণে ছিল আমার প্রিয় মভ রংয়ের সেই পোষাকটা—দেখেছ ত সেটা। মেয়েটিকে আমি জানতাম না, মেয়েটি নতুন এসেছে—মাসখানেক হবে। আর মাসখানেক ধরেই

বৃষ্টি চলছে—কাজেই মেয়েটিকে আগে আমি দেখিনি। কিন্তু দেখেই বুঝলাম মেয়েটি খারাপ। আমার মত সেও জানলায় বসে আছে দেখে প্রথমটা আমার মনে একটা ধাক্কা লাগল—তারপর তার গতিবিধি আমি কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগলাম। জানলার চৌকাঠের ওপর কনুই রেখে সে রাস্তার পুরুষদের লক্ষ্য করতে লাগল, পুরুষরাও তার দিকে মুখ তুলে তাকাতে লাগল—প্রায় সব পুরুষই। কি জানি কি করে তারা বাড়ীর কাছে এসেই টের পাচ্ছিল—তারা মাথা তুলে তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় কবছিল—

সে যেন চোখের চাউনিতে জানাচ্ছিল, "কি হে তুমি রাজী?" তাদের চোখ যেন উত্তর দিচ্ছিল, "সময় নেই"; "অন্য দিন হবে": কিম্বা "ট্যাকে কিছুই নেই"; কিম্বা "শয়তানী, যা পালা।"

মেয়েটার এই রকম ব্যবহার লক্ষ্য করার মধ্যে যে কি মজা, তা আর কি বলব! কিন্তু এই তার নিত্য-দিনের কারবার।

মাঝে মাঝে সে হঠাৎ জানলাটা বন্ধ করে দিচ্ছিল—আর আমি লক্ষ্য করছিলাম একটা লোক বাড়ীতে ঢুকছে। জেলেরা যেমন বঁড়শী দিয়ে বড় মাছ গাঁথে, তেমনি মেয়েটা একটা করে পুরুষকে গাঁথছিল। আমি ঘড়ি ধরে লক্ষ্য করলাম, তারা মিনিট বারো থেকে কুড়ি মিনিটের বেশী থাকছিল না। শেষটায় মেয়েটা যেন আমাকেও যাত্ন করে ফেললে—ঠিক যেমন করে মাকড়শা মাছিকে যাত্ন করে। কিন্তু মেয়েটা কি জঘন্য।

মনে মনে আমি ভাবতুম: আচ্ছা, কি করে ও ওর মনের কথা এত তাড়াতাড়ি জানায়? ও কি মাথা নেড়ে কোন ভঙ্গি করে—না হাত নেড়ে ডাকে? আমি অপেরা গ্লাশ বার করে ওর কায়দা লক্ষ্য করতে লাগলাম। আরে! ভারী সহজ ত! প্রথমে চোখের একটা চাউনি, তারপর একটু মুচকি হাসি, তারপর মাথা নেড়ে প্রশ্ন: আসছ নাকি ওপরে? কিন্তু সবই এমন ঠারে ঠোরে, এমন কৌশলে ও কায়দায় করা হয় যে, বহু অভ্যাসে তা রপ্ত করা যায়। মনে

মনে ভাবতে লাগলুম, চেষ্টা করলে আমিও কি ওর ইঙ্গিত অভ্যাস করতে পারি না! নীচে থেকে ওপরে—বেশ সাহসের দরকার আর কায়দাটা বেশ সুন্দর—ওর ভঙ্গীগুলো বেশ সুন্দর।

আমি উঠে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ইঙ্গিতগুলো রপ্ত করতে সুরু করলাম—আরে, ওর চেয়ে আমি ঢের ভাল পারি—আমার কেমন যেন নেশা ধরে গেল। আমি জানলায় এসে বসলুম।

আর সে কাউকেই ধরতে পারে না—একজনও নয়। তার পড়তা শেষ হয়ে গেল। সত্যি, এ উপায়ে জীবিকা-সংস্থান করা বড় কষ্টকর কিন্তু এতে মজাও আছে—রাস্তায় এক একজন ভারী সুন্দর লোক দেখা যায়।

এর পরে রাস্তার সব লোক আমার বাড়ীর দিকে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটা সুরু করলে —তার দিকের ফুটপাথে একটাও লোক নেই—তাছাড়া সূর্যের আলো এখন এদিকে পড়েছে। তাবা এক জন এক জন করে আসতে লাগল—যুবক, বৃদ্ধ, কালো, ফর্সা, ধূসর—কতকগুলো লোককে ভারী সুন্দর দেখতে—সত্যিই মিষ্টি—আমার স্বামী বা তোমার স্বামীর চেয়ে ঢের সুন্দর। তোমার আগেকার স্বামী, যার সঙ্গে তুমি বিচ্ছেদ ঘটিয়েছ—এর মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া যায়।

মনে মনে ভাবলুম: আমি যদি ওদের ইঙ্গিত করি, ওরা কি আমার ইঙ্গিত বুঝবে—বুঝবে আমার ইশারার ভাষা। আমি ত ভাল মেয়ে—রূপোপজীবিনী নই! কি জানি কেন ইশারা করবার একটা অদম্য স্পৃহা আমাকে পেয়ে বসল। সে এক ভীষণ, দুর্দমনীয়, ভয়ঙ্কর ইচ্ছা—এ ইচ্ছা কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা গেল না। ঐ রকম ইচ্ছা আমার মধ্যে মধ্যে হত। কি বোকার মতই না এসব কাজ, কি বলো? সত্যি কথা বলতে কি আমরা, মেয়েরা, ঠিক বানরের মত—আমি একজন ডাক্তারের মুখে শুনেছি যে আমাদের মস্তিষ্ক নাকি কিছুটা বানরের মত। সত্যি, দেখ আমরা ঠিক কাউকে না কাউকে

নকল করবই—যখন স্বামীদের ভালবাসি তখন আমরা তাদের নকল করি, বিশেষ করে বিয়ের কয়েকমাস পর্যন্ত। তারপর আমাদের প্রেমিকদের নকল করি, তারপর বান্ধবীদের—আর যারা আমাদের কাছে প্রাণের কথা বলে—তাদের—যদি সে কথা আমাদের ভাল লাগে। আমরা তাদের চিন্তায় মশগুল হয়ে তাদের নকল করি—তাদের কথা—তাদের উচ্চারণ, তাদের হাবভাব, তাদের ভাব-ভঙ্গী! এর চেয়ে বোকামি আর কি হতে পারে?

আমার কোন কিছু করবার ঝোঁক চাপলে আমি তা করে থাকি। কাজেই আমি মনে মনে বললুম: একবার আমি দেখব ইশারা করে—অন্তত: একটি লোকের ওপর। কেবল পরীক্ষা করবার জন্যে। আমার আর কি হবে? কিছুই হবে না! একবার হাসি বিনিময় করব—ব্যস্! আর কিছু নয়—তারপর অস্বীকার করলেই হবে।

কাজেই আমি লোক পছন্দ করতে সুরু করলাম। একজন খুব সুপুরুষ ও সুন্দর লোক চাই। হঠাৎ দেখি বেশ লম্বা সুন্দর, সুশ্রী একজন ভদ্রলোক আসছেন। আমি সুন্দর লোকদের ভালবাসি—তা ত জানই! আমি তাঁর দিকে তাকালাম—তিনি আমার দিকে তাকালেন; আমি হাসলুম, তিনিও হাসলেন। আমি ইশারা করলুম; তিনি উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, রাজী, অবশ্য মাথা নেড়ে। সর্বনাশ! লোকটি একেবারে সটান দরজায় এসে হাজির।

বন্ধু, তখন আমার মনের যা অবস্থা, তা তুমি কল্পনা করতে পারবে না। একবার ভেবে দেখ, আমার চাকরদের সঙ্গে সে কথা বলবে। যোশেপের সঙ্গে কথা বলবে আর যোশেপ আবার আমার স্বামীর পেয়ারের চাকর। যোশেপ হয়ত ভাববে যে, ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বহু দিনের খাতির!

আমি কি করতে পারতাম, বল ত? এখুনি হয়ত দরজার বেল বাজিয়ে আমাকে ডাকবে? কি করা যায়, বল? ভাবলুম, তাঁকে জানাই যে, তাঁর ভুল হয়েছে—তাঁকে ফিরে যেতে বলি! দুর্বল

মেয়েকে তিনি কি দয়া করবেন না? আমি ছুটে দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুললাম। আমি বোকার মত আমতা আমতা করতে লাগলাম! "মঁশিয়ে, আপনি চলে যান. আপনি ভুল করেছেন —ভীষণ ভুল, ভয়ঙ্কর ভুল—আমি আপনাকে আমাদের বন্ধু ভেবেছিলাম—তাঁর সঙ্গে আপনার চেহারার মিল রয়েছে কি না!"

কিন্তু তিনি হাসতে লাগলেন; বললেন, সুপ্রভাত প্রিয়ে, তোমার ওসব গল্প আমার জানা আছে। তোমার স্বামী আছে, কাজেই কুড়ি ফ্রাঁতে হবে না, তোমার চল্লিশ ফ্রাঁ চাই, এই ত! তাই পাবে— নাও, এখন কোন পথে যাব তাই বল।"

এই বলে আমার গায়ে গা ঠেশে আমাকে বাড়ীর মধ্যে টেনে নিয়ে তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমি ভয়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি আমাকে চুমু খেয়ে আমার কোমরে হাত দিয়ে আঁকড়ে বসবার ঘরের দিকে টেনে নিয়ে চললেন—বসবার ঘরের দরজা খোলাই ছিল। তারপর ঘরের আসবাবপত্র সব লক্ষ্য করতে করতে বললেন, "চমৎকার, তোমার ঘরটা সুন্দর। এখন বোধহয় পড়তা খারাপ—তাই জানলা দিয়ে খদ্দের পাকড়াবার ব্যবসা ফেঁদেছ?"

"কি আর করি? আবার নতুন করে কাকুতি-মিনতি করলুম: মঁশিয়ে। আপনি যান, দয়া করে যান। শীঘ্র আমার স্বামী এসে পড়বেন, তাঁর আসবার সময় হয়ে পড়েছে। আমি দিব্যি করে বলছি, আপনার ভুল হয়েছে।"

কিন্তু তিনি শান্তভাবে বললেন, "এসো, এসো, আর বাজে কথায় দরকার নেই—তোমার স্বামী এসে পড়লে আমি না হয় তাঁকে ওপারের কাফেতে নিয়ে মদ খাবার জন্যে আরো পাঁচ ফ্রাঁ দেব'খন।" তারপর দেয়ালে রাউলের ছবিটা দেখে বললেন, "ঐ বুঝি তোমার স্বামী?"

—"হ্যাঁ, ঐটা।"

—"লোকটা দেখতে ভাল, কিন্তু খিট্‌খিটে বলে মনে হয়। আর এটা কার ছবি? তোমার বান্ধবীর, বুঝি!"

সেটা ছিল তোমার বল্‌নাচের পোষাকে তোলা ছবি। তখন কি যে বলছি তা জানি না—আমতা আমতা করে বল্‌লাম! "হ্যাঁ"।

"বেশ সুন্দর চেহারা—আমার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিও।"

তখন ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল। রাউল রোজ সাড়ে-পাঁচটায় বাড়ী ফেরে! ধরো, লোকটা যাবার আগেই রাউল যদি বাড়ী ফেরে? আমার মাথা তখন একেবারে খারাপ হয়ে গেল। তখন—তখন—ভাবলুম—যা করে হোক্ তার হাত থেকে অব্যাহতি পেতেই হবে—খুব তাড়াতাড়ি—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব—যত শীঘ্র কাজ শেষ হয় ততই ভাল—বুঝছ ত আমার বিপদ!

মার্শিয়নেস্ পাগলের মত বালিশে মাথা গুঁজে হাসতে লাগলেন—সমস্ত খাটটা তাঁর হাসির ধমকে কাঁপতে লাগল। একটু শান্ত হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, লোকটা দেখতে বেশ সুন্দর?"

"হাঁ।"

"তবে তুমি আপত্তি করছ কেন?"

"কিন্তু—কিন্তু—তুমি বুঝছ না—লোকটা আবার কাল আসবে বলে গেছে—ঠিক ঐ সময়ে—এতে আমার বড্ড ভয় করছে—লোকটি নাছোড়বান্দা—এখন আমি কি করব—

মার্শিয়নেস বিছানার উপর উঠে বসলেন। ভাববার জন্যে একটু স্থির হয়ে বসলেন। তারপর সহসা বললেন, "পুলিশে ধরিয়ে দাও।"

ব্যারনেস্ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আমতা আমতা করে বললেন, "কি বলছ? ওকে ধরিয়ে দেবো? কিন্তু কি ওজুহাতে?"

"সে খুব সহজ। তুমি পুলিশে গিয়ে বল যে, একজন ভদ্রলোক তোমাকে তিনমাস্ ধরে অনুসরণ করছে; কাল সে তোমার ঘর পর্যন্ত ধাওয়া করে এসেছিল—আবার সে কাল আসবে বলে তোমাকে

শাসিয়ে গেছে। কাজেই এখন তুমি আইনের আশ্রয় চাও—ওরা থানা থেকে দুজন পুলিশ পাঠাবে—তারা ওকে ধরে নিয়ে যাবে।”

“কিন্তু, ভাই, ও যদি সব কথা বলে দেয়—”

“পুলিশ ওর কথা বিশ্বাস করবে না। আরে বোকা, তুমি যদি পুলিশের কর্তার কাছে তোমার গল্পটা কায়দা করে বলতে পার ত, তারা তোমার কথাই বিশ্বাস করবে। তোমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র—তুমি সমাজে বাস করছ।”

“না না, সেরকম বলতে আমি পারব না, আমার ভয় করবে।”

“তোমাকে সাহস করে বলতেই হবে—নয়ত তুমি মরবে!”

“তাকে যদি পুলিশে ধরে সে কি আমাকে অপমান করবে না?”

“ভাল কথা, তুমি সাক্ষী দেবে তাতেই তার সাজা হয়ে যাবে।”

“কি সাজা?”

“ক্ষতিপূরণ। এ ব্যাপারে, নির্মম হতে হবে।”

“ওঃ! সে টেবিলে দুটো কুড়ি ফ্রাঁ রেখে গেছে!”

—“এর বেশী নয়?”

—“না।”

—“এ বড্ড কম—এতে আমার অপমান হত। কি বল?”

—“কিন্তু, এ দিয়ে আমি কি করব?”

মার্শিয়নেস্ একটু ইতস্ততঃ করলেন তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন: “ভাই, এক কাজ কর—এই কুড়ি ফ্রাঁ দিয়ে তোমার স্বামীর জন্যে একটা উপহার কিনে দিও। তাহ'লে ঠিক ন্যায় বিচার হবে!”

---

## পঁচিশ

## ॥ ব্রাজিলিয়ার রূপসী ॥

কয়েক বছর আগে ব্রাজিলিয়ায় একজন বিখ্যাত ইহুদী জ্যোতিষী ছিল। ভগবদ্ভক্তি, বিদ্যা বা জ্ঞানের জন্য লোকটির নাম ছড়ায়নি; তাঁর নাম বিশেষ করে ছড়িয়েছিল তার সুন্দরী স্ত্রীর জন্যেই।

ব্রাজিলিয়ার রূপসী কথাটা সত্যিই তার স্ত্রীর পক্ষে খাটে,—এমন অপূর্ব রূপ ত' বড় একটা দেখা যায় না। তার উপর ইহুদী জ্যোতিষীদের স্ত্রী সাধারণতঃ অত্যন্ত কুৎসিতই হয়ে থাকে। তাছাড়া তাদের দেহের একটু-আধটু খুঁতও থাকে।

জ্যোতিষী ব্যাপারটা এইভাবে ব্যাখ্যা করত: সকলেই জানে মানুষের বিয়ে হয় স্বর্গে—ছেলের জন্ম হ'লেই স্বর্গে দৈববাণী হয়। তাতে ছেলেটির বৌ-এব নাম জানিয়ে দেওয়া হয়। মেয়েদেব বেলাতেও তাই। ভালো বাপ যেমন ভালো ভালো জিনিস বাইরে বেচে এসে খারাপ জিনিস ছেলেদের দেয়, তেমনি ভগবান ইহুদী জ্যোতিষীদের এমন মেয়ে দেন যাদেব অপর কেউ নিতে চায় না।

সে যাই হোক, যে জ্যোতিষীর কথা বলছি তার ক্ষেত্রে এ-নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল। এই ইহুদীর স্ত্রী এত অসামান্য রূপসী যে রাজসভাতেও তাকে বেমানান হত না। সে যে কি কামনাময়ী মূর্তি! যেন বাসনার প্রতিমূর্তি—মাথাটি যেমন সুসমঞ্জস, তার উপরে খোঁপাটি তেমনি পরিপাটি। চোখ দুটি লম্বা লম্বা, কালো কালো যেন পদ্মের নীচে ঘুমিয়ে আছে। হাত দুটো যেন হাতীর দাঁত থেকে কুঁদে বার করা।

এই মহিলাকে প্রকৃতি রাণী করেই গড়েছিলেন। ক্রীতদাসীরা এর সেবা করবে, শিল্পী এর রূপ ফোটাতে চেষ্টা করবে, ভাস্কর পাথর কেটে এর রূপ ফুটিয়ে তুলবে, কবি কাব্যে এর প্রশস্তি গাইবে। কিন্তু সেই অমিত রূপ ঘরে বন্দিনী হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। তার একটা দামী ফার্-কোট ছিল, সেই ফার্-কোট পরে সে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে থাকত।

তার কোন ছেলেপুলে হয়নি। তার স্বামী জ্যোতিষী ও দার্শনিক; পড়া ও প্রার্থনায় তার সব সময় কেটে যেত। ইহুদী জ্যোতিষীটির কাছে মেয়েটি ছিল রহস্যাবৃত—যাকে বলে ঘোমটা ঢাকা রূপসী। মেয়েটি কোন কাজে মন দিত না—তার অনেক টাকাকড়ি ছিল। ঘড়ির কাঁটার মত তার সংসার চলত। কেউ তাদের বাড়ীতে কোনদিন আসত না, সেও কারো সঙ্গে দেখা করতে যেত না। সে বসে বসে কি ভাবত, আর স্বপ্ন দেখত।

একদিন ভীষণ ঝড় উঠলো—বজ্র, ঝড় সারা শহরের উপর দিয়ে বয়ে গেল—তখন ইহুদীর বাড়ী সব জান্‌লা ত্রাণকর্তার জন্যে খোলা রইল। তখন অভ্যাস মত রূপসী মেয়েটি তার আরাম কেদারায় শুয়ে শীতে কাঁপতে লাগল; ফার্‌-কোট ভেদ করে ঠাণ্ডা হাওয়া তার গায়ে লাগ্‌ছে, সে বসে বসে কি যেন ভাবছিল। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল তার স্বামীর দিকে। সে সহসা তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, বলত ত্রাণকর্তা কখন আসবে?"

দার্শনিক স্বামী উত্তর দিলেন, "পুঁথিতে আছে যে, যখন ইহুদীরা সব সাধু অথবা সব পাপী হয়ে যাবে, তখনই ত্রাণকর্তা আসবেন।"

রূপসী বললে, "তোমার কি বিশ্বাস হয়, সব ইহুদী কোনও কালে কি সাধু হবে?"

ঃ তা কি কবে আমি বিশ্বাস করবো?

ঃ তবে সব ইহুদী পাপী হয়ে গেলে, নিশ্চয়ই ত্রাণকর্তা আসবেন।

স্বামী তার কথা অগ্রাহ্য করে আবার ধর্মগ্রন্থে ডুবে গেল। রূপসী মেয়েটি স্বপ্নময় চোখ দুটি মেলে মুষলধারে বৃষ্টিপাত দেখতে লাগল আর তার হাতদুটো পোষাকের ফারের মধ্যে চপল ভাবে খেলা কবে বেড়াতে লাগল।

একদিন দার্শনিক পাশের এক গ্রামে ধর্মের মীমাংসা করতে গেল। লোকটি খুব পণ্ডিত ছিল। মীমাংসা অল্প সময়েই হয়ে গেল। কাজেই সেই রাতেই সে ফিরে এল। বাড়ীর জানলা আলোকমালায়

সজ্জিত দেখে তার তাক লেগে গেল। ব্যাপার কি? সে দেখলে, দরজায় দাঁড়িয়ে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর চাকর আরামে পাইপ টানছে।

বন্ধুভাবে সে জিজ্ঞাসা করলে, 'এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ?' তার মনে যেন এক অদম্য-কৌতূহল টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে।

"আমি পাহারা দিচ্ছি। এই রূপসী ইহুদী মেয়েটির স্বামী যদি হঠাৎ এসে পড়ে তাই দেখছি।"

: "তাই নাকি? বেশ, বেশ; খুব হুঁশিয়ার হয়ে পাহারা দিও।"

এই বলে দার্শনিক চলে যাবার ভান করলে। কিন্তু চলে না গিয়ে বাগানের দরজা দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকল। ঘরে ঢুকে সে দেখল, টেবিলে দুজনের জন্য খাবার দেওয়া হয়েছিল, খাওয়া একটু আগেই হয়ে গেছে। তার স্ত্রী অভ্যাসমত শোবার ঘরের জানলার কাছে ফার গায়ে দিয়ে বসে আছে, কিন্তু তার গালদুটো কেমন সন্দেহজনক লাল আর চোখে যেন তার স্বামীর প্রতি নীরব ভর্ৎসনা আর গভীর এক তৃপ্তির আমেজ। ইহুদীর পায়ে কি যেন একটা ঠেকে শব্দ হতেই, সে মেঝে থেকে উঠিয়ে নিয়ে দেখলে ঘোড়ার পিঠে চড়বার একজোড়া রেকাব।

দার্শনিক জিজ্ঞাসা করলে, এখানে তোমার সঙ্গে কে ছিল?

রূপসী তাচ্ছিল্য ভরে গা ঝাড়া দিলে; কোন কথাই বললে না।

: বলবো, হুসারদের দলপতি তোমার এখানে এসেছিল।

বেশ ত! কিন্তু কেন আসবে না বলতে পারে?—সে হাত দিয়ে ফার-কোটের উপরটা মসৃণ করলে লাগল।

: কি ভেবেছ তুমি? মাথা বিগড়ে গেল নাকি?

"মাথা বিগড়াবে কেন, আমার মাথা ঠিকই আছে।" সে ঠাট্টা ও শ্লেষের সঙ্গে হেসে বললে: "তুমি কি মনে করো না যে, ত্রাণকর্তা যাতে এই হতভাগ্য পাপী ইহুদীদের মধ্যে এসে তাদের মুক্তি দেন, সে বিষয়ে আমারও কিছু কি করবার নেই?"

শেষ